প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

ও হংসঃষট্ শ্রীমদ্‌গুরুবে নমঃ।

বিহারীবাবা

(মৌনীবাবা)

পরমহংস-প্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার "জীবনামৃত"।

শ্রীমতী সাবিত্রীমায়ের সেবক-সন্তান কর্ত্তৃক সংগৃহীত ঘটনাবলী অবলম্বনে—

'সাধনপ্রদীপ', 'গুরুপ্রদীপ', 'জ্ঞানপ্রদীপ', ও 'ঠাকুর-সদানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল,
২৫৭।এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্যামলাল কাব্যশিল্প বিশারদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

দর্শনমূলক উপাসনা যোগবিজ্ঞানাচার্য্য এবং বিবিধ সাধনগ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ পরমহংস পূজাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রণীত সকল পুস্তকের আমরাই প্রকাশক। আজ তাঁহারই প্রণীত আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ—পূজ্যপাদ পরমহংস-প্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার "জীবনামৃত" আমরাই প্রকাশ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলাম।

এই "জীবনামৃত" বা জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বনে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামিজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ যেরূপ অসীম জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয়মূলক অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যথার্থই অসাধারণ। ভক্তিমান্ জ্ঞানাভিলাষী পাঠক, ইহার স্থানে স্থানে বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে, নিশ্চয়ই প্রভূত আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের সহিত বাবার একখানি ফটোচিত্র প্রকাশ করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণে শ্রীমতী সাবিত্রীমাতাজীর তাহাতে আপত্তি থাকায় উহা প্রদত্ত হইল না, তবে কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর বাবার পবিত্র মন্দির মধ্যে তাঁহার শ্বেতমর্ম্মর বিনির্ম্মিত দিব্যমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন ও চিরকাল দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থের প্রকাশ ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইলেও ইহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ (এই পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচার ব্যয়াদি বাদে সমস্তই) বাবার **আশ্রমের সেবায়** প্রদত্ত হইবে। অতএব সাধারণে ইহার প্রচার ও বিক্রয় দ্বারা যে, একটী পবিত্র সদানুষ্ঠানসহায়ক হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই কারণ আমরা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকে এই বিষয় সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
শুভ আশ্বিন সংক্রান্তি
সন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্যামলাল শর্ম্মা
প্রকাশক।

ভূমিকা।

বাঙ্গালা তথা ভারতের গৌরব-রবি পরমহংস-প্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার "জীবনামৃত" রূপ তাঁহার এই অপূর্ব্ব জীবন-কথা আজ কোনরূপে সমাপ্ত হইল।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সাবিত্রী-দেবী মায়ের "সেবক-সন্তান" ইহা লিখিবার জন্য আমায় প্রথমে অনুরোধ করেন ও তাঁহার সংগৃহীত বাবার জীবনকালের ঘটনাবলী আমায় লিখিয়া দেন। তাহার পর সাবিত্রীমাও অনেক ঘটনা সময় সময় আমার নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি প্রারব্ধবশে সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হওয়ায়, বহু দিন যাবৎ একেবারে অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়াছিলাম, সুতরাং রোগ ও বার্দ্ধক্য-জীর্ণ দেহে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার আদৌ অবসর করিতে পারি নাই। এদিকে আবার সেই অবধি ক্রমেই দৃষ্টিশক্তির হীনতা হইতেছে দেখিয়া ইহা সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীমতী কমলাত্মিকা ও শ্রীদেবাত্মিকা মাই প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। আমিও সকলের নিকট প্রতি-শ্রুতি রক্ষার জন্য কোনরূপে অতি কষ্টে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলাম।

এতদুপলক্ষে বিহারীবাবার কতিপয় অন্তরঙ্গ সেবক-সেবিকা ও তাঁহার প্রথমাবস্থার সাধনসঙ্গী প্রচ্ছন্নযোগী শ্রীমান্ কামিনী-মোহন বসু মহাশয় প্রভৃতির নিকটেও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক ঘটনা জানিতে পারিয়াছি। সে কারণ সকলকেই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ সহ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীশ্রীভগবান সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

পরমহংস দেবকে আমিও বহুদিন হইতে জানিতাম ও তৎসম্বন্ধে বহু ঘটনা স্বয়ংই দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলাম, সুতরাং যতদূর সম্ভব তাঁহার জীবনী সুসম্পন্ন করিতে ক্রটী করি নাই। তবে তাঁহার বিষয়ে এখনও যে বহু ঘটনা জানিবার আছে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। যদি কোন ভক্ত বা তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, তাঁহার কোনও বিশেষ ঘটনা পরিজ্ঞাত থাকেন, তাহা জানিতে পারিলে, পরবর্ত্তী সংস্করণে সে সকল বিষয় সমাদরে সংযোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এই প্রসঙ্গে "হ্যানিম্যান" পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রফুল্ল চন্দ্র ভড় বাবাজীকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, তাহার উৎসাহ, অর্থব্যয় ও যত্ন না হইলে, এই পুস্তক এক্ষণে কিছুতেই মুদ্রিত হইত না। শ্রীশ্রীভগবান তাহার সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

বিহারীবাবার এই জীবনামৃত পাঠে যদি সাধারণের কিছুমাত্র কল্যাণ ও তৃপ্তিলাভ হয়, তবে সকলের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইল মনে করিব। ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী—

কাশীধাম,
শ্রাবণী পঞ্চমী
কলের্গতাব্দ ৫০৩০।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্‌গুরুবে নমঃ।

বিহারীবাবা

পরমহংস-প্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার অপূর্ব্ব

জীবনামৃত।

প্রথম অধ্যায়।

কে এই মহাপুরুষ ?

পবিত্র বারাণসীর পূত গঙ্গাতটে প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ-ঘাটে যে প্রশান্ত-গম্ভীর পরমহংস-প্রবর সম্পূর্ণ নগ্ন অঙ্গে মৌনভাবে সদা সচ্চিদানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন, কাশীর প্রচণ্ড শীত-গ্রীষ্ম, সদসৎ লোকের তীব্র সমালোচনা ও বৃথা হিংসাদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সতত অতি নিষ্ঠুর নির্য্যাতনেও যাঁহাকে বিচলিত ও বিতাড়িত করিতে পারে নাই, যাঁহার কঠোর সাধনা, সংযম, বৈরাগ্য ও ভাবতন্ময়তায় ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তিম আদর্শ যোগী ও সন্ন্যাসীর মধুর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, যাঁহার শঙ্খমর্ম্মর-বিনির্ম্মিত অতি

সৌম্য স্থূলমূর্ত্তি ও অবিকল আলেখ্য বা 'প্রতিকৃতি' তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সহধর্ম্মিণী (অধুনা ব্রহ্মচারিণী) শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী "মাতাজী" ও তাঁহার একান্ত-ভক্ত সেবিকা 'সুধা-মাই' আদি অন্যান্য সেবিকা ও ভক্তজন কর্তৃক উক্ত ঘাটের পার্শ্বেই নবনির্ম্মিত মন্দির মধ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং নিত্য ভক্তিভাবে পূজিত হইতেছেন, তাঁহার অমৃতোপম সাধনলীলা ও জীবন-কথা জানিবার জন্য বহু ভক্তের প্রায়ই অতিশয় আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। আজ সেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব 'জীবনকাহিনী' যাহা কিছু এযাবৎ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাই এই "**জীবনামৃত**" রূপে ভক্তিমান সাধন-পিপাসুদিগের করকমলে সাদরে প্রদত্ত হইতেছে।

যখন কাশীধামে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথসদৃশ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী, পরমহংস-সদানন্দদেব, কাঠ্ জিহ্বাস্বামী ও ভাস্করানন্দজী মহারাজ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত ভাস্করসম মহাপুরুষগণ ধীরে ধীরে অস্তাচলসদৃশ অতীতের পার্শ্বে অস্তমিত হইতে লাগিলেন, তখনই একদিন দশাশ্বমেধের বহু-জনাকীর্ণ ঘাটের একপার্শ্বে উপবিষ্ট এক দিগম্বর মহাপুরুষ সহসা সকলেরই একাগ্রদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

তখন অনাবৃত ধরণীপৃষ্ঠ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন আসন ছিল না, অনন্ত আকাশ ও অবারিত বায়ুরাশি ব্যতীত তাঁহার অঙ্গাবরণে অন্য কিছু অম্বর ছিল না, পিপাসায় স্বীয় অঞ্জলিপূর্ণ উত্তরবাহিনী কাশী-তল-বাসিনী গঙ্গার পবিত্র স্নিগ্ধ সলিল পান এবং অযাচিতলব্ধ দুগ্ধ ও ফলমূলমাত্রই তাঁহার ভোজন ছিল। তাঁহার কৃত্রিম গৃহ বা আশ্রম তখন কিছুই ছিল না, অথবা মুক্ত দিক্-চতুষ্টয় তাঁহার 'আনন্দমঠের' অক্ষয় প্রাচীররূপে বিরাজ করিতেছিল, গগনের চন্দ্র, সূর্য্য ও সমগ্র গ্রহমণ্ডল যেন

সদাই দীপমালারূপে তাঁহার সেই বিরাট মঠ বা আশ্রমের আলোক-প্রভা প্রদান করিত। গভীর নিশায় যখন কাশী-নগরীর পথ-ঘাট সমস্ত নিস্তব্ধ, সকলেই নিজ নিজ গৃহে সুখ-সঙ্গে নিদ্রার ক্রোড়ে নিমগ্ন থাকিত, তখন তিনি আসনে আপন মনে একাকী বসিয়াও কখন সঙ্গহীন হইয়া থাকিতেন না; অন্তর-অঙ্গে তিনি পরমাত্মা-সঙ্গে সতত বিভোর হইয়া থাকিলেও, বহিরঙ্গে ষড়-ঋতুর প্রত্যেকেই যেন একে একে সারা বৎসর ধরিয়া অতি নির্জ্জনে তাঁহার সহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমালাপনে তিলমাত্রও অবহেলা করিত না। তিনিও ভস্ম বা বিভূতি-বিলেপন আদি দ্বারা তাহাদের সহিত কোন সময়েই নিজ দেহের কোনরূপ ব্যবধান রাখিতেন না। তাঁহার সম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধানরূপ ষট্-সাধন-সম্পত্তি এমনই আয়ত্ব হইয়াছিল যে, অন্তর ও বাহ্যের কোন বস্তুতেই তাঁহার বিকার উৎপাদন করিতে পারিত না। তিনি এমনই ভাবে সদা নির্ব্বিকারচিত্তে যখন দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, তখন কাশীবাসী ভক্তিমান্ নর-নারীবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই চিত্তে তাঁহার এই কঠোর তপশ্চরণের বিষয়ে ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল, তাঁহারা আর বুঝি স্থির থাকিতে পারিলেন না, অনতিবিলম্বে তাঁহারা 'রথের' আকার-বিশিষ্ট কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র 'মন্দির' প্রস্তুত করিয়া সেই মহাপুরুষকে তাহার মধ্যে অবস্থান করিতে কায়মনে অনুরোধ করিলেন। তিনিও সেই একান্ত অনুগত ভক্তবৃন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়াই যেন গুটিকাবদ্ধ কীটের ন্যায় তাহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার কমণ্ডলু বা শিবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও গঙ্গার সেই কল্‌কল্-

প্রবাহিনী পবিত্র ধারা যেমন সাগর-সঙ্গমাভিমুখী হইবার জন্য সেই অতীতযুগে একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল, সাধকপ্রবর এই মহাপুরুষের চিত্ত-ধারাও সেইরূপ একাগ্রভাবে পরমাত্মা-সঙ্গ-লালসায় সদাই তন্ময় থাকিত। তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিতেন না, সর্ব্বদাই মৌনভাবে অবস্থান করিতেন। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে প্রায়ই কোন উত্তর দিতেন না, তবে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে, আকার-ইঙ্গিতে বা ইশারায় কিছু প্রকাশ করিতেন মাত্র। তিনি মধ্যে মধ্যে ঘাটের ধারে নিজের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন। তখন তাঁহার সেই কাষ্ঠ-মন্দিরটী স্থানীয় ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহার অভিলষিত স্থানে সরাইয়া দিতেন। এই ভাবে তাঁহার অন্তিম-আশ্রম পরমহংসাবস্থা কিয়ৎকাল কাশীধামে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোথা হইতে আসিলেন, এতকালই বা কোথায় ছিলেন, তাঁহার আজন্ম কোন কথাই কেহ জানিতে পারিল না। অনেকেই অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি কাশীবাস বা কাশীদর্শনাভিলাষী হইয়া এখানে আসিলে, তাঁহাকে এমন অবস্থায় সহসা দেখিয়া চমকিত হইয়া যাইতেন। আত্মীয়ভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইয়া যখন তাঁহাদের অসংখ্য প্রশ্নাবলীর একটীরও উত্তর না পাইয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া যাইতেন, তখন দর্শকরূপে সমাগত স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহাদেরই নিকট ক্রমে নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলেন, তাহাতেই উক্ত মহাপুরুষের পূর্ব্ব-পরিচয় লোকে কিছু কিছু জানিতে পারিল বটে, কিন্তু তাঁহার

আশৈশব পূর্ণ-পরিচয়, সাধনার ক্রম ও সিদ্ধি-বিষয়ে কোন কথাই বুঝিবার কোন উপায় হইল না। কারণ তিনি নিজে ত কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই, এমন কি তাঁহার গুরুপ্রদত্ত সাধু-আশ্রমের নামটীও আজ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারিল না। সুতরাং লোকে তাঁহাকে "মৌনীবাবা", "নাঙ্গাবাবা", "পরমহংস-বাবা" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত নামটাই পূর্ব্বকথিত তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট সংগ্রহ করিয়া "বিহারীবাবা" বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়া দিলেন। সাধারণের ন্যায় আমরাও বহুদিন ধরিয়া তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রে ভক্তগণের সেই আশা পূর্ণ হইবার এমনই এক অদ্ভুত লীলা সহসা সংঘটিত হইল, যাহাতে তাঁহার "জীবনামৃতে"র বহু উপাদান আমাদের নখ-দর্পণেই যেন প্রতিভাত হইয়া উঠিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও ভক্তজন তাহা পরে জানিতে পারিয়া নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন। আমরা তাঁহার আশৈশব 'জীবন-কথা'-প্রসঙ্গে সমস্তই ধীরে ধীরে বর্ণন করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও বাল্যজীবন।

বর্ষাকাল—আকাশ ঘনঘোর মেঘাবৃত, সন্ধ্যা অতীতপ্রায়, গাঢ় মেঘমণ্ডলের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইয়া চারি দিকের পুঞ্জীকৃত ঘোর অন্ধকার চকিতের তরে দূর করিয়া সুতীব্র আলোক-প্রভায় প্রকৃতির সেই গম্ভীর অদৃশ্য-শোভা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়া দিতেছে। মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ-দ্বাদশীর সান্ধ্যগগণে-চন্দ্রোদয়ের আশা ত আদৌ ছিলই না, তাহার উপর শ্রাবণের প্রবল-ধারাবর্ষী মেঘাড়ম্বরের মধ্য দিয়া একটী মাত্র তারকাও দৃষ্টি-গোচর হইতেছে না ঃ— সে আজ হইতে অনেক দিনের কথা —"১৭৮১ শকাব্দা বা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ।" বাহ্যপ্রকৃতির এমনই ঘন-ঘটার মধ্যে ত্রিপুরা-জেলার অন্তর্গত 'চালতাতলী' গ্রামে মাতুলালয়ে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় একটী সুকুমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। অন্তর-প্রকৃতির মহাবিপ্লবময় কলির এই ঘোর দুর্দ্দিনেই পাপ-মেঘাবৃত ভারতাকাশে যেন ক্ষণিকের বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় এই জাত-শিশুটী—আত্মীয়, দেশ ও দশের অপূর্ব্ব আনন্দ বর্দ্ধন করিল। শ্রীভগবান বিষ্ণুর পূর্ণকলাবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও এইরূপ ভাবে দ্বাপরের অন্তে এক ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীর ঘোর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়-কালেই জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারই মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত 'গীতোপনিষ-দে'র 'চতুর্থ অধ্যায়ে' তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥"

অর্থাৎ "হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি নর-দেহ পরিগ্রহণ করিয়া থাকি, ইত্যাদি।" আহা, সেই ভগবদংশেই এমনই আদর্শ মহাপুরুষদিগের সময় সময় জন্ম না হইলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট কলির জীব কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কেমন করিয়া নিজেদের মুক্তিমার্গের অনুকূল সংযম, সাধনা ও বৈরাগ্যের আদর্শ পাইবে? অন্তর্জগতে ধর্ম্ম-বিপ্লবের ফলেই কি কোন কোন আদর্শ-মহাপুরুষ বাহ্যপ্রকৃতির ভীষণ বিপর্য্যয়ের সময়েই জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন? তাঁহাদের কার্য্য—তাঁহারাই জানেন, আর জানেন—ইচ্ছাময়ী জগজ্জননী! সাধারণের জানিবার প্রয়োজনই বা কি, আর সামর্থ্যই বা কি?

এই নব-জাত শিশুর পিতা ঢাকা-জেলার অধিবাসী। 'কাল-সাদা'র অন্তর্গত 'তারপাশা' গ্রামে তাঁহার প্রসিদ্ধ ভদ্রাসন ছিল—অধুনা, সেই গ্রাম তাঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাসসহ সমস্তই পদ্মানদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাহা এক্ষণে "কীর্ত্তিনাশা" নামে পরিচিত। তিনি পরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত জেলাতেই 'বিক্রমপুরের' অন্তর্গত 'রাজদিয়া' গ্রামে নূতন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম—মহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা,উপাধি—মুখোপাধ্যায়। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান ও প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তেমনই আর্থিক-সম্পদেও বেশ সৌষ্ঠব-শালী ছিলেন। তিনি নামেও মহেশ্বর, কর্ম্মেও শিবসদৃশ ছিলেন। গঙ্গা ও যমুনাসদৃশী তাঁহার দুইটী পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নামও ছিল—গঙ্গাময়ী দেবী, কনিষ্ঠার নাম যমুনা ছিল না বটে, তবে তাঁহার নাম ছিল—সূর্য্যকুমারী দেবী, যমুনা যে 'সূর্য্য-সম্ভূতা' বলিয়াই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধা! এই জাত-শিশুটী জ্যেষ্ঠা গঙ্গাদেবীরই গর্ভসম্ভূত

তৃতীয় বা কনিষ্ঠ সন্তান। ইহাঁর প্রথম পুত্রের নাম—অভয়চন্দ্র এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম—নবীনচন্দ্র ছিল। সূর্য্যকুমারীর গর্ভে কেবল—'নীলরতন' নামে একটী মাত্রই সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। যাহা হউক নব-জাত শিশুটীর নাম সকলের ইচ্ছায়—'রাসবিহারী' বা 'বিহারীলাল' রাখা হইল। এই বিহারীলালই ভবিষ্যতে পূজ্য-পাদ পরমহংস-প্রবর শ্রীমৎ 'বিহারীবাবা'রূপে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন।

বিহারীলালের জন্ম-বৃত্তান্ত অর্থাৎ ইহাঁর 'গর্ভাধান-সংস্কার'ও অতীব বৈচিত্র্যময়! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতৃগর্ভে—তখন তাঁহার পিতামাতা যেমন কংস-কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন,আমাদের বিহারীলালের পিতা মহেশচন্দ্রও প্রায় সেইরূপ ইহাঁর গর্ভাবস্থায় থাকার পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার কারারুদ্ধ ছিলেন। মহেশচন্দ্র সেই সময় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মোন্মাদ হইতেন। কখন কখন তাঁহার সেই অবস্থা এমনই ভীষণ হইয়া উঠিত যে, তাঁহার আত্মীয় স্বজন-গণ তখন তাঁহাকে বাঁধিয়া কোন গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া রুদ্ধভাবে রাখিতে বাধ্য হইতেন। কেবল স্নান ও আহারাদির সময়ে অতি সাবধানে তাঁহার সেই কঠিন বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেন, তখন কেহই একাকী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিত না। তাঁহার সেই ধর্ম্মোন্মাদ ক্রমে 'উন্মাদ-রোগে' পরিণত হইয়াছিল।

একদা সন্ধ্যার সময় গঙ্গাদেবী একাকিনী তাঁহার গৃহে প্রদীপ দিতে যাইলে, সেই উন্মাদ মহেশচন্দ্র সহসা কি এক দৈববলে আপনা আপনি সেই সুদৃঢ় বন্ধনাদি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গঙ্গাদেবীর প্রতি নিতান্ত শান্ত-শিষ্টভাবে অগ্রসর হইলেন। তিনি

সেই উৎকট উন্মাদ রোগগ্রস্ত পতির সহসা ঈদৃশ অদ্ভুত অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, প্রথমে কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতা ও ভীতা হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার অতি প্রেমপূর্ণ সরল ও স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক বাক্যে প্রীতা ও চমৎকৃতা হইলেন এবং তখনই পতির একান্ত আগ্রহপূর্ণ প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধা হইতে বাধ্য হইলেন। তাহাতেই গঙ্গাদেবীর শুভ গর্ভ-সঞ্চার হইল। মহেশচন্দ্র তখন তাঁহার সাধ্বী পত্নীকে ইহাও ইঙ্গিত করিলেন যে, সেই গর্ভে তাঁহার এক অসাধারণ সৎ-পুত্রের উদ্ভব হইবে। অনন্তর গঙ্গাদেবী অনতিবিলম্বে এই কথা বাটীর সকলকে বলিলেন, সকলেই ব্যাপার শুনিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন। সকলেই তখন তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার সেই ব্যাধির পুনরাক্রম-বিধায় তাঁহাকে পুনরায় বন্ধন করিয়া সেই গৃহে তালাবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বিধির কি অপূর্ব্ব লীলা!

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল—গভীর মোহ-নিশায় বা 'মোহ-রাত্রিতে', তাহাতেই সমগ্র-সংসার তখন মোহ-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা না হইলে, তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া 'গোকুলে' রাখিয়া আসা তখন সম্ভবপর হইত না। সেই কারণ জন্মাষ্টমীর রজনীকে "মোহরাত্রি" * বলে, আবার তিনি সংসারে মুমুক্ষুর অন্যতম

* শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ 'ত্রিরাত্রি'রমধ্যে' জন্মাষ্টমীর রাত্রি—'মোহরাত্রি', শিব-চতুর্দ্দশীর রাত্রি—'মহারাত্রি' এবং অমাবস্যা-সংযুক্ত কালীপূজার রাত্রি—'কালরাত্রি' বলিয়া সুবিখ্যাত।

প্রধান মুক্তি-মন্ত্রের প্রচারক, তাই তাঁহার পার্থিব জনক জননী সেই সময়ের জন্য কারামুক্ত হইয়াছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিহারী-লালও মুক্তির আদর্শ-পুরুষ, জগতের শ্রেষ্ঠ মুক্তিক্ষেত্র 'কাশীধামে' তিনি মুক্তির অক্ষয় আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়াই, সেই পবিত্র সন্ধ্যাসমাগমে, তাঁহার জন্মের অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে, তাঁহার পিতা সর্ব্বরোগ ও বন্ধনাদি হইতে বুঝি মুক্ত হইয়াছিলেন!

আমাদের বিহারীলাল কৃষ্ণের ন্যায়ই নিজ মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন্ এবং সে সময়েও তাঁহার পিতা উন্মাদরোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর আর বিশেষরূপে তিনি রোগগ্রস্ত হন নাই।

বিহারীলালের শৈশব-সংস্কার—'জাতকর্ম্ম' ও 'ষষ্ঠীপূজাদি' সমস্তই যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল, পরে ষষ্ঠ মাসে তাঁহার 'অন্নপ্রাসন'-ক্রিয়াও সম্পন্ন হইল। এক বৎসর চারি মাসকাল অতীত হইলে, বিহারীলাল পিতৃগৃহে অর্থাৎ 'কালসাদা'র অন্তর্গত 'তারপাশা' গ্রামে নীত হইলেন। কিন্তু তথায় তিনি অনতিকাল-মধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায়, তাঁহাকে পুনরায় মাতুলালয়ে আনা হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-মাতুল হরকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে অতি যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যারম্ভ ঃ—ইংরাজী ১৮৬৪ অব্দে, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, এক শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহার বিদ্যারম্ভ-ক্রিয়া-উপলক্ষে তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ-মাতুল হরকান্ত-ঠাকুর তাঁহার 'হাতেখড়ী' দিয়া দেন। তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা অতি যত্ন করিয়া লেখা-পড়া শিখাইতে লাগিলেন। বালক বেশ মেধাবী হইলেও, অতিশয় চঞ্চল-প্রকৃতির ও বিষম দুর্দ্দান্ত ছিলেন। সে কারণ

কোন বিষয়েই তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ বা বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, এমন কি সময়ে আহারাদিও তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না; সর্ব্বদা খেলাধূলা ও দুষ্টামীতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। খাওয়াইবার জন্য কেহ তাঁহাকে ডাকিতে যাইলে, তিনি পলাইয়া হয় ত কোন বৃক্ষোপরি উঠিয়া প্রায় লুকাইয়া থাকিতেন, পরে নিতান্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, সেই বৃক্ষান্তরাল হইতেই কোকিলের ন্যায় 'কু' 'কু' করিয়া মুখে শব্দ করিতেন। তখন মাতা বা কোন আত্মীয়া তাহা শুনিতে পাইলে, তাঁহার মাতামহীকে সংবাদ দিতেন, তিনি তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কত আদর-যত্ন করিয়া তবে দুটী খাওয়াইতে পারিতেন।

বাল্যাবধি তাঁহার এতাধিক সাহস ও দুষ্ট-বুদ্ধি ছিল যে, তাহা বলিবার নহে। অতি ভীষণ বিষধর-সর্পের যেন তিনি 'যম' ছিলেন। সেরূপ কোন সর্প দেখিতে পাইলেই, বিনা-বাক্যব্যয়ে তাহার মস্তকে যষ্টী-প্রহারে আহত করিতেন এবং সেই আহত ও ক্রুদ্ধ কালসর্পের সহিত অনায়াসে ও অকুতোভয়ে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন। তখন কাহারও কোন কথাই তিনি মানিতেন না, যেন কাহারও কথা তিনি শুনিতেই পাইতেন না।

এক দিন সেইরূপ একটী ভীষণ বিষধর-সর্পকে খোঁচাইয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া পথের ধারে রাখিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিয়া বলিলেন—"আজ মামাকে সাপে খাবে"। প্রকৃতপক্ষে যে গৃহে তিনি রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহের জানালা বহিয়া, সেই সাপটাই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে ছিল। হিংসাযুক্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পটা যে, তাহার প্রতি হিংসাবসেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীর একটী কুকুর রাত্রিতে সাপটাকে এইভাবে জানালার উপর উঠিতে দেখিয়া ভীষণ চিৎকার করিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে সাপটার লেজ কামড়াইয়া টানিতে থাকে। তাহাতে সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিস্মিত হইয়া যায় ও সেই 'কালের' মুখ হইতে বালককে তখন সরাইয়া সে যাত্রা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। দৈবচক্রে এক সাপের-ওঝা সেই রাত্রিতে তাহাদের বাটীতে উপস্থিত ছিল। ওঝা সাপটাকে মারিতে নিষেধ করিয়া দূরে সরাইয়া দিল ও বালকের হস্তে একটী ঔষধ বাঁধিয়া দিল এবং সমস্ত রাত্রি তথায় থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল।

বিহারীলাল বাল্যকালে যদিও বাহ্যতঃ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরটী তখন এমনই সাধু-সুলভ পবিত্র ও ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিল, যাহা সাধারণ বালকগণের মধ্যে কদাচ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার খেলা-ধূলার মধ্যে অন্যতম কার্য্য এই ছিল যে, অনেক সময় স্বহস্তে মৃত্তিকা-সহযোগে 'দেবমূর্ত্তি' গঠন করিতেন এবং নিজ খেলার সাথী বালকদিগকে লইয়া পূজার অনুকরণ করিতেন। কেহ তাহাতে যোগদান না করিলে, বা তাঁহার পূজা কার্য্যের উপর উপহাস অথবা বিদ্রূপ করিলে, তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন—"তোর অমঙ্গল হবে, ঠাকুর তোর উপর রাগ করবেন," ইত্যাদি। যাহারা তাঁহার পূজা-কার্য্যে যোগ দিত না, তাহাদিগকে আর কখনও ডাকিতেন না। তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বা গোপনেই সেই মূর্ত্তির পূজা করিতেন। বালকের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবেই যে, ভবিষ্যতের অসাধারণ মহাপুরুষত্ব-বীজ নিহিত ছিল, তাহা তখন কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই। প্রায়

অধিকাংশ মহাপুরুষের বাল্যাবস্থায় এইরূপ ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাস ও বর্ষ অতিবাহিত হইয়া তাঁহাকে একাদশ বর্ষের 'কিশোর' করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ-বালকের শ্রেষ্ঠ সংস্কার—'উপনয়ন' বা 'ব্রহ্মচারীব্রত-বন্ধন'-ক্রিয়ার এই উপযুক্ত সময়। ইং ১৮৭০ অব্দে তাঁহার মাতুলালয়েই যথাবিধি তাহা সুসম্পন্ন হইল। প্রাচীন কালের বিধি-মত অন্ততঃ দ্বাদশ-বর্ষ কাল ব্রহ্মচারী দণ্ডীরূপে 'গুরুগৃহে বাস,অগ্নিরক্ষা ও বেদাধ্যয়নাদি-ক্রিয়া' এখন আর প্রচলিত নাই। এখন তাহার অনুকল্পে সঙ্কীর্ণ 'তীরঘরে' ঊর্দ্ধ-সংখ্যা দ্বাদশ-দিবস, ক্রমে তিন-দিবসমাত্র 'দণ্ডী-ব্রহ্মচারী'রূপে যাপন করিবার বিধিই প্রচলিত আছে। আজকাল আবার কালীঘাট ও কাশী-অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি স্থানে তাহারও সংক্ষেপ-বিধি কেবল 'দ্বাদশ-দণ্ড' কালেই পরিণত হইয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। যাহা হউক এই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মচারী-বালকের 'বেদ-অধ্যয়ন' ও সন্ধ্যা-গায়ত্রীমূলক 'সাবিত্রী-দীক্ষা' এবং তাহার শিক্ষার সহিত ব্রহ্মচর্য্য-পালনের বিধিমাত্র রক্ষিত হয়।

বালক বিহারীলাল এ যাবৎ যেরূপ নির্ভীক ও সকল বিষয়ে 'জেদী' ছিলেন, এই উপনয়ন-ক্রিয়ার পর হইতে তাঁহার সে ভাব যেন কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার সাধন-বীজ এই সময় যেন অনায়াসে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তিনি নিত্য সন্ধ্যা-গায়ত্রী ও পূজা-পাঠ আদিতে খুবই মনোযোগী হইলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। এই সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা বা সাধারণ-লেখা-পড়ার দিকে তাঁহার আগ্রহ তদনুরূপ বর্দ্ধিত হইল না। পড়িবার সময় কেহ তাঁহার ঘরে না থাকিলে, তিনি

পড়িবার পুস্তকখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াই আপন মনে আসন করিয়া বসিয়া ভগবানের ধ্যান ও জপ করিতেন। কখনও বা 'শ্লেটে' কিছু লিখিয়া রাখিয়া কোন ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন বা অঙ্ক-কসিবার ভান করিতেন। তাঁহার অধ্যয়নে আদৌ মনোযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে সহাধ্যায়ীরা তাহার পূজা-পাঠ জপ-তপ দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিত—"ভারি সাধু হয়েছে, কেবল চোক্ বুজে কতই ধ্যান করে!" সঙ্গীদের পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ ও কৌতুকে বিরক্ত হইয়া ক্রমে পূজা-পাঠেও ত্যাগ-দিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদের প্রায় বলিতেন—"তোরা পড়ে শুনে কি কর্‌বি? চাকৃরি বাকৃরি করে সংসারে আবদ্ধ হবি। ওতে কষ্ট ছাড়া কোন সুখ নেই, তখন তোরা দেখিস্। ভগবদগীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়, সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা কর, যাতে গতি-মুক্তি হবে, তাই কর।"

সঙ্গীদের পীড়নে সন্ধ্যা-পূজাদি সব বন্ধ করায়, মাতা তাঁহাকে সর্ব্বদা তিরস্কার সহ বলিতে লাগিলেন—"কেন বৃথা এত টাকা পয়সা খরচ করিয়া তোর পৈতা দেওয়াইলাম—এমন অনাচারী ছেলে ত কস্মিন্ কালে দেখিনে" ইত্যাদি। তাহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন ও মাতাকে বলিলেন—"মা মামাকে বলিয়া আমার আবার পৈতা দিয়া দাও।"

তাঁহার মাতুল মহাশয় এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"পৈতে কি বার বার হয়? তা হয় না।" তখন অতীব দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"হায় হায়, সঙ্গদোষে আমার সব নষ্ট হইল! ছোঁড়া-দের হাসি-ঠাট্টায় আমার নিত্য-কর্ম্ম সবই বন্ধ করিয়া দিলাম।" এই ভাবে তাঁহার সেই সাধনাঙ্কুরটী তখন যেন কিয়ৎকালের জন্য ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিহারীলালের

পিতা 'কালসাদা'র 'তারপাশা'-গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার মাথা খারাপ হওয়ায়, কোন কাজকর্ম্মই আর দেখিতে পারিতেন না। সুতরাং নানা বিশৃঙ্খলায় উপার্জ্জনের পথ সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহার সংসার-পরিচালন করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠদের বিবাহ হয়, তাঁহাদের বিবাহের যৌতুকরূপে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অর্থ দ্বারাই কোনরূপে তখন সংসারপরিচালনা করিতে বাধ্য হন। জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ-সহোদর তখন নিজ মাতুলালয়েই থাকিয়া সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন, পরে দেশে অর্থাৎ তারপাশায় ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিন পরে, নারায়ণগঞ্জে এক পাটের আপিসে ১৫৲ পনের টাকা বেতনে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন। নিজ অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তিনি সেই কার্য্যে দিন দিন বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময় ইং ১৮৭২ অব্দে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিহারীলালকেও বাটীতে আনিয়া বিশেষভাবে লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বিহারীলাল বাটীতে আসিয়া জ্যেষ্ঠের যত্নে তখন রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অস্বাভাবিক প্রতিভা ক্রমেই তাঁহাকে উন্নত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার নিত্য পাঠাভ্যাসের সহিত সংসারেরও অনেক কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইত। ক্রমে সংসারের জন্য নিত্য বাজার করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইল। তাঁহার পিসিমা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন—তাঁহাকে 'সোনাবাঁশী' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাকে নিত্য কাপড়-চোপড় পরাইয়া বাজার করিবার জন্য

পাঠাইয়া দিতেন। প্রতিবেশিগণের মধ্যেও কেহ কেহ কোন জিনিসের প্রয়োজন হইলে, তাঁহাকে দিয়াই আনাইতেন। ক্রমে অনেকের এইরূপ বাজার করিবার ভার বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, বালক বিহারীলাল সামান্য বিরক্তও হইলেন। তখন নিজের বাড়ীর জন্য জিনিসপত্র বাজার হইতে আনিলে, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিত—"সোনা, এটা কৎকের আনিলে, ওটা কৎকের আনিলে?" ইত্যাদি। তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা শৈশব হইতেই সমান, তিনি কৌতুক করিয়া ।০ চারি আনার জিনিষটা ৵০ দুই আনায়, দুই আনার জিনিসটা ⁄০ এক আনায়, এইভাবে প্রায় অর্দ্ধেক মূল্য বলিতেন। সকলে তাহা শুনিয়া বলিত—"বাঃ, সোনা ত বেশ সস্তায় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া আনে! তা সোনা, আমরা পয়সা দিব, আমাদের আনিয়া দিবে?" তিনি বেশ অম্লান বদনে তাঁহার অন্তরের দুষ্টামীপূর্ণ মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, পয়সা দিবেন, আনিয়া দিব।" পর দিবস বাজার যাইবার সময় প্রতিবেশী অনেকেই এটা ওটা আনিবার জন্য হিসাব করিয়া পয়সা দিল। তিনি বাজার হইতে নিজেদের জিনিসগুলি সমস্ত ক্রয় করিয়া, পথে কাদামাটী মাখিয়া অন্য সকলকার জিনিস কিনিবার পয়সাগুলি কাপড়ের খোঁটে বাঁধিয়া কোমরের মধ্যে গোপন-ভাবে রাখিয়া দিলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিলেন। পিসিমা দৌড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে সোনা, বাপ আমার?" বালক তখনও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমি পা পিছলে খালে পড়ে গিয়েছিলাম, আর একটু হলেই ভেসে যেতাম, অতি কষ্টে উঠে এসেছি।" তখন পিসিমা বালককে ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"আহা, বাছারে, এই কচি ছেলের উপর সকলেই বাজার-হাট কর্তে দিলে, অত বোঝা এ কেমন করে আন্বে বল?" তিনি তাঁহার কাপড় ছাড়াইবার সময় দেখেন যে, কাপড়ে কতকগুলা পয়সা বাঁধা রহিয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সোনা এ কিসের পয়সা রে?" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—"দেখুন্ না, পাড়ার লোকেদের কি লোভ! সব জিনিস আধাদামে কিন্তে চায়, আর নিজেরা ত মজা করে খাবেন, আমাকে দিয়ে কিনা কেবল বোঝা বইয়ে নেবেন!" পিসিমা বলিলেন—"তবে এরকম কর কেন?" উত্তরে বলিলেন—"উহাদের লোভের দৌড়টা দেখ্বার জন্যে।" পিসিমা বালকের বিচিত্র চতুরালী বুঝিতে পারিলেন, আর কোন কথা না বলিয়া যাহার যত পয়সা ফিরাইয়া দিয়া আসিলেন। এইভাবে তিনি সময় সময় এমনই এক এক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া বসিতেন। ইহার পর হইতে সোনাবাঁশী বাজারের জন্য উপযাচক হইয়া পয়সা চাহিলেও আর কেহ তাঁহাকে বাজার করিতে দিত না, ফলে তাঁহাকে দিয়া পাড়ার সকলের বাজার করান তখন হইতে বন্ধ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিক্ষা, বিবাহ ও কর্ম্মকথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিহারীলাল জ্যেষ্ঠ-সহোদরের যত্নে ইংরাজী শিক্ষার জন্য দেশে আসিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তের বৎসর-মাত্র। পরে নারায়ণগঞ্জে জ্যেষ্ঠের বাসাবাড়ীতে থাকিয়াই তিনি লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন ভাবের মধ্যদিয়া তাঁহার আরও দুইটী বৎসর অতীত হইল। যৌবনের পূর্ব্বরাগ তাঁহার দেহে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের জন্য লোকে তখন আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিধিলিপি খণ্ডন কে করিবে? অনতিকাল-মধ্যে কোলা-নিবাসী অভয়চন্দ্র ঘটকের কন্যা শ্রীমতী দক্ষিণা দেবীর সহিত এক শুভলগ্নে তাঁহার শুভপরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তিনি শ্রীশ্রীমহামায়ার প্রসাদে সংসারের বিচিত্রস্বরূপ চিরকোমল অভিনব মায়াসূত্রে এইবার বন্ধন-প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার সেই মনোরম হৃষ্ট-পুষ্ট নধর দেহ, অপূর্ব্ব উজ্জ্বল কান্তি, তাঁহার উৎসাহ ও বিমল দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহাকে যেন ক্রমেই ভবিষ্য-মহাপুরুষ-সুলভ অসাধারণ সুপুরুষে পরিণত করিতেছিল। তাঁহার সেই নয়ন-মন-তৃপ্তিকর মোহন-শ্রী দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন বিমোহিত হইয়া যাইতেন।

শ্রীমতী দক্ষিণা দেবী পিতৃহীনা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত মোহন ঘটক মহাশয়ই তাঁহাকে লালনপালন করেন এবং

বিবাহযোগ্যা হইলে, কোন সুপাত্রে তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য নানাস্থানে পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোন স্থানেই আর তাঁহার পসন্দ হয় না। লোকমুখে বিহারীলালের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই যেন মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহারই হস্তে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্প্রদান তখনই স্থির নিশ্চয় করিয়া লইলেন। তাঁহার বিবাহের পর কিছুকাল দক্ষিণাদেবীর মাতুল নূতন ভাগিনেয়-জামাতাকে (বিহারীলালকে) নিজের নিকট রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন বলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিহারীলালের তেমন ভাল না লাগায়, কিছুদিন পরে পুনরায় নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নিকট নারায়ণগঞ্জে আসিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। লেখা-পড়ায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশেষ আসক্তি না থাকিলেও, তাঁহার জন্মার্জ্জিত প্রতিভা তাঁহাকে ক্রমে অনায়াসে উন্নত করিয়া তুলিল। তিনি যথাসময়ে সম্মানের সহিত প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (এনট্রান্স পাস) হইলেন।

কালের অবিরোধগতি অতিক্রম করিবার সামর্থ্য কাহারই নাই। সেই কাল-প্রবাহে পতিত হইয়া নানা ভাবের মধ্যদিয়া সকলকেই নিজ নিজ প্রারব্ধ-কর্ম্মবশে সুখ-দুঃখাদি সমুদায় ভোগ করিতে হয়। আজন্ম জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই সেই প্রারব্ধ-কর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন, 'পুরুষার্থ' তাহারই সঙ্গে হয় আত্মোন্নতির সমুচ্চ-সোপানে উন্নত করিয়া দেয়, অথবা অবনতির নিম্নতম গহ্বরে ডুবাইতে সহায়তা করে। সাত্ত্বিকভাবে পরিপুষ্ট কঠোর সাধনা যেমন অলৌকিক অভ্যুদয়প্রদ, রাজসিক ও তামসিক ভাবে সাধনাও তেমনই যথাক্রমে লৌকিক-উন্নতি ও নানাপ্রকার অসৎ-প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মসমূহেরই

পরিপোষক। 'প্রারব্ধ' আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ-প্রাধান্যে ত্রিবিধ কর্ম্মানুকূল-সঙ্গ সদাই মিলাইয়া দেয়। জীবন-কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সকলকেই ত্রিবিধ-ভাবযুক্ত ভোগ-সমূহের অবাধে সঙ্গ করিতে বা সঙ্গ লইতে হয়। বিহারীলালও নিজ প্রারব্ধ-ভোগবশে যৌবনরাজ্যে পদ-বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই নিজ পাঠ্য-জীবন সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম-জীবনের দিকে এইবার অগ্রসর হইলেন।

ইংরাজী ১৮৭৭ অব্দে, তাঁহার পূর্ণ আঠার-বৎসর বয়ঃক্রম কালে, জ্যেষ্ঠ-সহোদরের নিকট কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজ সওদাগর "বার্কমায়ার ব্রাদার্সের" নারায়ণগঞ্জস্থ পাটের আফিসে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার ফলে, অল্পদিনেই তিনি নিজ কর্ম্মে বেশ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ক্রমে ৬০৲ ষাট টাকা নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু বিশেষ কর্ম্মনিপুণতা হেতু সেই আফিসের কর্ম্মকর্ত্তা 'সাহেব' অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মাসিক বেতনের অতিরিক্ত 'কমিশন' দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি অনতিবিলম্বে মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

'শীতলক্ষা' নদীর পূর্ব্বপারে 'নবীগঞ্জ' এবং পশ্চিম পারে 'খানপুর' নামক দুইটী গ্রাম। বিহারীলাল কখন এপারে কখনও বা ওপারের উভয় গ্রামেই নিজেদের বাসায় থাকিয়া নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্বকথিত 'বার্কমায়ার ব্রাদার্সের' পাটের আফিসে ম্যানেজার সাহেবের সহিত কাজ করিতেন। পূর্ণযৌবনে তাঁহার রূপ আরও ফুটিয়া উঠে, তখন সহসা তাঁহাকে ইংরাজী পোষাকে দেখিলে, সাহেবের মতই বোধ হইত। তাঁহাদের ম্যানেজার-সাহেব ইংরাজ

হইলেও তাঁহার রূপ, গুণ, অধ্যাবসায় ও প্রতিভাতে ক্রমেই যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে খুবই ভাল বাসিতেন। সাহেবের বয়ঃক্রম তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠরূপে একটু বন্ধুতার ভাবই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। তখন সাহেব বিহারীলালকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, এক মুহূর্ত্তও তিনি বিহারীলালকে যেন ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একত্র কাজ-কর্ম্ম, বসা-দাঁড়ান, গল্প-গুজব আদিতে তাঁহাদের বেশ আনন্দেই দিনাতিপাত হইতে লাগিল। ক্রমে পান-ভোজনেও উভয়ের পার্থক্য রহিল না। ইংরাজের ভোজনের সঙ্গে মদ্য-পান করা স্বাভাবিক, তাঁহাদের পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিয়মিত ভাবে মদ্যপান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন দোষ বা নিন্দা নাই। সাহেবের প্রাণসম বন্ধু বিহারীলাল তাঁহার সঙ্গে পড়িয়া ক্রমে সামান্য সামান্য মদ্যপানে অভ্যস্থ হইয়া উঠিলেন। পরে তাহার মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। রাত্রিকালে যখন তিনি সাহেবের নিকট হইতে বাসায় ফিরিতেন, তখন খুব সাবধানে নিজের শয়ন-গৃহে যাইয়া শুইয়া পড়িতেন। কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে তিনি যথেষ্ট সম্মান ও ভয় করিতেন। পাছে দাদা জানিতে পারেন, বা তাঁহার মুখে মদের গন্ধ পাইয়া কেহ দাদাকে বলিয়া দেয়, এই ভয়েই যথেষ্ট সাবধানে থাকিতেন। কিন্তু পাপকর্ম্ম কখনই গোপন থাকে না, কোন না কোন সময়ে তাহা প্রকাশ হইয়াই যায়। বিহারীলাল সঙ্গদোষে কোন কোন দিন অধিক মাত্রায় মদ্যপান করিয়া নেশায় অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন আর বাসায় ফিরিয়া আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না, গতিকে সে রাত্রি সাহেবের বাড়ীতেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাটাইতে হইত। জ্যেষ্ঠ-সহোদর তাঁহাকে

রাত্রিতে বাসায় আসিতে না দেখিয়া ব্যস্ত হইতেন, জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেন—"সাহেব আসিতে দিল না, কিছু কাজ ছিল, আর রাত্রি অধিক হইয়াছিল" ইত্যাদি। দুই চারি বার এইরূপ উত্তরেই কাটিল বটে, কিন্তু অধিক দিন তাহা আর চাপা রহিল না। জ্যেষ্ঠ যখন সমস্তই অবগত হইলেন—তখন তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন—"তুমি এতদূর ভ্রষ্ট হলে; জাত-জন্ম আচার-ব্যবহার কিছুই আর মানো না, একেবারে গোল্লায় গেলে, তোমাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছি—ফের যদি মদ ছোঁও, তা'হলে তোমার হাত দুখানা একেবারে কেটে দেবো" ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি জ্যেষ্ঠ-সহোদরকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিতেন, সুতরাং অবনত-মস্তকে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে এইমাত্র বলিলেন যে,—"আমি আর কখন মদ ছোঁবো না।" তাঁহার মনে যেন একটা ধিক্কার আসিল, তিনি মনের দুঃখে কাছারি যাওয়াও তখন বন্ধ করিলেন।

এদিকে সাহেব তাঁহার প্রাণের বন্ধু, আনন্দের সহচর, নেশার সঙ্গী, 'বিহারীলাল' কেন আসিল না, ভাবিয়াই আকুল, তাঁহার অভাবে সাহেবের কিছুই আর ভাল লাগে না—"তাহার কি কোন অসুখ-বিসুখ হইল, সে কোথায় গেল," কত কথাই সাহেব ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক নেশার সময় সঙ্গী না থাকিলে, নেশা বুঝি ভাল জমে না, স্ফূর্ত্তি বাড়ে না, প্রাণ কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। সাহেব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া সংবাদ লইতেও অবসর সহিল না, তিনি স্বয়ংই তাঁহার বন্ধুর বাসাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া নিজের বাটীতে লইয়া যাইলেন।

বিহারীলালের আহার-বিহার আচার-ব্যবহার আদিতে এ সময় আর কোনই বাচ-বিচার ছিল না, ইতঃপূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। মৎস্য, মাংস, মদ্য আদি সমস্তই যেন অবাধে চলিত, সেই সঙ্গে তাহার আনুসঙ্গিক ভোগ-বাসনা, বিলাস-বিনোদ কিছুই বাদ যাইত না; তিনি পূর্ণমাত্রায় তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চরিতার্থ করিতে ছিলেন।

সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া মদ খাইতে বসিলেন ও তাঁহাকেও মদ খাইতে বলিলেন। বিহারীলাল মদ ত খাইলেন না, অধিকন্তু বলিলেন যে, আমি "আর মদ খাইব না, কারণ দাদার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আর মদ ছুঁইব না।" সাহেব বলিলেন—"বেশ কথা, আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাই না, তুমি আর মদ ছুঁইও না, আমিও তোমাকে আর মদ ছুঁইতে বলিব না—এস, আমি তোমার গলায় ঢালিয়া দিতেছি, তুমি পান করিয়া যাও, ছুঁইও না" ইত্যাদি।

অসৎ-কর্ম্মে আইনের ফাঁক্ বা ধর্ম্ম-বাঁচাইতে প্রয়োজন মত আত্ম-ছলনার তিলমাত্রও অভাব হয় না! সাহেবের ঐরূপ কথায়—বিহারীলাল হাসিয়া ফেলিলেন ও হাঁ করিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। এইভাবে পুনরায় উভয়ের মধ্যে পান-ভোজনের অবাধ-লীলা চলিতে লাগিল। বন্ধুদ্বয় পুনরায় প্রাণভরিয়া যেন আনন্দসাগরে সাঁতার দিতে লাগিলেন। সঙ্গই সকল বাসনার মূল। তাই কথায় আছে—"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" এইবার তাঁহার যথার্থই যেন সর্ব্বনাশ হইল, তাঁহার সেই নারকীয়-লীলা যেন পূর্ণতা অতিক্রম করিল, তাঁহার হৃদয়াধার বা মনোপাত্র এইবার ছাপাইয়া পড়িল। আর লজ্জা, সরম, ভয়, চিন্তা, তাঁহার কিছুই রহিল না, তিনি যেন একেবারে অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠের ভয়ে

একদিন তিনি নেশার অবস্থায় ঘরে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সাহেবের বাড়ীতেই তখন ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটাইতেন, এখন আর সে জ্বালা নাই, সে চিন্তায় তাঁহাকে আর বিচলিত করে না। তিনি এখন দু-পাঁচ দিনও নিজেদের বাসার ত্রি-সীমানায় পা দেন না। তাঁহার যতদূর অধঃপতন হইবার হইল,—হায়, তাঁহার বুঝি ঘোর সর্ব্বনাশ হইল!

সকল কর্ম্মেই তাঁহার 'জেদ্' বা বাড়াবাড়ি স্বাভাবিক। আশৈশব তাঁহার এই বৃত্তি, ভাল-মন্দ যখন যেভাবের মধ্য দিয়াই পরিচালিত হইত,তখন তাহাতেই একটা না একটা চূড়ান্ত কর্ম্ম করিয়া বসিতেন। একদা বাটীতে কোন ব্রতাদির উপলক্ষে, কোনরূপ 'আমিষরন্ধন' হয় নাই, তিনি আহারে বসিয়াই যখন তাহা জানিতে পারিলেন, তখন মনে মনে ভীষণ রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীকে আর কোন কথা না বলিয়া, কিৎয়পরে নিজেই পুষ্করিণীতে যাইয়া মৎস্য ধরিয়া আনিলেন ও রাঁধিতে বলিলেন। অনন্তর যথাসময়ে তাহা আহার করিয়া তবে নিবৃত্ত হন। তখন বলিলেন—"আজ যদি মাছ-রান্না না হইত, তবে দাদাকে বলিয়া বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিতাম" ইত্যাদি। তাঁহার এই অদম্য জেদই তাঁহাকে পরমহংস অবস্থায় পরিচালিত করিবার পক্ষে অন্যতম প্রধান সহায়ক হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

সংসার ও বৈরাগ্য।

'শাস্ত্র' বলিয়াছেন—"ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ" অর্থাৎ মানব ক্রমেই সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করে। 'সংসারই', জীবমাত্রের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয়। কতক 'দেখিয়া, কতক 'শুনিয়া,' কতক বা সংসারের কর্ম্মপ্রবাহে পতিত হইয়া আশৈশব কেবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া 'ঠেকিয়া', কত কর্ম্মই না মানবকে শিক্ষা করিতে হয়! বিহারীলালও তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে নানা সঙ্গ ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া—বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের নানা শিক্ষা এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তুর রসাস্বাদন করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেই কিশোর সময়ে নব-পরি-ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পত্নীর পবিত্র প্রেমরসেও তিনি বঞ্চিত হন নাই। পরস্পরের দাম্পত্য-ভাব-বিনিময়ে, যৌবনের প্রথম বিকাশে, তিনি তখন বিভোর হইয়াই ছিলেন। তখন সাময়িক অদর্শনও তাঁহাদের চিত্তে প্রকৃতি-সুলভ বিক্ষেপ ও বিরহ-যাতনায় আকুল করিয়া তুলিত। সেই পূত প্রাকৃতিক-ধর্ম্ম যেন শ্রাবণের অবিরাম ধারা-প্রবাহে তাঁহাদের ক্রমে ভাসাইয়া চলিল। সেই ভাব স্রোতের মধ্যে যখন বিহারীলাল তাঁহার জীবনের চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন সহসা ভাগ্যবশে একটী কোমল কমল-কলিকাসদৃশী নব-কুমারী তাঁহাদের কন্যারূপে যেন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল।

বিহারীলালের পত্নী তখন তাঁহার মাতুলালয়ে 'টেগ্‌রা' গ্রামেই প্রসবার্থে গিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাটী ভূমিষ্ঠা হইল, সর্ব্বত্র সংবাদ প্রেরিত হইল, বিহারীলালও যথাসময়ে সে সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তখন ইং ১৮৮৩ অব্দ, তাঁহার এই প্রথম কন্যা-লাভ হইল। সকলেরই আদরে ও আন্তরিক যত্নে সেই নব-জাতা শিশুটী ক্রমেই শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল।

কাল-প্রবাহ কখনই একভাবে যায় না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু যে দিনটী আজ গত হইতেছে, ঠিক তেমনটী আর আসিতেছে না। আজ জীবেনর সুখ ও দুঃখ-জড়িত যে ভাবটীর সঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে অতীত হইতেছে, কাল ঠিক সেইরূপ ভাব-সঙ্গ আর হইবে না, কিছু না কিছু তাহার ভিন্নতা হইবেই। আবার ভবিষ্যতে যাহা হইবে, যে ভাবনায় জীব এখন হইতেই শঙ্কিত, ভীত বা আশান্বিত ও উৎফুল্ল হইতেছে, সে দিনও কেমন করিয়া একদিন তাহার সম্মুখে হয় ত আসিবে এবং তাহার পরই অনাদি অতীতের অঙ্গে মিশিয়া যাইবে। নাট্যশালার এই নব নব পট-পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সেই সুদূর অতীতের কোন্ অজ্ঞাত কাল হইতে অবিরত ভাবেই যেন কোন 'নিপুণ গুপ্ত-কর্ম্মীর' দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে! তাহা বুঝি মানবের সাধারণভাবে দেখিবার বা বুঝিবার-মত শক্তি নাই!

বিহারীলালের জীবন-নাটকের সেই উদ্দাম যৌবন-লীলা, দাম্পত্য-জীবনের সেই মধুময় প্রেমের খেলা, সেই নিপুণ গুপ্ত-কর্ম্মীর অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি-সামর্থ্যে আর একখানি নূতন পটের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আজ বুঝি কি এক অভিনব 'রূপ'ধারণের আয়োজন করিতেছে। তাঁহার চিত্তে কি জানি কি কারণে

সেই ভাব-প্রবাহ সহসা আজ রুদ্ধ হইতে চলিল—তিনি যেন চকিত-নেত্রে সম্মুখে কি দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার আর এইভাবে অগ্রসর হইতে সাহস অথবা প্রবৃত্তি হইতেছে না। তিনি গভীর নিদ্রার পর স্বপ্ন-চালিত হইয়া যেন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিলেন, আর যেন চমৎকৃত হইয়া একাগ্রচিত্তে কত কি ভাবিতে লাগিলেন—'ওঃ এ কোথায় আসিলাম, সম্মুখে ইহারা সব কে? কাহাদের সঙ্গে আমি কোথায় এমন করিয়া যাইতেছি? না, না—আর ইহাদের সঙ্গে এই ভাবে যাইব না, ইহারা মিত্ররূপে আমার সঙ্গে জুটিয়া, আমাকে ছলনার নানা কথায় ভুলাইয়া, ভীষণ ভ্রান্তপথে লইয়া যাইতেছে। হায়, হায়, আমি যে আসল-পথ হারা হইলাম! বন্ধু-বান্ধব, মনিব-সাহেব, মদের অঙ্গ, পতিতা-সঙ্গ, বিলাস-বিভৎস, ছিঃ কি জঘন্য-রঙ্গ, আবার এ কি,—আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-কন্যা, অসন-ভূষণ সমস্তই যে, মোহের অন্তরঙ্গ! না—ইহাদের সঙ্গে আর কিছুতেই থাকা হইবে না।"

তাঁহার যেন চৈতন্য হইল, বৈরাগ্যের তীব্রতায় তাঁহার হৃদয়-দেশ ভরিয়া গেল। তাঁহার সেই স্বাভাবিক 'জেদ্' বা কর্ম্মের একনিষ্ঠা, তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিল, অতীতের কথা সব যেন মুছিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখের কর্ম্মের ধারা স্থির করিয়া লইলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে নিজের শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। নারায়ণগঞ্জে নিজ কর্ম্ম-স্থলে যাইয়া, মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া, যথাকর্ত্তব্য সমস্ত সমাপন করিয়া লইলেন ও তখনই 'বিদায়-পত্র' লিখিয়া দিয়া কার্য্য হইতে অবসর লইলেন।

রাগিনী—পূরবী, তাল—একতালা।

"মন, কেন মিছে ফিরে ফিরে চাও।
পিছু পানে নাহি চেয়ে, আগে চলে যাও॥
আপন ভাবিয়া যাদের লইয়া,
এত দিন গেল বৃথায় কাটিয়া,
এখনও সে মোহ গেল না টুটিয়া,
আর কবে কিবা হবে, সাবধান হও॥
কি আছে তোমার, কে আছে তোমার,
কারে হেরে বল, তোমার আমার,—
এ (ভব-) বিশ্ব-সংসার, সকলই যে তাঁর,
তুমিও যে তাঁর, তাঁরেই সঁপে দাও॥
মায়া-মোহ যারা, অবিদ্যার ধারা,
সদাই ছুটিছে, সঙ্গে সাথী তারা,
চিনেও চিন্‌লেনা, হলে বুঝি সারা—
ছুটে প্রাণপণে তাঁর চরণে লুটাও॥
শ্রীগুরুর বাণী দৃঢ় করি মানি,
ছলনার কথা কানে নাহি শুনি,
'সচ্চিদানন্দ' চল নির্ভয়ে আপনি,
বসি ব্রহ্মানন্দ-ধামে দ্বন্দ্বশূন্য হও॥"

নিরুদ্দেশঃ—বিহারীলাল আজ সংসারের সকল মায়া-মোহ কাটাইয়া, বন্ধুর একান্ত অনুরাগ ও আগ্রহ ত্যাগ করিয়া, নারায়ণগঞ্জ হইতে সকলেরই অজ্ঞাতে সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন। সংসারে তাঁহার স্ত্রী-কন্যা ব্যতীত পিতা-মাতা আদি সকলেই

বিদ্যমান। কেহই কিছু জানিতে পারিল না, তিনি সকলকে কাঁদাইয়া কোথায় চলিয়া যাইলেন। সকলেই তাঁহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অনুসন্ধানে তখনই চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল, নিজেরা, আত্মীয়, পরিচিত ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সংবাদ লইবার আশায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। দূর-দেশে 'তার' (টেলিগ্রাফ) ও পত্রাদি প্রেরণেও অনেকের নিকট সংবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার আফিসের সাহেবও তখন নিশ্চিন্ত রহিলেন না, তাঁহার প্রাণসম বন্ধুর সর্ব্বত্র অনুসন্ধানের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কেবল আক্ষেপ ও হা-হুতাশমাত্রই সার হইল—কেহই তাঁহার কোন উদ্দেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সকল-চেষ্টা, ক্রমে আশা-ভরসা সমস্তই বিফল হইল। ক্রমে মাস ও বৎসরও অতীত হইল, তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। আহা, মায়ের প্রাণ,—মাই জানেন ; অন্যে কে তার কি বুঝিবে ? তিনি বিহারীবিহনে সর্ব্বদা কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতপ্রায়া হইলেন, তাঁহার আহার-নিদ্রা প্রায় তিরোহিত হইল। পিতা,—তাঁহার কথাও অবর্ণনীয় ! একেই ত তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহার পর আকস্মিক বিহারীলালের এমনই নিরুদ্দেশ-সংবাদে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বরোগ ভীষণভাবে বর্দ্ধিত হইল। ফলে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে তখন পুনরায় সকলে ধরিয়া হাতে 'হাতকড়ি' ও পায়ে 'বেড়ী' দিয়া ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, প্রিয়পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, বারবার সকলকে বলিতেন—"বিহারী কোথায় গেল রে ? তোরা তাকে কোথায় তাড়িয়ে দিলি ? আমায় খুলে দে, আমি তাহাকে এখনই খুঁজে আনি।"

তখন তিনি উন্মাদ বলিয়া কেহই তাঁহার সেই পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্নের আর কোনও উত্তর দেন না। দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর অতীত হইতে চলিল; তিনি মনের আবেগে যেমন ক্রমেই অতীব অস্থির হইতেছিলেন, তেমনই তাঁহার প্রতি সকলের এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহারে ভীষণ ক্রুদ্ধও হইতেছিলেন। বায়ুগ্রস্ত রোগীর বলের অভাব হয় না – তিনি একদিন গভীর নিশায় সেই লোহার বেড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নিজগৃহের জানালার লোহার 'গরাদেণ্ড' বাঁকাইয়া বাহির হইবার পথ করিয়া লইলেন।

নারায়ণগঞ্জের বাসাতেই সে সময় সকলে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং তিনিও নারায়ণগঞ্জেই তখন ছিলেন। তাঁহার স্নেহের ধন, নয়নের মণি বিহারীলাল যে পথে গিয়াছেন, তিনিও তাঁহার উদ্দেশে আজ সেই ভাবেই সকলের অজ্ঞাতে নারায়ণগঞ্জ-বাসা ত্যাগ করিয়া সেই গভীর নিশায় কোথায় যে, প্রস্থান করিলেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাঁহার সেই শূন্য গৃহ দেখিয়া, সকলেই একেবারে অবাক্! তখন তাঁহার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে সংবাদ ও লোক প্রেরিত হইল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

তিনি রজনীর সেই নিশীথ-সময়ে একাকী একবস্ত্রে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় পদব্রজে ঢাকার দিকে চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে ঢাকায় পৌঁছিয়া পাঁচ টাকায় একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তাঁহার মধ্যম-পুত্রের শ্বশুরবাড়ী 'রোয়াল' গ্রামে যাইলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ তাহাদের ঘাটে পৌঁছিয়া মাঝিকে বলিলেন – "দেখ, ঐ বাড়ীতে যাইয়া সংবাদ দাও যে, মুখুজ্জে মহাশয় এসেছেন।" মাঝি তাঁহার আদেশ মত সেই বাড়ীতে সংবাদ দিবামাত্র, তাঁহার

মধ্যম-পুত্রের শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি আলো লইয়া ঘাটে আসিলেন। তখন বাটীতে আর কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার জামাতা আসিয়াছেন, কিন্তু ঘাটে গিয়া যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতা,—বৈবাহিক-মহাশয় আসিয়াছেন,তখন অতি সলজ্জভাবে যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া আসিলেন। নৌকাভাড়া পাচটী টাকা মাঝিকে তিনিই দিয়া দিলেন।

তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়া তখন কেহই তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তখন সকলেরই সহিত বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কথা-বার্ত্তা ও আলাপ-আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রি ও তাহার পরদিন তিনি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি এক-বস্ত্রেই বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাটীতে স্নানান্তে তাঁহাদেরই একখানা কাপড় পরিয়াছিলেন। রাত্রিকালে সেই কাপড় পরিয়াই তিনি শয়ন করেন।

মধ্যরাত্রিতে যখন সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, ব্রাহ্মণ তখন উঠিয়া, তাঁহার বিছানার মধ্য হইতে একখানি 'কাঁথা' বাহির করিয়া লইলেন, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়াই গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরিধানে সেই একখানিমাত্র বস্ত্র ও 'বেয়ান-বাড়ীর' কাঁথাখানি ব্যতীত অন্য কিছুই সঙ্গে রহিল না। আজ এখানে, কাল ওখানে, এইভাবে গ্রাম-গ্রামান্তর হইয়া, নানা দেশ ও তীর্থ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উন্মত্ত-ভাব এখন যেন আর নাই। তিনি এখন আপন ভাবেই বিভোর, কাহাকেও কোন কথা বলেন না, কাহারও নিকট কিছু

প্রার্থনাও করেন না। তাঁহার একান্ত মনের ভাব কেবল 'বিহারী-লালের' অনুসন্ধান। সেই উপলক্ষে তিনি কত দেশ দেখিলেন, কত গ্রাম-নগর, পর্ব্বত-প্রস্রবন, কত নদ-নদী, কত জীব-জন্তু, কত নর-নারী, কতই কি দেখিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সেইপ্রাণের ধন নয়নের-মণি পুত্ররত্নটীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অবিরত পর্য্যটন, আহার নিদ্রার অনিয়ম, ক্লান্তি পরিশ্রম, কিছুতেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই—যেন অবিরত নিজ উদ্দেশ্য-সাধনেই তিনি তৎপর। তাঁহার উৎসাহ-হীনতা ও নৈরাশ্য আদৌ নাই, অহরহঃ তাঁহার সেই পুত্ররূপী প্রাণ-বিহারীর অনুসন্ধানেই তিনি একাগ্রভাবে চলিয়াছেন। কত দিবা-রাত্রি অতিবাহিত হইল। মাসের পর মাসও চলিয়া গেল, একাগ্রচিত্তে—'ভক্তের হৃদয়-বিহারীকে' দেখিবার ন্যায় তাঁহার 'নয়ন-বিহারীকে' তিনি তখনও দেখিতে পাইলেন না।

আহা, তিনি এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সুদীর্ঘ চারিটী মাস অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার 'পুত্র' বিহারীলালকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি ক্রমে সেই 'গোলকবিহারী'র প্রিয়তম-স্থান 'বৃন্দাবনে' আসিয়াই উপনীত হইলেন। তিনি আজ যমুনার কূলে কূলে, ব্রজবাসী ভক্তজনের পবিত্র চরণাঙ্কিত ও পদরজঃ-পূর্ণ পথে-ঘাটে এবং বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান আর কি স্থির থাকিতে পারেন? একাগ্রচিত্ত সাধকের মনোবাঞ্ছা তিনি কি কখনও অপূর্ণ রাখিতে পারেন? আহা, তিনি যে সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মস্বরূপ। ব্রাহ্মণ, পুত্রভাবের মধ্য-দিয়াই একান্তচিত্ত হইয়াছেন ও তাহাতেই উন্মাদ হইয়া আত্মস্বরূপ সেই 'আত্মারই' যে অনুসন্ধান করিতেছেন! এক্ষণে সেই পুত্রটীই

যে, তাঁহারই আত্মারূপে পরমাত্মীয় বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছে! তাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ঃ—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যে, যে ভাবেই আমাকে প্রাপ্ত হইতে চায়, আমি তাহাকে সেইভাবেই সহায়তা করি।

বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান এতদিন পরে বুঝি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এইবার যথার্থই ভগবদ্‌কৃপা লাভ করিলেন। সেই মণিহারা-ফণির ন্যায়, বৎসহারা-গাভীর ন্যায়, পুত্রহারা-পিতাকে দেখিয়া সহসা কে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহারই চরণতলে প্রণত হইল। আহা, বাৎসল্যভাবে হৃষ্টপুষ্ট গোপালের ন্যায়, আমাদেরই সেই হারানিধি, বড়-আদরের বিহারীলাল আজ কোথা হইতে পুত্রদর্শনোন্মাদ পিতার করে যেন স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। পিতা - "আমার বিহারী, আমার বিহারীরে," বলিয়া বাহু-বেষ্টনে তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার চক্ষে অবিরাম অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, পুত্র-বিরহতপ্ত তাঁহার হৃদয়-প্রদেশ আনন্দসলিলে ভরিয়া যেন শীতল হইয়া গেল, মুখে কথা নাই, কেবল সজল-নয়নে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে এক-দৃষ্টে তিনি চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন— "বাপ্, এতদিন কোথা ছিলি বাপ্, তোরে—কে, কি বলেছে? বাবা, তুই মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়ে, আমাদের ফেলে, এতদূরে চলে' এসেছিস্ ধন! আমি কতদিন ধরে, কত শত দেশে যে তোকে তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌ছি বাবা! তোর মাও, তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে মৃতপ্রায় হয়েছে। আহা, সে বেচারীর অবস্থা দেখে, আরকি স্থির থাকা যায় বাবা! তার আহার নেই,

নিদ্রা নেই, এতদিনে হয় ত সে মরে গেছে, না হয়, আমারই মত পাগল হয়ে গেছে। চল বাপ্ আমার, ঘরে চল, তোর মার প্রাণে শান্তি দে, আর এমন করে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাস্‌নে বাবা!"

পুত্র, পিতার কথায় আর উত্তর দিতে পারিলেন না। উন্মাদ পিতার সেই অব্যক্ত অবস্থা দেখিয়া তাঁহারও প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল, তিনি তখনই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যাইলেন। তাঁহাকে সযত্নে স্বহস্তে স্নান ও আহারাদি করাইয়া শান্ত ও সুস্থ করিতে লাগিলেন। আহারান্তে পিতার সহিত তাঁহার নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

বিহারীলাল বলিলেন—তিনি পৌষ মাসে নারায়ণগঞ্জ হইতে বাহির হইয়া, প্রথমে কলিকাতায় আসেন ও তথা হইতে নানা তীর্থাদি পরিদর্শন করিয়া বৃন্দাবনে আসেন। এক বৎসর পরে তাঁহার খুল্লতাত বা খুড়ামহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনিও সংসার-বিরক্ত পুরুষ, তখন তিনিও বৃন্দাবন-বাসী। এই সকল কথা পিতার নিকট ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার নিরুদ্দেশ হইবার পর আজ দেড় বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার বয়ঃক্রম সাতাশ বৎসর—ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। এইভাবে পিতা-পুত্রের অভাবনীয় মিলন-সংঘটন হইল। পিতার অনুরোধে তিনি উপস্থিত বাটী যাইতে সম্মত হইলেন ও সেই দিনই তাঁহার আদেশে বাড়ীতে 'তার' (টেলিগ্রাফ) দিলেন যে, "বাবা,বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি।"

যথাসময়ে উভয়ে নারায়ণগঞ্জের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

মৃতপ্রায় মাতৃহৃদয়ে নবজীবন সঞ্চারিত হইল, তাঁহার অশ্রুভরা নয়নতারা হারানিধি-দর্শনে আরও উথলিয়া যেন ফুলিয়া উঠিল। এইবার প্রবল ধারায় তাহা প্রবাহিত হইতে লাগিল—বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, তাঁহার পুত্র-বিরহ-কাতর অতীব তাপক্লিষ্ট হৃদয়দেশ তাহাতেই বুঝি শান্ত ও শীতলতা প্রাপ্ত হইল। মাতা, পুত্রকে পাইয়া যেমন আনন্দে ভরিয়া যাইলেন, তেমনই উন্মাদ ও নিরুদ্দিষ্ট পতিদেবতাকে পাইয়া সতী আরও পুলকিতা হইলেন। তাঁহার আজ যথার্থই মণিকাঞ্চন-সংযোগরূপ অমূল্য রত্নরাজির পুনর্লাভ হইল।

পুত্র মাতৃচরণে প্রণত হইলে, মাতা কত আদর করিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন, স্নেহভরে এতদিনের সঞ্চিত কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—পুত্র, তাঁহার চরণতলে বসিয়া সংক্ষেপে সকল কথারই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। তখন মাতা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া যেন নবোদ্যমে তাঁহাদের আবার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে উঠিলেন। এত দিন তিনি যেন নিষ্ক্রিয় ও জড়বৎ হইয়া ছিলেন—আজ তাঁহার আর উৎসাহ ধরে না, আজ যেন তিনি যথার্থই মৃতসঞ্জিবনী সুধা-পান করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন।

বাড়ীর সকলেই একে একে তাঁহাদের অপার আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কতই অফুরন্ত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া দেখিতে আসিল, সকলেই হৃদয়ের অকপট আনন্দ-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

আহার ও বিশ্রামান্তে পুত্রকে কাছে বসাইয়া মাতা আবার কত

কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহার কথা বুঝি আর শেষ হয় না। নিজ দুঃখ-কষ্টের কত কথা বলিয়া অবিরল অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাতা, পুত্রকে অতি কাতর ভাবে বলিলেন যে,—"আমি জীবিতা থাকিতে আর যেন পালাইও না, আবার আমাকে ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হইলে, আমি আর বাঁচিব না। তাহাতে তোমার 'মাতৃহত্যার' পাপ হইবে" ইত্যাদি। পুত্র অনন্যোপায় হইয়া মাতৃচরণে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—"না মা, আর তোমাকে কষ্ট দিব না, তোমার জীবিতাবস্থায় আর চলিয়া যাইব না, কিন্তু তোমার দেহান্তে আমি আর সংসারে আসিব না।"

প্রায় এই সময়েই তাঁহার সেই কন্যা-রত্নটী তিন বৎসর বয়সে 'টেক্‌গোরিয়া' গ্রামে তাহার জন্মস্থানে প্রাণত্যাগ করে। তিনি তাহা শুনিয়াও তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য তাঁহাকে বেশ কঠিন-হৃদয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই ঘটনায় তাহা কঠিনতররূপে পরিণত হইল। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজ পত্নীকে আর নিকটে আনিলেন না। সকলে বার বার অনুরোধ করিলেও, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না। বিশেষ করিয়া সে বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে, তিনি কেবল বলিতেন—"তাহাকে যখন পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর গ্রহণ করিতে পারি না। সংসার-ধর্ম্ম করিবার আর ইচ্ছা নাই" ইত্যাদি। মাতা ও ভ্রাতা আদি সকলেই তখন ক্রমে নিরস্ত হইলেন! আর কেহ সে বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপন করেন না। তিনিও যেন নিশ্চিন্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পুনরাবর্ত্তন।

বিহারীলাল সংসারের চিরনিরত আবর্ত্ত-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় বাধ্য হইয়াই গৃহে আসিলেন, পুনরায় পূর্ব্ব-পরিচিতদের সহিত আলাপ পরিচয়াদি হইতে লাগিল। পুনরায় তাঁহার সেই ইংরাজ-বন্ধুর সহিতও সাক্ষাৎ হইল, তিনিও তাঁহাকে পুনরায় দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া যাইলেন। সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আফিসে লইয়া গেলেন, কিন্তু বিহারীলালকে বার বার অনুরোধ করিয়াও আর আচারভ্রষ্ট করিয়া তাঁহার পান-ভোজনের সঙ্গী করিতে পারিলেন না বটে, তবে যথার্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সঙ্গ সুখ-প্রদ বোধে তাঁহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। বিহারীলাল এদিকে মাতার নিকট "সহসা সংসারত্যাগ করিয়া কোথাও পলাইয়া যাইবেন না," এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অন্যপক্ষে বন্ধুর অনুরোধ—"বৃথা ঘরে বসিয়া থাকিবে কেন? তবু কার্য্য-ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিলে, তোমার মন ভালই থাকিবে, আর অহরহঃ তোমার সঙ্গ যে, আমাদের উভয়েরই সুখপ্রদ, সে হিসাবে আমারও চিত্তের প্রসন্নতা বজায় থাকিবে।"

তিনি সাহেবের পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি নবিগঞ্জের আফিসে পুনরায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

কথায় বলে—"বস্‌তে পেলেই, শুতে চায়"; "একে পেলে,

আরে চায়!” সংসার ক্রমাগতই একটার পর একটা সুখের আশায় কেবল আত্ম-বন্ধনের চেষ্টায় ঘুরিতেছে। লৌকিক ভোগের অবসর সহসা কেহই যেন পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না! নিজে ত পারেই না, অন্যকেও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেও যেন সকলে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর! সংসার, কেবলই ইহার সুযোগ বা অবসর অন্বেষণ করিতেছে। পিতা, মাতা, ভাই ও বন্ধু-বান্ধবগণই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক।

বিহারীলাল যখন পিতার সহিত গৃহে ফিরিলেন, মাতার করুণ কাতরতাপূর্ণ ও স্নেহ-সিক্ত অনুরোধে গৃহে থাকিতে বাধ্য হইলেন, বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ যত্ন ও আগ্রহে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তখন আর যেন কোনও গোলযোগ রহিল না। বেশ শান্ত-শিষ্ট ভাবেই যখন তাঁহাকে লৌকিক কর্ম্ম-জগতে সকলে দেখিতে পাইলেন—তখন পুনরায় পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলেই বিহারীলালকে ‘সস্ত্রীক’ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি যে, আশৈশব ভীষণ ‘জেদী’—যাহা একবার তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয়, কার সাধ্য সহসা তাহা পরিবর্ত্তন করাইবে! তিনি “সে স্ত্রীকে যখন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর তাহাকে গ্রহণ করিবেন না, তিনি আর গৃহস্থাশ্রমে আবদ্ধ হইবেন না;” বার বার এই কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কথা তাঁর শুনে কে? তাঁহারাও তাঁহার সেই ‘জেদ্’ ভাঙ্গিবার জন্য অন্যবিধ ব্যবস্থা করিতে প্রাণপণে যত্নবান হইলেন।

মাতাজী এইবার ভাবিলেন—“হয় ত ছেলের সে পূর্ব্ব-পরিবার গ্রহণ না করিবার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে”। যাক্, সে কথা তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। এখন তিনি অন্য দার-পরিগ্রহণের জন্য তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। নূতন বিবাহের জন্য নিত্যই তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক-পক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব-পত্নীর প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব তাঁহার আদৌ ছিল না, বরং তাঁহাকে যথেষ্টই ভাল বাসিতেন, কিন্তু সংসার-ত্যাগের সময় তাঁহার দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিল যে, আর স্ত্রীর সহিত সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। কেবল সেই দৃঢ়তার বশবর্ত্তী হইয়াই, তিনি আর সেই প্রিয়তমা পত্নীর সন্দর্শন ও সঙ্গ করিলেন না। কিন্তু মাতা যখন কিছুতেই মানিতেছেন না, তখন তিনি স্পষ্টই বলিলেন—"আমি অধিক দিন সংসারে থাকিব না, কেবল তোমারই অনুরোধে এখানে আছি মাত্র। আর এ সময় তোমার কথামত পুনরায় বিবাহ করিলে, পরে সেই স্ত্রী ও তাহার আবার পুত্রাদি হইলে, কে দেখিবে, কে তাহাদের লইয়া বিব্রত হইবে?" মাতা বলিলেন—বেশ বাপ্-আমার, সোনার-চাঁদ আমার, তোমার মেজদাদার সন্তান নাই, সে আর মেজবৌমাই তোমার সকল ভার লইবে, তুমি সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না।" সেই সময় তাঁহার মেজবৌদিদি-ঠাকুরাণীও তাহাতে যোগ দিলেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো, আমরা তোমার সকল ভার গ্রহণ করিব, তবে তোমার ছেলে না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমাকে সংসারে থাকিতে হইবে। আর মাঠাকুরাণীর নিকট তুমি ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, তিনি বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত তুমি সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না" ইত্যাদি।

এইভাবে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির পুনঃ মুনঃ অনুরোধে তিনি আর ভিন্নমত হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের এইরূপ কথায় তিনি যেন মৌন হইয়াই সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। 'যেই কথা, সেই কাজ'—আর সকলকে

পায় কে ? সকলেই তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে 'পাত্রীর' অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নানা স্থান দেখিয়া, ঢাকা জেলার অন্তর্গত 'আটপাড়া'-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তাঁহার অগ্রজ-সহোদরকে সঙ্গে লইয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য আমাদের বিহারীলালকে 'পাত্র'রূপে দেখিতে আসিলেন। পাত্রের রূপ ত অসাধারণ, আবার গুণও অনন্ত ! সমস্তই তাঁহারা শুনিলেন। তাঁহার আচার-ভ্রষ্টতা ও গৃহত্যাগাদি গুণের কোন কথাই তাঁহাদের নিকট গোপন করা হইল না। তাঁহারা সে সকল কথা শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং পাত্র দেখিয়া তখনই বিবাহের কথা স্থির করিয়া যাইলেন ; কেবল বলিলেন—"মেয়ের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।" বাস্তবিক বিধি-নির্ব্বন্ধ-কর্ম্ম অন্যথা হইবার নহে !

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার নাম—শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী। মেয়েটী বেশ সুন্দরী, সুশ্রী ও গুণবতী। সেই কুমারী বালিকা-অবস্থাতেই বেশ সুশীলা ও স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই ও আট ভগিনীতে সর্ব্বশুদ্ধ দশজন ছিলেন, সাবিত্রী মা তাঁহাদের মধ্যে নবম সন্তান। তাঁহার খুল্লতাত মহাশয় তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। গৃহে এতগুলি কন্যা সত্তেও তাঁহার আদর, নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি প্রায় সকলেরই কনিষ্ঠা বলিয়া বড়ই আদরের ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। তখন—ইং সন ১৯৮৯ অব্দ। সেই বৎসরেই তাঁহার শুভবিবাহ হয়।

বিধিলিপি চিরদিনই অখণ্ডনীয় ! প্রারব্ধ-কর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; তাহা সকলের মনঃপূত হউক বা না হউক

তাহাতে বিধাতার কিছুই আসিয়া যায় না! লৌকিক-জগতে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া ভগবানের প্রত্যক্ষ-অবতার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও পঞ্চ-পাণ্ডবাদি দেবাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, নানা বৈচিত্র্যময়ী ঘটনাপূর্ণ বিবিধ কর্ম্মভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিহারীলালও সেই প্রাবদ্ধ-কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে আবার 'বিবাহ' করিতে হইল।

তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। নারায়ণগঞ্জের বাসা হইতেই তাঁহার বিবাহ হয়। তথা হইতে দক্ষিণ দিকে ঢাকার অন্তর্গত 'আটপাড়া' গ্রামে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য যাইতে হয়। শীতলাক্ষী ও ধলেশ্বরী নদী দিয়া জলপথে নৌকাযোগে যাইতে তাঁহাদের প্রায় এক প্রহর সময় অতীত হইল। আটপাড়ায় পৌঁছিলে, যথাসময়ে শুভলগ্নে সত্যবানসদৃশ 'বিহারীলালের' সহিত সাক্ষাৎ 'সাবিত্রীদেবীর' শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আজ সতীরূপে সাবিত্রী যাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন, তিনি যে, একদিন যথার্থই দিগম্বররূপে কাশী-বিশ্বেশ্বরের সমীপে শিবস্বরূপে বিরাজ করিবেন, তাহা কেহ আজ স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারিলেন না। সময়ে কিন্তু তাহা জগতে সত্য ও অক্ষয় আদর্শস্বরূপ রক্ষা করিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিবে। আবার সতীও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণীতা হইয়া যে, যথার্থ ব্রহ্মচারিণীর রূপ ধারণ করিবেন, তাহাই বা আজ কে বলিবে? অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহামায়ার লীলা-বৈচিত্র্য বুঝিবার সাধ্য কার?

মাতৃবিয়োগঃ—দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর অতীতের ক্রোড়ে লয় লইয়া গেল। এখন সংসারে আর দুঃখ-কষ্ট কিছুই নাই। শ্রীশ্রীমতী মাতাজী গঙ্গাদেবীর বুঝি মনোবাঞ্ছা

এইবার পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার বিহারীলাল নূতন সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। আর তাঁহার চিন্তা কি? তাঁহার বয়সও প্রায় অশীতি-বর্ষ হইয়া আসিল। তাঁহার সংসারে পতি-পুত্র, পৌত্র ও পৌত্রী আদিতে সর্ব্বাবয়বে এখন পরিপূর্ণ। বেশ আনন্দের ও শান্তিময়, যেন সোনার সংসারে পরিণত হইয়াছে। বিহারীলালের কৃপায় ধন-অর্থেরও আর কিছুমাত্র অনটন নাই। মাতাজী তখন প্রায় নারায়ণগঞ্জের বাসাতেই অবস্থান করিতেন। তিনি যথার্থই রত্নগর্ভা ও মহাপুরুষের জননী তথা পরম পুণ্যবতী, স্নেহশীলা ও সৌভাগ্যশালিনী নারীকুলশ্রেষ্ঠা ছিলেন। সংসার-আশ্রমের এমনই সু-অবসরে তিনি পবিত্র অগ্রহায়ণ মাসে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্তা হন। তৃতীয়-দিনে রাত্রির শেষ-প্রহরে সজ্ঞানে সেই নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শেষ ইষ্টবাক্য যাহা বিহারীলালকে শ্রবণগোচর করাইয়াছিলেন—তাহা তিনি পুনরায় মুখে বলেন এবং সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করেন—"হ্যাঁ বাবা, ইহাই তোমার মুক্তির উপায়।" পুত্রও শুনিয়া বলি-লেন—"মা ঠিকই বলিয়া গেলেন। ইহাই আমার ইষ্টবাক্য।"

তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইলে, সংসারের সকলেই নারায়ণগঞ্জের বাসা হইতে তাঁহাদের বসত-বাটীতে 'রাজদিয়া' গ্রামে আসিলেন। নারায়ণগঞ্জ হইতে রাজদিয়া পশ্চিমদিকে নৌকাযোগে প্রায় একবেলার পথ। শীতলাক্ষী, ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদী হইয়া যাইতে হয়। এ পথে ষ্টীমারও চলে, তাহাতে তিন ঘণ্টামাত্র সময় লাগে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহাঁদের সংসারে এখন ধন-জনের অভাব নাই। সুতরাং বৃদ্ধা মাতার 'শ্রাদ্ধ' বেশ ধূমধামেই সম্পন্ন হইল।

বৃষোৎসর্গ ও চারিটী ষোড়শ করিয়া তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণাদির ভোজন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদায় ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আদি কিছুরই অপ্রতুল হইল না। আহা, এমন পুণ্যবতী মিষ্ট-ভাষিণী লজ্জাশীলা সতীলক্ষ্মী ও শ্রীমৎ বিহারীলালের ন্যায় অসাধারণ মহাপুরুষের জননীর পক্ষে এইরূপ হইবারই ত কথা! সকলেই ধন্য ধন্য রবে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

স্বাধীন-ব্যবসায় :—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—বিহারীলাল আঠার বৎসর বয়সে—ইং ১৮৭৭ অব্দে নবীগঞ্জে পাটের আফিসে প্রথমে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন। এখন ইং ১৮৯১ অব্দ, তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর মাত্র। পাটের কাজে তিনি বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এই সময় দৈবচক্রে তাঁহাদের সেই পাটের আফিসে আগুন লাগিয়া সমস্ত পুড়িয়া যায়। তাঁহার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও তাঁহাকে যথার্থই যেন অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। আফিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বুঝিয়াছিলেন, বিহারীলাল ব্যতীত এই আফিস পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা অন্যের পক্ষে কঠিন, সেই কারণ তাঁহারা তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পুনরায় আফিস-প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ বা অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কি জানি, বিহারীলাল তাহাতে আর মনোযোগী হইলেন না, তাঁহার মনে কি এক বিভিন্ন-ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—“আর চাকরি করিব না। চাকরীতে যথার্থই নিজের স্বাধীনতা-বুদ্ধির হানি হয়। বাধ্য হইয়া অন্যের মন-যোগাইতে হয় বলিয়া, চিত্তবৃত্তি ক্রমেই নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই কারণ তিনি তাঁহাদের আফিসের আগুন-লাগার সঙ্গে সঙ্গে যেন ‘পরাধীনতা’রূপ সুদৃঢ়-বন্ধনেও অগ্নিসংযোগ

করিয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি অদৃষ্টবশে আরও কিছুদিন এইরূপ কর্ম্ম-সঙ্গই করিতে হয়, তবে এই চির-পরাধীনতার পরিবর্ত্তে, না হয় নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। তিনি চিরকালই ভীষণ 'জেদী' লোক, এক্ষেত্রে আফিসের সাহেব-দিগের শত-অনুরোধও অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিয়া, নিজেই স্বাধীন-ব্যবসায় করিতে দৃঢ়-নিশ্চয় করিলেন। তাঁহার প্রারব্ধ তাঁহাকে অনুকূল-পথে সহায়তা করিতে লাগিল।

সংসারের আসক্তি তাঁহার ভিতরে আর নাই বলিলেই হয়, তবে কুম্ভকারের চক্রের ঘট-নির্ম্মাণরূপ কার্য্য বন্ধ হইলেও, পূর্ব্ব-প্রদত্ত বেগের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন সেই চক্র অবিরত ঘুরিতেই থাকে,তেমনই ভাবে তাঁহার কর্ম্ম-প্রারব্ধ তিনি অনাসক্ত হইলেও, তাঁহাকে সকল কর্ম্মই এখন করাইয়া লইতেছে।

তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছায়, নারায়ণগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া 'টিপারার' (ত্রিপুরার) অন্তর্গত 'চাঁদপুরে' যাত্রা করিলেন। অনতিকালের মধ্যে তথায় কোন সুবিধাজনক স্থানে নিজের পাটের কারবার খুলিলেন। 'কলিকাতা'তেও সেই সময় নিজের এক আফিস রাখিলেন। উভয় স্থানে মালের আমদানি ও রপ্তানির কার্য্য সুরু করিয়া দিলেন। মালের ক্রয়-বিক্রয়ের সুবন্দবস্ত করিয়া লইলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীও যেন মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার অর্থ-সম্বন্ধে মা যথার্থই যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি অল্প দিবসের মধ্যেই নিজ কারবারে প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেন।

কিয়ৎকাল এমনই ভাবে বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হইতেছে, সহসা তাঁহাদের নবীগঞ্জের 'বাসায়' আগুন লাগিয়া যায়। বিহারী-

লালের দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের পরই তাঁহাদের নবীগঞ্জের এই নিজ বাসাবাড়ীটী প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার বহুদিনের প্রিয়তম সখের-সামগ্রীগুলি এই বাসাতেই সাবধানে রক্ষিত ছিল। যথা-সময়ে এই সংবাদ শুনিয়া তিনি যেন খুবই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি এই ঘটনার সহিত অনেকটা বিলয়-প্রাপ্ত হইল! সেই অবধি তিনি কেবল অতি প্রয়োজনীয়-বস্তু ব্যতীত আর কোন সখের-জিনিস নিজের জন্য সংগ্রহ করিতেন না। তাঁহার মায়ার আর এক বন্ধন আজ কাটিয়া গেল, এই ভাবিয়াই তিনি তখন যেন যথার্থই বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন।

নবীগঞ্জের বাসা হইতে সকলকে খাঁনপুরের বাসাতেই আনিয়া রাখিলেন। ইহার পর নারায়ণগঞ্জে নিজেদের নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রায় এক বৎসর পরে, ইং ১৮৯২ অব্দে তাঁহাদের সেই বাড়ী প্রস্তুত হইয়া গেল। সকলেই সেই নূতন বাড়ীতে যাইলেন, কিন্তু বিহারীলাল নিজের স্ত্রী সাবিত্রীদেবীকে তখন তথায় রাখিবার পক্ষে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-সহোদর সাবিত্রীমায়ের ভ্রাতাকে আনাইয়া তাঁহার সহিত আটপাড়ায় তাঁহাদের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

শারদীয়া-দুর্গাপূজার সময় বিহারীলাল যখন চাঁদপুর হইতে বাড়ী আইসেন, তখন পথে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী আটপাড়ায় একবার নামিলেন। তথায় সাবিত্রীদেবীকে অবস্থান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বাড়ী যাও নাই কেন?" স্ত্রী উত্তর করিলেন—"আমাকে কেহ লইতে আসেন নাই।" সেই দিন সপ্তমীর রজনী, তথায় অতিবাহিত করিলেন। "পাছে দাদা কিছু মনে করেন" এই ভাবিয়া পরদিবস রাজদিয়ায় নিজ বাড়ীতে

যাইয়া মায়ের পূজায় যোগ দিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় যাইলেন ও নিজ খুড়শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন যে,"আপনি শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।" অনতি-বিলম্বে 'তারে' সংবাদ আসিল যে, তিনি সাবিত্রীমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।" বিহারীলাল 'তার' পাইয়া যথাসময়ে ষ্টেসনে তাঁহাদের লইতে আসিলেন। গাড়ী পৌঁছিলে, জিনিসপত্র সব নামান হইতেছে, স্ত্রীর একটা 'ট্রাঙ্ক' দেখিয়া যেন একটু রহস্য-ছলে তাহাতে বলপূর্ব্বক পায়ের ঠোকর মারিয়া বলিলেন—"এত বড় ট্রাঙ্ক এনেছ কেন?" উহাতে তাঁহার পায়ে একটু আঘাত ত লাগিলই, অধিকন্তু ট্রাঙ্কটী নীচে পড়িয়া গিয়া কতকটা ভাঙ্গিয়া ও খসিয়া গেল। উহার মধ্যে গহনার বাক্সটীও ছিল, সাবিত্রীমা এই ব্যাপার দেখিয়া, একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন---"বেশ হইয়াছে, উহার জন্যই এত ভাবনা-চিন্তা ছিল, এখন বেশ নিশ্চিন্ত হলাম, আর বেশী ভাব্‌তে হবে না।" তাহাতে পতি কিছু লজ্জায় পড়িলেন, তখনই কুলিকে দিয়া সমস্ত গুছাইয়া তুলাইয়া লইলেন। তাঁহার সামান্য ঔদাস্যভাব প্রদর্শনের ফলে যে, এতটা অনর্থ হইবে, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে তাঁহারই ত সহধর্ম্মিণী, স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী মা-আমার অবসর পাইয়া বৈরাগ্যের ভাব দেখাইতেই বা ক্ষান্ত থাকিবেন কেন? তিনিও উদাসভাবে বেশ একটু শিক্ষা দিলেন। 'শক্তির' নিকট শক্তি-প্রকাশ করা সহসা কাহারও চলে না! যাহা হউক তাঁহারা কিয়ৎপরেই বাসায় পৌঁছিলেন। তখন ইং ১৮৯২ অব্দ, বাঙ্গালা—কার্ত্তিক মাস চলিতেছে। বিহারী-লালের কাজ-কর্ম্মের অবস্থা খুব ভালই বলিতে হইবে। কথায়

বলে "স্ত্রী-ভাগ্যে ধন"। তাহা বেশ ফলিতেছে—বিহারীলাল তখন অপর্য্যাপ্ত ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। চারি বৎসরের মধ্যে তিনি অনায়াসে পঞ্চাশ-ষাট্ হাজার টাকার বিষয়-সম্পত্তি ত করিয়া ফেলিলেনই, তাহা ব্যতীত নগদও প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা তাঁহার হাতে হইল এবং তাঁহার স্ত্রীকেও প্রায় চারি-পাঁচ হাজার টাকার গহনা তিনি করিয়া দিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রীমা কলিকাতায় কার্ত্তিক মাসে আসিয়া প্রায় পাঁচ মাস স্বামী-সঙ্গ করিলেন। ইং ১৮৯৩ অব্দে, বাঙ্গলা—ফাল্গুণ মাসে বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে তাঁহারা আটপাড়ায় আসিলেন। এই গ্রামেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইল। তাঁহারা তথায় সেই বিবাহের উৎসবে যোগ দিলেন, পরে তিনি স্ত্রীকে নব-বধূ ও ছেলেকে লইয়া রাজদিয়ার বাড়ীতে যাইতে আদেশ দিলেন। নিজে কর্ম্ম-উপলক্ষে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সাবিত্রীমা শ্বশুরবাড়ীতে দিন কতক থাকিবার পর পুনরায় আটপাড়ায় নিজ বাপেরবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ও পতিকে তাহা পত্রের দ্বারা জানাইলেন।

কিছুদিন পরে বিহারীলাল একবার পাঁচ-ছয় দিনের জন্য আট-পাড়ায় নিজ শ্বশুরালয়ে আসিয়া কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় ফিরিয়া যান। এইভাবে জ্যৈষ্ঠমাসেও এক দিনের জন্য তিনি তথায় আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালে, একবার ভীষণ বিসূ-চিকা-রোগ হয়। তখন স্ত্রী নিকটেই ছিলেন। নারায়ণের কৃপায় ও স্ত্রীর অকাতর প্রাণপণ সেবা-যত্নে অচিরে আরোগ্য-লাভ করেন। ইং ১৮৮৯ অব্দেও তাঁহার আর একবার এইরূপ ব্যারাম হইয়াছিল। সে যাত্রাও ভগবৎ-কৃপায় তিনি অনায়াসে আরোগ্য-লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রতিজ্ঞাপূরণ।

খণ্ড-কালই মহাকাল-রূপে সংসারে চির-পরিচিত। তিনি কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে তিলমাত্র অমনোযোগী নহেন, তাঁহার পক্ষে অবহেলা বা সময়ের অপব্যবহার বলিয়া কিছুই নাই, তিনি কোন দিনই কাহারও অধীন নহেন, পক্ষান্তরে সকলে তাঁহারই অধীন! তিনি জীবের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া সততই তাঁহার অতীত-অঙ্গে মিশাইয়া দিতেছেন। প্রতি প্রশ্বাসসহ জীব নিজের 'আয়ু-বৃদ্ধি হইতেছে' এইরূপ ভাবিয়া আনন্দিত, কিন্তু অনাদি-কাল জানেন, প্রতি প্রশ্বাসেই জীবের আয়ু-ক্ষয় হইতেছে। জীব ভাবিতেছে—"আমার বয়স, কাল এক ছিল, আজ দুই হইল," কিন্তু তিনি দেখিতেছেন—'তাহার নির্দ্ধারিত কাল বা বয়স হইতে আজ দুই কমিয়া গেল'। সুতরাং প্রত্যেক জীব বয়ঃ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে, তাহার নির্দ্দিষ্ট আয়ু হইতে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক প্রাণী যে, তাহার প্রতি প্রশ্বাসের সহিত নিয়ত মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে, তাহা ত ভাবিতে পারে না! সে দিব্য-দৃষ্টি যে, সকলের নাই। তাই—প্রায় সকলেই 'সু'-'কু' নানা কর্ম্ম-সঙ্গে সংসারে অহরহঃ আবদ্ধই হইতেছে। কালের অবিরোধ গতির সঙ্গে সঙ্গে যাহার সেই কর্ম্ম-বন্ধন কাটিয়া শ্রীইষ্ট-গুরুর কৃপায় সেই 'জ্ঞাননেত্র' উন্মীলিত হইয়াছে, যাহার সেই 'উপ-নয়ন'-ক্রিয়া

যথার্থ সম্পন্ন হইয়াছে, সেই কালের এহেন গতি দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভয়যুক্ত হইয়া আত্মোন্নতি বা মুক্তির পথ অন্বেষণ করিতেছে। সেই ব্যক্তিই অতি দীন, আর্ত্ত ও ইষ্টগুরুর শ্রীচরণপ্রান্তে নিতান্ত একাগ্রভাবে শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসুরূপে পরম-অর্থের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়াছে ও কেবল তন্নির্দ্দিষ্ট-কর্ম্ম করিতেই দৃঢ়ব্রত হইয়াছে।

সাধারণ জীব প্রারব্ধ-বশে এই কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতেই কত নূতন নূতন কর্ম্মফলের সৃষ্টিপূর্ব্বক কত সুখ-দুঃখময় ভোগ-সম্বন্ধের সহিত জড়াইয়া যাইতেছে। অন্ধ বা নিদ্রিতের ন্যায় অজ্ঞানী-জীবের প্রায় সকলেই তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখিতেছে না—ইহাই সেই 'অবিদ্যা-জাল'; ইহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে না পারিলে, জীবের আর উপায় নাই। তাই পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমদ্ ঠাকুর বলিয়াছেন – "আসক্তি-বিরক্তি-বর্জ্জিত হইয়া তোমার প্রারব্ধ-কর্ম্মসমূহের ভোগ সাঙ্গ করিয়া লও, তুমি তোমার সকল-কর্ম্মের সহিত তাঁহাতে 'যোগ' রাখিয়া, যথার্থ 'কর্ম্মযোগী'রূপে, তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া, সতত তাঁহাকে নিজ হৃদয়-আসনে স্থাপনা করিয়া, তোমারই জীব-ময় 'প্রাণের' উপর তাঁহার 'দিব্য-প্রাণের' সুপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রকৃত 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করিয়া, (তৎ+ময়=)'তন্ময়' হইয়া তোমার প্রত্যেক কার্য্য করিতে প্রয়াস কর, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তুমি 'কর্ম্ম-ফাঁস' হইতে অব্যাহতি পাইবে।"

তুমি যদি ভক্তিমান্ ও মুক্তিকামী হিন্দু-সন্তান হও, তবে অবশ্যই সেই পূত 'প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকটী' তোমার জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য অবশ্যই উচারণ করিয়া থাকিবে যে—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ

ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন (বা ত্বয়া হৃষীকেশি! হৃদিস্থয়া মে)। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥”

অর্থাৎ ধর্ম্ম কি, তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; অধর্ম্ম কি, তাহাও বেশ জানি, কিন্তু তাহা হইতেও আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। হায়, হায়, আমার কি হইবে প্রভো! হে হৃষীকেশ জগন্নাথ, বা হে হৃষীকেশি জগদীশ্বরি, আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক সতত আমার অন্তরে হৃদয়াসনে অবস্থিত হইয়া আমায় সকল-কর্ম্মেই নিযুক্ত করুন, আমি যেন নির্ব্বিকারে তাহা সম্পন্ন করিতে পারি। আমি এইরূপে সর্ব্বান্তকরণে যেন 'দাসভাবে' থাকিয়াই আপনার আদেশ মত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারি। প্রভো, আমার হৃদয়-স্বামি, আমার 'আমিত্ব'কে একেবারে ঘুচাইয়া দিন।”

এই মর্ম্মে প্রত্যহ প্রাতে 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' হইয়া ও তোমার জাগ্রত-অবস্থার মধ্যে, কোন্ দিন কয়টা কর্ম্ম তুমি করিতে পারিয়াছ? পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইবার সময়, একবার তাহাই স্মরণ করিয়া দেখ দেখি? বুঝিতে পারিবে—তোমার সে প্রতিজ্ঞার একটীও তুমি পূর্ণ করিতে পার নাই। একবারও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তোমার কোন কর্ম্মই তুমি সম্পন্ন করিতে পার নাই। সে সকল-কর্ম্মেরই 'কর্ত্তা' তখন তোমারও যেন অজ্ঞাতে ও অসাড়ে “তুমিই” হইয়া গিয়াছ! তোমার ভ্রান্ত অভিমান, তোমাকে অন্তরের দিকে তখন ফিরিয়াও চাহিতে দেয় নাই। তোমার কেন এমন হয়, তাহা কি বুঝিতে পার? বুঝি সেই 'শৃগালটার' মতই তোমার অবস্থা হইয়াছে। শৃগালটা, নিত্য বনে-জঙ্গলে চরিয়া উদর পূর্ণ করিয়া যখন তাহার গর্ত্তে ফিরিয়া আসে, তখন সেই ক্ষুদ্র-মুখ গর্ত্তে প্রবেশ করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট

হয়, তখন সে ক্লান্ত ও স্ফীতোদর-বিধায় মনে মনে চিন্তা করে যে, কাল বাহির হইবার সময় গর্ত্তের মুখটা আরও একটু খুদিয়া বাড়াইয়া দিয়া যাইব। কিন্তু বিশ্রামান্তে পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায়, সে কথা আর তাহার মনে থাকে না, বিশেষ তাহার উদরের সে স্ফীত-ভাব তখন না থাকায়, সেই গর্ত্ত হইতে বাহির হইবার কালে তাহার কোনই কষ্ট হয় না, সুতরাং অনায়াসেই সে বাহির হইয়া যায়, আর পুনরায় পেটের চিন্তাই তাহার প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু পেট ভরিয়া আহারান্তে বাসায় ঢুকিবার সময় আবার সেই দশা!

তোমারও তাহাই হইয়াছে, তোমার সেই নিদ্রান্তে প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা সমস্ত দিনের অভিমানপূর্ণ কর্ম্ম-ভারের মধ্যে আদৌ স্মরণে আসে না, পরিশ্রান্ত ও নিদ্রালসযুক্ত-দেহে শয়নের সময়েও তাহা ভাবিবার তিলমাত্র অবসর হয় না। আবার পর দিন প্রাতঃকালে কেবল সংস্কার-বশেই যেন একদমে সেই শ্লোকের 'উচ্চারণমাত্রই' করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হও, তাহার 'অর্থ' ও 'উদ্দেশ্য'-বিষয়েও ক্ষণমাত্র চিন্তা কর না। তোমার সমস্ত দিনের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, মান-নিন্দা ও সুখ-দুঃখাদি সকল-বিষয়েরই 'হিসাব' তোমাকে নিত্যই করিতে হয়, তাহা না করিলে, হয় ত তোমার নিদ্রারও ব্যাঘাত হয়—এমনই নিত্য-কর্ম্মের অভ্যাস বা সংস্কার-প্রভাব! কিন্তু তোমার আত্মার উন্নতিমূলক সেই প্রাতঃস্মরণীয়-মন্ত্র বা শ্লোকাত্মক 'প্রতিজ্ঞার' হিসাব তোমার সমস্ত-দিবা-রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের তরেও করিতে পার নাই! তোমার উক্ত লৌকিক-বিষয়সমূহের হিসাব-চিন্তার পর, নিদ্রা যাইবার সময়, সেই ভাবে সেই প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা-বিষয়ক হিসাবটী চিন্তা করিতেও নিয়মিত-

ভাবে অভ্যাস কর দেখি,—তাহার ফলে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইবে। যদিও দুই-পাঁচ দিবসের চিন্তার অভ্যাসে হয় ত ইহার কোনও ফল সহসা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, কিন্তু কিছুদিনের অবিচ্ছিন্ন নিত্য-অভ্যাসে বুঝিতে পারিবে যে, উহারও দৈনিক হিসাব ব্যতীত তোমার যেন নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে তখন মনে হইবে এবং তাহার সঙ্গে সর্ব্বকর্ম্মে না হউক, কোন কোন কর্ম্মে সেই 'প্রতিজ্ঞার' কথা, বুঝি তোমার স্মরণ হইতেছে, আর তাহারই ফলে—হৃদয়কমলস্থিত তোমার ইষ্ট-গুরুর পূত'মূর্ত্তির' বিমল প্রভা যেন পরিলক্ষিত হইতেছে। এইবার দেখিবে, তোমার প্রতিজ্ঞাপূরণের প্রকৃত ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। তুমি ক্রমে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তোমার সামান্য চেষ্টা ও অভ্যাসে তিনিও তোমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিবেন, তুমি তখন প্রকৃতই ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হইবে।

সংসারে ইহারই পবিত্র আদর্শ দেখাইবার জন্য সময় সময় মহাপুরুষবৃন্দের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা সংসারে সকল-কর্ম্মের মধ্যে আত্মাভিমানশূন্য-ভাবে সম্পূর্ণ আসক্তি ও বিরক্তি-বর্জ্জিত হইয়া, কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহাই দেখাইয়া জগতের শিক্ষার-পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া যান।

জগতের আদর্শ-পুরুষ আমাদের বিহারীলাল, আজ সেই 'প্রতিজ্ঞাপূরণের' লীলার বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার জননীর চরণ-প্রান্তে—দুইটীমাত্র 'লৌকিক-প্রতিজ্ঞা' ছিল। একটী তিনি জীবিতা থাকিতে, সংসার-ত্যাগ করিবেন না, দ্বিতীয়টী—তাঁহার পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত সন্ন্যাস লইবেন না। তাঁহার একটী ত ইতঃপূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়াছে,—তাঁহার গর্ভধারিণী পরমপদ লাভ করিয়া-

ছেন, এখন দ্বিতীয় কার্য্য পুত্রলাভ। শ্রীভগবান তাঁহার প্রতিজ্ঞা-পূরণের সহায়তা করিলেন—শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী গর্ভবতী হইলেন।

পুত্রলাভ ঃ—আশ্বিন মাস, বৃহস্পতি বার, ইং সন ১৮৯৪ অব্দে আটপাড়া-গ্রামে সাবিত্রী-মাতা একটী সুন্দর সুশ্রী নবকুমার প্রসব করিলেন। তখন মাতার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ এবং পিতা বিহারীলাল পঞ্চত্রিংশত বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বিহারীলাল, পুত্রের জন্ম-সংবাদ শুনিয়াই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে পত্র লিখিলেন—"মা পূর্ব্বেই ত দেহ-রাখিয়াছেন, বউয়েরও পুত্র-সন্তান হইয়াছে, মায়ের নিকট ও আপনাদিগের নিকট আমার যে 'প্রতিজ্ঞা' ছিল, তাহা এতদিনে পূর্ণ হইল। এখন আমি 'নিজ-কর্ম্মে' (সাধন-ভজনে) যাইব। ইত্যাদি"।

তিনি পুত্রের ষষ্ঠী-পূজার দিন নিজ শ্বশুরবাড়ী আটপাড়ায় যাইয়া পুত্র-মুখ দেখিয়া এক দিনমাত্র তথায় অবস্থান করিলেন ও পরদিন নিজ কর্ম্ম-স্থলে ফিরিয়া আসিলেন। তখন হইতে ছয় মাসের মধ্যে নিজ বাণিজ্য-ব্যবসায়-সংক্রান্ত 'লেন-দেন' সকলের সব মিটাইয়া দিলেন ও কারবার একেবারে তুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসল কার্য্যের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নব-কুমারটী ছয়মাসের হইল, শীঘ্রই তাহার অন্নপ্রাসন-সংস্কার হইবে, সকলে মহা আনন্দ-উল্লাস করিতেছেন, বিহারীলাল তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, নিতান্ত আগ্রহসহ সকলে তাঁহার নিকট অন্নপ্রাসনের প্রস্তাব করিলে, তিনি উদাস-ভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, এখন থাক, পরে হইবে।" আর কথা-বার্ত্তা কিছু নাই তিনি **তীর্থ ভ্রমণে** বহির্গত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও দুইমাস কাল অতিবাহিত হইল,

তিনি ফিরিলেন না, শিশুটী আটমাসের হইল, বাড়ীর সকলে পুত্রের 'অন্নপ্রাসনের' ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীমা শিশুকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী নারায়ণগঞ্জের বাসায় আসিলেন। বৈশাখ মাস—বৎসরের প্রথম মাস, শুভদিনে শুভক্ষণে শিশুর অন্নপ্রাসন-ক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় শিশুর নাম রাখিলেন—'শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ', রাশি-নাম হইল—'রাজেন্দ্রচন্দ্র', কিন্তু সকলে—'অনিল' বলিয়াই ডাকিতেন, সুতরাং 'অনিলচন্দ্র' খোকার 'ডাক-নাম হইল। মা ও জ্যেঠীমার প্রাণের পুতুল শিশুটী শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, ইং ১৮৯৫ অব্দে, সাবিত্রীমাতা তাঁহার মেজ-জা' শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর করে সন্তানটীকে সমর্পণ করিলেন, কারণ মেজঠাকুরাণীর সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া, পূর্ব্ব হইতে এইরূপই কথা-বার্ত্তা ছিল। বিহারীলাল মাতৃ-আজ্ঞায় দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিবার সময়েই এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারই সহধর্ম্মিণী সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। যেমন পতি, পত্নীও তদনুরূপা! এমন না হইলে, তাঁহার 'আদর্শ' কেমন করিয়া রক্ষা হয়! বাস্তবিক একমাত্র প্রথম-সন্তানের মমতা ত্যাগ করা নূতন প্রসূতির পক্ষে কি সাধারণ কথা? সকলই 'দৈবলীলা' বলিতে হইবে! আজ হইতে তাঁহার সন্তানটী যদি ও তাঁহার মেজ-জায়েরই হইল বটে, কিন্তু তিনি নিজ স্তন-দুগ্ধেই তাহার পালন-পোষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অপর্য্যাপ্ত স্তন-দুগ্ধে তাঁহার বড়-জায়ের ছেলে-মেয়েরাও তখন পরিপুষ্ট হইয়া ছিল।

সাক্ষাৎ সতীসমা সাবিত্রীমাতা আজ যথার্থই লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভগবতীর ন্যায় সংসারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরী হইয়াছেন, তাঁহার

রূপ ও গুণ আজ যেন এক হইয়া, এক বিরাট-স্বরূপে পরিণত করিয়াছে। শ্বশুর, ভাশুর, দেবর, জা, বউ, ঝি, ছেলে ও মেয়েরা এমন কি বাড়ীর চাকর-বাকর পর্য্যন্ত আজ মায়ের যত্ন-সেবায় একান্ত অনুগত, সকলেই মাকে আন্তরিক ভালবাসে। সকল কার্য্যেই যেন তিনি না দেখিলে, চলে না। বৃদ্ধ শ্বশুরের তামাক-সাজিয়া দেওয়া হইতে সংসারের যে কাহারও অসুখ-বিসুখে দেখা শুনা, সকলের সেবা-শুশ্রূষা আদি সব-কাজেই যেন তিনি অগ্রণী। এতদ্ব্যতীত এতবড় সংসারের রান্না-বান্না কার্য্য, সকলকে খাওয়ান-ধোয়ানও এখন প্রায় তিনিই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আবার অবসর পাইলে, সখ করিয়া ধান-কুটিয়াও লইতেন, তাহাতেও তাঁহার আলস্য বা অবসাদ ছিল না। তবে এই কার্য্যে প্রথমে অনভ্যাস থাকা প্রযুক্ত, তাঁহার বামপদে একটু বিশেষরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, সে চিহ্নটী তাঁহার চিরস্থায়ী হইয়া রহিল।

বাস্তবিক যে গৃহে যথার্থ লক্ষ্মী-শ্রী বিদ্যমান, তথায় বৌ-ঝিরা সহসা বিলাস-বিকৃত হইয়া যায় না, ইহা হিন্দুর ভাল 'বুনিয়াদী' ঘরেরই পরিচায়ক ; কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রভাবে ক্রমেই তাহার ভীষণ পরিবর্ত্তন ও ঘোর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সংসার ক্রমেই সেই পবিত্র আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অন্তঃসারশূন্য বৈদেশিক ও ম্লেচ্ছাচার-পূর্ণ ভোগ-সর্ব্বস্ব কর্ম্মসমূহের বাহ্য-অনুকরণে, কেবলমাত্র অতি বিসদৃশ বিলাস-বিকার-প্রবণতায় আমাদের পবিত্র সংসার ও সমাজ ক্রমেই যেন দীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। ইহার এইরূপ দ্রুত-প্রবদ্ধনশীল 'ভবিষ্যৎ' ভাবিলে, দেহ শিহরিয়া উঠে, ভয়ে প্রাণ-মন কাঁপিতে থাকে। হায়, আমরা দুই দিন আগে কি ছিলাম, আর আজ এই

কাল-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি ! ওঃ ইহাও আমাদের কি ভীষণ কু-কর্ম্মের ফল !

আহা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী মা-আমার, আবার কবে তোমারই মত কর্ম্ম-নিপুণা সর্ব্ব-সহিষ্ণু সেবা-পরায়ণা বৌ-ঝিতে হিন্দুর গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইবে, কবে তোমারই আদর্শে সকলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া সংসার মধুময় করিয়া তুলিবে ? আশীর্ব্বাদ কর মা,- —সংসার যেন তোমারই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তোমারই মত সতীত্ব ধর্ম্মে পরিপুষ্ট হয়। তুমি নামেও সাবিত্রী, কর্ম্মেও 'সাবিত্রী'। মা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

কর্ত্তব্য পালন।

সংসারে 'কর্ত্তব্য' বলিয়া যাহা অনেকেই মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তাহা যথার্থ কর্ত্তব্যবোধে প্রায় সকলে করিতে পারে না। অধিকাংশস্থলেই তাহা ভ্রান্ত বিষয়-ভোগের বাসনাপূর্ণ কেবল স্বার্থ ও মোহাদি রিপু-পরিচালিত কর্ম্মের বিকাশমাত্র হয়। স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়স্বজনের পালন-পোষণ, সকলের সহিত লৌকিকতাপূর্ণ আলাপ-আপ্যায়ন, দয়া, ক্ষমা, দান, প্রীতি, পরোপকার ও সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ আদি,জীবের সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের পিছনে একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন না কোন প্রকার স্বার্থ, মোহময়-আত্মতৃপ্তি, না হয় প্রতিদান-প্রাপ্তিমূলক গুপ্ত-আশা বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ ভ্রান্ত কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিবার ফলেই জীব পুনঃ পুনঃ কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয় এবং সংসারে 'আসা-যাওয়ার' চিরন্তন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু ও সাধনপরিপুষ্ট মহাপুরুষগণ, যে ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পালনপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রারব্ধ-ভোগের বিধি-নির্দ্দিষ্ট কাল-ক্ষয় করেন, তাহা প্রকৃতই এক অপূর্ব্ব বস্তু! সাধারণে তাহার যথার্থ মর্ম্ম প্রথমে আদৌ হৃদয়ঙ্গম কারতে পারে না বটে, কিন্তু পরে তাহা আর কাহারও কিছুমাত্র অপরিজ্ঞাত থাকে না।

বিহারীলাল তীর্থদর্শনের জন্য এই বারে যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন পূর্ব্বকথা মত সকলেরই জ্ঞাতসারে বা সকলকে এক

প্রকার বলিয়া কহিয়াই তিনি বাহির হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পিতৃভক্তি ও পিতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন-বিষয় তিনি বিন্দুমাত্রও ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি পিতার পবিত্র স্নেহ-আবেগ যে কত প্রবল, তাহা পূর্ব্ববারে তাঁহাকে না বলিয়া আসিবার কারণ বেশ ভালই বুঝিয়া ছিলেন। সুতরাং এ বারে তাঁহাকেও বিশেষ ভাবে বলিয়া কহিয়া আসিলেও, তাঁহার প্রতি নিজ কর্ত্তব্য-বিষয়ে তিনি অবহেলা করিলেন না। তিনি সাধুভাবে নিজ সাধন-ভজন ও একান্তবাসে মনোযোগী হইলেও, মধ্যে মধ্যে যাইয়া পিতাকে দর্শন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া যাইতেন। সে সময় তিনি পিতার নিকটে, কখন পনের দিন, কখন বা কুড়ি দিন করিয়া থাকিয়া, তাঁহার সেবা ও অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করিতে ক্রুটী করিতেন না। প্রথমে প্রথমে আসিয়া যত দিন থাকিতেন, পরে ক্রমে অল্প অল্প দিন করিয়া থাকিয়া যাইতেন।

তিনি ইং ১৮৯৪ অব্দে আশ্বিন মাসে তীর্থযাত্রা করিবার উপলক্ষে প্রথমে গৃহত্যাগ করেন। পর-বৎসর ৯৫ অব্দে বাটীতে আসিয়া পিতার নিকট কুড়ি দিন ছিলেন। এই ভাবে ৯৬ অব্দে আসিয়া পনের দিন ছিলেন। ৯৭ অব্দে দশ দিন থাকিয়া যান, ৯৮ অব্দে আট দিন, ৯৯ অব্দে বার দিন,১৯০১ অব্দে সাত দিনমাত্র এবং ১৯০৩ অব্দে একাধিক্রমে দুই মাস কাল থাকেন। শীতলাক্ষীর পূর্ব্বপারে 'নবীগঞ্জের' বাসায় আসিয়াই প্রায় থাকিতেন। এই শেষ বারে যখন তিনি এখানে আসেন, তখন তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া যান—"তোমার বন্ধন আর বেশীদিন থাকিবে না।"

তাঁহার পিতা যে সাধারণতঃ ধর্ম্মোন্মাদ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি অধিকাংশ সময় মনে মনে ধর্ম্মালোচনায় বিভোর

হইয়া থাকিতেন। সকলে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিত না। তিনি যেন 'পাগল সাজিয়া' আত্মগোপন করিয়াই থাকিতেন, কখন বা যা' তা' আবল-তাবল বকিতেন, কখন নিজ বিছানাপত্র নষ্ট করিয়া রাখিতেন, আবার সময় সময় এমন জ্ঞানের কথা বলিতেন, যাহা সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা করাও বুঝি অসম্ভব! তিনি পুত্র বিহারীলালের উন্নত মহাপুরুষ-লক্ষণ বেশ অনুভব করিতেন, সেই কারণ তাঁহার সঙ্গ ও তাঁহার দর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন এবং কখন কখন তাঁহার অদর্শনে যেন আকুল-হৃদয় হইতেন। সে বারে সেই উন্মাদ অবস্থাতেই, যে ভাবে দেশে দেশে ঘুরিয়া পুত্রকে অনুসন্ধান করিয়া বৃন্দাবন হইতে কাশী হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসেন ও সকলের দুঃখ-কষ্ট-চিন্তা দূর করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন, তাহা নিতান্ত সাধারণ-পাগলের কর্ম্ম নহে।

পুত্র যে নিজ সাধন-পথে থাকিয়াও কেবল তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতেই মাঝে মাঝে দেখা দিতে আসেন, সে কথা তিনি বেশ ভালই বুঝিতেন। সেই হেতু তিনি পুত্রের অনভিমতে বেশী দিন তাঁহাকে বাড়ীতে থাকিবার জন্য কখনই অনুরোধ করিতেন না। যাহা হউক, বিহারীলাল এই ভাবে কিছুদিন নিজ সাধু-জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যখন তিনি বহুদিন পরে পরে বাটীতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেন, তখন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা পিতাকে বলিতেন—"বাবা, আপনি উহাকে থাকিতে বলুন, তাহা হইলে, ও আর যাইতে পারিবে না।" ইহার উত্তরে বৃদ্ধ পিতা বলিতেন—"ও ভাল কাজই করিতেছে, ও আমাদের বংশের তিলক, উহাকে এমন সৎকার্য্যে বাধা দিব কেন?" আবার বিহারীলালকে

ডাকিয়া কখন কখন বলিতেন—"বাবা, তুমি যা' করিতেছ, বেশ করিতেছ, আমার জন্য একটু জায়গা রেখো" ইত্যাদি। ইহার দ্বারা পিতার মস্তিষ্ক-বিকার যে কিরূপ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক এমন উন্নত-হৃদয় পিতা না হইলে কি, এমন সৎ-পুত্রের জনকরূপে তিনি সম্মানিত হইতে পারিতেন?

পুত্র যখন যখন এইভাবে তাঁহাকে দেখিয়া-শুনিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন তিনি সেজ-পুত্রবধূ সাবিত্রীমাকে কত বুঝাইতেন, তাঁহাকেও তিনি প্রাণের তুল্য ভাল বাসিতেন। ভাল খাবার পাইলে, তাঁহাকে অগ্রে খাইতে দিতেন। প্রজারা প্রণামীদিলে, সেই টাকাগুলি তাঁহাকেই ডাকিয়া দিতেন। অন্যে কেহ যদি বলিত—"বাবা আমাদের কিছু দেন না।" তাহার উত্তরে বৃদ্ধ বলিতেন,—"আহা, বাছারে, উহার কে আছে? আমি না দিলে ওকে আর কে দেবে? তোমাদের ত দেবার লোক আছে!" সেজবৌ মা(সাবিত্রীদেবী) তাঁহাকে পিতার অধিক সম্মান করিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন! বস্তুতঃ তাঁহার জন্য অন্য কাহাকেও আর কিছুই করিতে হইত না।

পতির গৃহত্যাগের পর সাবিত্রী দেবীর নিজ দেহের প্রতি যেন ঔদাস্য জন্মিল। তিনি আর দেহ-রক্ষা-বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইলেন না, ফলে দিন দিন তাঁহার শরীর শীর্ণ ও অন্তরে অন্তরে তিনি জীর্ণ হইতে লাগিলেন। এই সময় পতি-সহায়-বিহীনা দেখিয়া তাঁহার কোন কোন আত্মীয় তাঁহাকে ভীষণ বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য চেষ্টারও কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু পতিপ্রাণা সতীর 'ধর্ম্মই' একমাত্র সহায়। সেই কারণ তাঁহার আত্মরক্ষা-কল্পে শ্রীভগবান অহরহঃ সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়াই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে

সহায়তা করিতেন। শত-চক্রান্ত ও বিপদ-জালের মধ্যে সেই বিপদভঞ্জন ভগবানই সতত তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষভাবে রক্ষা করিতেন! প্রকৃত সতীর 'তেজ' বিপদের সময়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 'সতীত্ব'ই নারীর ভূষণ, 'সতীত্ব'ই তখন নারীর সেই পরমপদ প্রদর্শন করাইয়া দেয়।

তাঁহার পতি বিহারীলাল সংসার-ত্যাগ করিলেও, নিষ্কাম কর্ত্তব্য-পালনরূপে যেমন তিনি সময় সময় পিতাকে দর্শন দিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করিয়া যাইতেন, সেই সঙ্গে নিজ স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও যেন তাঁহাদের অজ্ঞাতেই নিজ পবিত্র নিষ্কাম-কর্ম্মের অপূর্ব্ব আদর্শ ও উপদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের মতি-গতিও পরীক্ষা করিতেন। স্ত্রী কেমন করিয়া, দিনাতিপাত করিতেছে, কি ভাবেই বা সন্তান-প্রতিপালন করিতেছে এবং সন্তানের প্রতি মায়া-মমতাই বা কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই সকল-বিষয়ও তিনি লক্ষ্য করিতে অবহেলা করিতেন না।

তাঁহার সন্তান শ্রীমান্ অনিলবাবাজী রূপে-গুণে সমান, যেমন দেখিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট, তেমনই বিনয়ী ও অমৃতভাষী, কাহারও সহিত তাহার কলহ-বিবাদ ছিল না। সুতরাং আত্মীয়-বর্গের প্রত্যেকেরই অতীব প্রিয় ও আদরের ধন হইয়া ক্রমে সকলেরই যেন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সে তাহার বিমাতা অর্থাৎ শ্রীমতী দক্ষিণাদেবীরও নিতান্ত স্নেহের নয়নমণিরূপে পরিণত হইল। সকলের আদর-যত্নে বালক ক্রমে পাঁচ বৎসরের হইলে, তাহাদের নারায়ণ-গঞ্জের বাসায় এক শুভদিনে তাহার বিদ্যারম্ভ (হাতে-খড়ী) অনুষ্ঠান হয়। তাহার দিন দিন লেখা-পড়ায় ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ও সকলের

প্রতি যত্ন-মমতা এবং তদনুরূপ মিষ্ট-ভাষিতা অসাধারণ ছিল। পিতা সাধু হইয়া চলিয়া যাওয়া হেতু, উভয় মাতাই সতত ম্রিয়মাণ ও দুঃখিতা থাকিতেন, বিশেষ তাহার বিমাতার কষ্টে সে বিশেষ দুঃখ বোধ করিত। সেই কারণ তাঁহার গলা জড়াইয়া কতই আদর করিয়া সে বলিত,—"মা আমি বড় হয়ে, টাকা রোজগার করে, আপনার সকল কষ্ট দূর কর্‌বো" ইত্যাদি।

এই ভাবে বালক সকলের স্নেহ-যত্নে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ফাল্গুন মাসে এক শুভদিনে রাজদিয়ার বাটীতে তাহার শুভ 'উপনয়ন'-কার্য্য অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইং সন ১৯০৩ অব্দে যখন সাধুবিহারী লাল স্বইচ্ছায় শেষবার দেশে আসেন, তখন একাধিক্রমে দুইমাস কাল তিনি থাকিয়া যান। সেই সময় তাঁহার সন্তানটীও নিত্য পিতাকে প্রণাম করিতে যাইত। তিনি সন্তানকে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সমস্তই জানিতে পারিলেন। একদিন বালকের অসাক্ষাতে সাবিত্রীদেবীকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ,তুমি ক্রমেই দেখিতেছি সন্তানের মোহে যেন অভিভূত হইতেছ, এখনও সাবধান হও, আত্ম-লক্ষ্যে মনোযোগী হও, নতুবা পরে দুঃখ পাইতে হইবে। এছেলে কেবল আমার 'প্রতিজ্ঞাপালন' ও 'কর্ম্মক্ষয়' করিতেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। নিজের ও তোমারও পরস্পর কর্ম্ম-সম্বন্ধের কাল অতীত হইলেই, ও চলিয়া যাইবে। পাঁচ বৎসর কালের মধ্যেই তাহা হইবে।"

সাবিত্রীমাতা পতির মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিবামাত্র একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, ছিন্নমূল-লতার ন্যায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়ি-

লেন। তাঁহার মুখে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, তিনি অতিকষ্টে আত্ম-সংযমপূর্ব্বক কিয়ৎপরে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া, নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সন্তানের কল্যাণ কামনায় যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াই, পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ? উনি (তোমার পিতা) তোমার প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইলেন কেন?" বালক, কোনরূপ অপরাধ ত করে নাই, সেই বেচারা মায়ের কথা শুনিয়া বলিল—"না মা, আমি ত কোন দোষ করিনি।" মাতা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না,—কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন! "একে স্বামী সংসারে উদাসীন, এই একমাত্র সন্তানটীর মুখ চাহিয়া কোনরূপে দিন-যাপন করিতেছি, তাহাও ভগবান রক্ষা করিবেন না!" বিনা-মেঘেই বজ্রাঘাতসদৃশ এই ভীষণ ব্যাপার তিনি নিরবেই সহ্য করিলেন।

সংসারে সময় সময় এক এক ভাবের প্রবাহ আসে, যখন সম-শ্রেণীর ঘটনা-তরঙ্গই পুনঃ পুনঃ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সুখের সময় পর পর যেমন সুখেরই ঘটনারাশির সমাবেশ হয়, যদিও তাহা লোকের সুখ-ভোগরূপ লৌকিক-আনন্দের মধ্যে তাহার 'বৈচিত্র্য' ঠিক প্রায় কাহারও অনুভব হয় না, তাহা যেন অসাড়ে ও অজ্ঞাতে কোথা দিয়া সহজেই অতিবাহিত হইয়া যায়, কিন্তু দুঃখের সময় উপর্য্যুপরি যে, ভীষণ তরঙ্গমালা উত্থিত হইতে থাকে, তাহাতে সাংসারিক-জীব প্রায় একেবারে ম্রিয়মাণ ও জর্জ্জরিত হইয়া যায়। সেই শোক দুঃখময় তীব্র আঘাত যেন সকলকেই পদে পদে দলিত ও মথিত করিতে থাকে, তাহাতে জীব-জগৎ তখন স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া উঠে এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যায়।

প্রথমতঃ শ্রীমান্ অনিলের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় অর্থাৎ বিহারী-

লালের জ্যেষ্ঠ মধ্যম সহোদর যাঁহার স্ত্রী বিহারীলালের এই 'স্ত্রী-পুত্রের' সম্পূর্ণ ভার লইতে প্রতিশ্রুতা হইয়াছিলেন, যাঁহার ঐকান্তিক পুত্রবৎ স্নেহ-যত্নেই অনিল এতদিন সুখে লালিত-পালিত হইতেছিল, সেই 'নবীনবাবু' আজ সহসা ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ মহেশচন্দ্র তখনও জীবিত, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চুরানব্বই বৎসর। এই বয়সে এ-হেন পুত্রশোক তাঁহাকে কতটা তীব্রভাবে যে আঘাত করিল—তাহা কথায় প্রকাশ করা বাস্তবিক অসম্ভব! যদিও সেই শিবস্বরূপ অচঞ্চল মহাপুরুষের বাহ্য-লক্ষণে কিছুই প্রকাশিত হইল না, কিন্তু প্রত্যেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা সহজেই অনুভব করিতে লাগিলেন। তবে এই ঘটনার পর তিনি যে বাহ্যতঃ অনেকটা বলহীন হইয়া পড়িলেন, তাহা সকলেই বুঝিত পারিল। সাবিত্রীমা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। দেখিতে দেখিতে দুইটী মাস অতীত হইল, তখন —অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছে। বৃদ্ধ বেশ সহজ-দেহে একদিন আহারাদির পর সকলের সহিত সরলভাবে কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে—নিজ 'দেহ-রক্ষা' করিলেন। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া সহসা কেহই কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না যে, মহেশচন্দ্র আজ প্রকৃতই মহেশ্বররূপে ইহধাম ছাড়িয়া স্বধাম কৈলাস যাত্রা করিলেন। সকলেই যেন তখন অবাক্ ও চমৎকৃত হইয়া যাইলেন। সকলেই পুণ্যবান মহাপুরুষের পবিত্র পদধূলি লইয়া ধন্যধন্য করিতে লাগিলেন। কথায় বলে "জপ্ তপ্ কর কি মর্‌তে জান্‌লে হয়"। যথার্থই এমন মরণ যে, বহুপুণ্যের কথা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহা হউক বৃদ্ধের পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে তাঁহার শবদেহ

ফুল-বিল্বদল দ্বারা আবৃত করিয়া একখানি নৌকায় উঠান হইল ও ষ্টীমারের সহিত সেই নৌকা বাঁধিয়া, তাঁহার বাস-ভূমি রাজদিয়ায় লইয়া যাওয়া হইল। তথায় তাঁহার কনিষ্ঠা-পত্নীর যে-স্থানে 'সৎকার' হইয়াছিল, সেই স্থানেই চিতা রচনা করিয়া তাঁহার নশ্বর দেহখানি ভস্মীভূত করা হইল। তাঁহার সংসার-ভোগের শেষ-কার্য্য এইভাবে পরিসমাপ্ত হইল। এইবার মহা সমারোহে যথা-বিধি তাঁহার শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার প্রতি পুত্রাদির 'কর্ত্তব্য-পালন'রূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তিম-কর্ম্মও যথাসময়ে সুসম্পন্ন হইল।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

কাল-চক্র সদাই অবিরোধে ঘুরিতেছে, তাহার ত ক্ষণমাত্রও বিরাম নাই, সাংসারিক-জীবের প্রারব্ধ-কর্ম্মের বিধি-নির্দ্দিষ্ট ভোগেরও তিল-পরিমাণ বিশ্রাম নাই! শ্রীমৎ বিহারীলালের ভ্রাতা ও পিতার এইরূপ শেষ বিচ্ছেদ-জনিত সংসারের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় বিক্ষেপ উত্থাপন করিয়া গেল। বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে—১৯০৮ খৃষ্টাব্দের—বাঙ্গলা শ্রাবণ মাসে, কোথা হইতে যেন এক ভীষণ 'কালমেঘ' ইঁহাদের সংসারাকাশে সহসা দেখা দিল। শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ তখন কিশোর-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বৎসর হইলেও, তাহার সুপুষ্ট নিরোগ ও নধর দেহ-কান্তিতে তাহাপেক্ষা বড়ই মনে হয়। নারায়ণগঞ্জের বাসায় সকলের স্নেহ-যত্নে অতি আনন্দে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতেছে। সহসা তাহার কেমন একটু জ্বর হইল, দুই এক দিনের মধ্যেই সেই জ্বর ক্রমেই যেন ভীষণরূপ ধারণ করিল। তাহাতে সকলেই যারপর নাই ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া, ভাল ভাল চিকিৎসক (ডাক্তার) ডাকাইয়া দেখাইতে

লাগিলেন। পাঁচ জন প্রতিষ্ঠাবান অভিজ্ঞ-চিকিৎসকের দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও জলের মত অসম্ভব অর্থব্যয় করিয়াও, রোগের কিছুমাত্র শান্তিবোধ হইল না। কেবলমাত্র একাদশ দিবসের জ্বর-ভোগেই বেচারা ক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িল। সাধুবাক্য লঙ্ঘন হইল না—দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ-সুলভ সেই কালমেঘ-খণ্ড যেন ঘনীভূত হইয়া, ইহাদের সংসারাকাশ একেবারে ছাইয়া ফেলিল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিধারার সহিত সাবিত্রীমাতার নয়নপুলিনে অজস্র অশ্রুধারার প্রবাহ মিলাইয়া দিয়া, অনিলকৃষ্ণ আজ চিরদিনের তরে মহাকালের কোলে অনন্ত অনিলাঙ্গেই মিলাইয়া গেল। সকলেই হায় হায় করিতে করিতে কেবল তাহার পরিত্যক্ত কলেবর বা দেহখানির দিকে তখন নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল।

অনেক সময় দেখা যায়, ভয়ানক কষ্ট ও দুঃখময় ঘটনার অন্তরালে যেন কত শান্তি ও অনন্ত সুখ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাবিত্রীমার পক্ষে বুঝি তাহাই হইল। তিনি পতির সেই আদেশ-ইঙ্গিত যেন এইবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—সন্তানের প্রতি স্নেহাত্মক মোহান্ধতা, পতির সহধর্ম্মিনী-ব্রতে বুঝি ঘোর বাধা দিতেছিল, মায়ার বন্ধন তাঁহাকে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যেন দৃঢ়তররূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পতির ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনুকরণ করা তাঁহার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইতেছিল না। আজ এই সুতীব্র আঘাতে তাঁহার সেই মোহপুষ্ট-হৃদয়গ্রন্থি একেবারেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। দৈবী-লীলা বা জীবের নিত্য-নিয়মিত প্রারব্ধ-কর্ম্মফল-রূপ ভোগ-সঙ্গ পূর্ব্ব হইতে সহজে কেহই বুঝিতে পারে না। অথবা অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহামায়ার ক্রিয়া-বৈচিত্র্য বাস্তবিক সাধারণ লোক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য! প্রিয় পুত্র-বিয়োগ-জনিত

তাঁহার সেই অবিরাম শোক-ধারা অনতিকাল মধ্যে কি জানি কেন সহসা ভিন্ন-গতি ধারণ করিল, তাঁহার অন্তর-নদীতে তাহা বিমল বৈরাগ্য ধারায় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি আর বুঝি গৃহে থাকিতে পারিলেন না। পতিগত-প্রাণা সাবিত্রী-সতীর চিত্ত পতি-চরণ-দর্শনাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখন দিবারাত্রি কেবল তাহারই সুযোগ অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

তীর্থদর্শন।

শ্রীমৎ বিহারীলালের সংসার-জীবনই এযাবৎ বর্ণিত হইল। এইবার তাঁহার 'তীর্থদর্শন'-উপলক্ষে গুরু-অন্বেষণ ও নিজ সাধনাদি-বিষয়ে যথাযথ ঘটনাবলীর উল্লেখ করিব।

ইতোপূর্ব্বে 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' অংশে 'ষষ্ঠাধ্যায়ে' উক্ত হইয়াছে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষ সময়ে, তিনি নিজ স্বাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্য সমস্ত উঠাইয়া দিয়া বাটীর সকলের অভিমতে 'তীর্থযাত্রা' করিতে বহির্গত হন। তখন তাঁহার সেই পুত্রটীর সবেমাত্র জন্ম হইয়াছে। সহধর্ম্মিনী সাবিত্রীদেবীকে বলিলেন—"তুমি ইচ্ছা করিলে, আমার সহিত যাইতে পার। পূর্ব্ব-কথামত মেজ-বৌদিকে তোমার সন্তান দিয়া দাও।" কিন্তু সবেমাত্র শিশু-পুত্রটীর মায়া ত্যাগ করা, তাঁহার পক্ষে তখন সম্ভবপর হইল না। তিনি যাইবার সময়—স্ত্রীকে 'পাঁচ হাজার' টাকা তাঁহার নিজ খরচের জন্য রাখিতে বলিলেন, স্ত্রী কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি পতির গতিক দেখিয়া, যেন কিঞ্চিৎ হতাশ-ভাবে মনের দুঃখে বলিলেন ঃ—"আমি টাকা লইয়া কি করিব? টাকায় আমার আর দরকার নাই। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।" তাহাতে বিহারীলাল আর কোনও কথা বলিলেন না। তিনি যথা-সময়ে শ্রীভগবানের নাম লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

যাইবার সময়, তাঁহার একজন এই পথের বন্ধু শ্রীমান্ কামিনী-

মোহন বসু মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ও একটী বিশ্বাসী ভৃত্যও তাঁহাদের সহিত যাত্রা করে। তিনি এই তীর্থভ্রমণ-উপলক্ষে নগদ 'ত্রিশ হাজার' টাকা বাহির করিয়া লইয়া যান।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্ **কামিনীবাবুর** কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ ইহাঁর নিকটেও শ্রীমৎ বিহারীলালের অনেক কথা আমরা স্বকর্ণেই শ্রবণ করিয়াছি। ইনি কিছু দিন তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সাধন-সঙ্গীরূপেও একত্র ছিলেন।

কামিনীবাবু কুলীন কায়স্থ-সন্তান; কলিকাতার প্রান্তে প্রসিদ্ধ 'বরাহনগর' গ্রামে নিজ মাতুলের বাসা বাটিতে, ইনি—সন ১২৬১ সালের চৈত্র মাসে (ইং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পৈত্রিক-বাটী কলিকাতার সন্নিকট 'চেৎলা' গ্রামে ছিল। ছয় মাস বয়ঃক্রম-কালেই ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার 'কাকিমা'ই ইঁহাকে আশৈশব প্রতিপালন করেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি ও জীবনের প্রারব্ধ-কর্ম্মপ্রবাহও এক প্রকার অদ্ভুত ছিল। কেবল যে মাতৃহীন কামিনীমোহনই তাঁহার স্নেহ-প্রতি-পাল্য ছিল, তাহা নহে; তাঁহার এক মাসতুত-ভাইয়ের এইরূপ একটী মাতৃহীনা কন্যাকেও তিনি সমানভাবে লালন-পালন করি-তেন। বালিকাটী ইঁহার অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও, পীঠোপিঠী ভাই-বোনের মত খেলা-ধূলায় বেশ আনন্দে বর্দ্ধিত হইতে লাগি-লেন। কাকিমার মনে হইল, এ-দুটীর বিবাহ দিলে বেশ হয়। যেমন ইচ্ছা—তেমনই কাজ। কেহ তাহাতে বাধা আপত্তি করি-লেন না। অল্প বয়সেই উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন হইয়া গেল। যথা সময়ে ইঁহাদের একটী পুত্র-সন্তান হয়, সেটী সাড়ে-তিন বৎসর

হইয়া সহসা মারা যায়, তৎপরে দ্বিতীয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে, সতের দিন পরে, সেটীও মারা যায়। সেই সূত্রে প্রসূতিও—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মারা যাইলেন। পর বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি কাশীধামে আসেন ও প্রারব্ধবশে অল্পদিনের মধ্যেই এখানে পুলিসে ইঁহার 'সব-ইনিস্‌পেক্‌টারী' কাজ জুটিয়া গেল। কিছু দিন কাজ করিয়া দেশীয় পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের সংসর্গে চিত্ত ক্রমাগত কলুষিত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন ও কাশীতেই 'রেলের' চাকরী গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে এলাহাবাদ, কানপুর, আদি স্থানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া মধ্য-প্রদেশে (সি, পি,) চলিয়া যান এবং তথায় ফরেষ্ট-ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৮৮৭ অব্দে 'বেঙ্গল-নাগপুর রেলের' একজন 'কণ্ট্রাক্টারের' সহিত মিলিয়া সেই কার্য্যও করেন। সেই উপলক্ষে 'ওয়ালটেয়ারে' দেড় বৎসর কার্য্য করিবার পর, 'গৌহাটী' চলিয়া যান। তথা হইতে ১৮৯৪খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সেখানকার চাকরীও পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে চলিয়া আসেন। কোন একটী কুম্ভমেলা-উপলক্ষে একমাস অবস্থানের পর ফাল্গুণ মাসে বৃন্দাবনে যান। তথায় বিহারী-লালের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়।

বিহারীলাল তখন উমাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক লালাবাবুর এক কর্ম্মচারীর নিকট থাকিতেন। উভয়ের মনের গতি তখন একই প্রকার, সুতরাং সর্ব্বদা নানা ধর্ম্মালোচনা ও বন-ভ্রমণ আদিতে তাঁহারা চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিয়া, বৈশাখ মাসে হরিদ্বারের দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় সর্ব্বদা সাধুদর্শন করিতে করিতে, পরস্পর সৎসঙ্গে, পরম আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 'কেদার-বদরী'-দর্শনে যাইবার জন্য দুইজনই প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা বিহারীলাল অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার আর সে সময় যাওয়া হইল না, কামিনীবাবু একাই চলিয়া গেলেন।

উত্তরাখণ্ডের নানাতীর্থ দর্শন করিয়া যখন ইনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি, বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তখনও বিহারীলাল অন্যত্র কোথাও যান নাই। প্রায় একমাস কাল দুইজনে পুনরায় একত্র-বাসে সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিলেন। শ্রাবণ মাসে গঙ্গার জল একেবারে ঘোলা হইয়া গেল। এ সময় হরিদ্বারে জলের একটু কষ্ট হয়, লোকের স্বাস্থ্যও প্রায় ভাল থাকে না, সকলেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে বিশেষ কষ্ট পায়। সেই কারণ সাধু-সন্ন্যাসী আদি সকলেই প্রায় অন্যত্র চলিয়া যান। বিহারীলাল 'চণ্ডীর'-পাহাড় হইয়া,একাই উপরে উপরে উত্তরাভিমুখী হইয়া উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার সবই অদ্ভুত! তাঁহার এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য সময় সময় তাঁহাকে যে ভীষণ বিপদ ও ভাগ্য-বিপর্য্যয় ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার মধ্যে দুই একটী ঘটনামাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে:—তিনি বনে বনে ভ্রমণকালে, রাত্রিতে নিত্য সুবৃহৎ বৃক্ষের উপর উঠিয়া তাহার স্থূল শাখার উপর অর্দ্ধ-শায়িতভাবে অবস্থান করিতেন। এ অভ্যাস তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। পড়িয়া যাইবার ভয়ে, কাপড় দিয়া নিজের দেহখানি গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিতেন। হাতের যষ্টিটী হাতের ও পায়ের মধ্যে সাবধানে রাখিতেন। একদিন একটা সুবৃহৎ চিতা-বাঘ তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আক্রমণ করে, তাঁহার উরুদেশ হইতে নখ দিয়া আঁচড়াইয়া দেয়, একস্থানে দাঁতও

বসায়, কিন্তু বাবাজী তাহাতে বিচলিত না হইয়া, তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলেন—"কিরে আমাকে খাবি ?—খা।" তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, হিংস্র-জন্তুকেও সাদর-ব্যবহার করিলে, সে বিশেষ ক্ষতি করে না। বাস্তবিক তাহাই হইল—সেই ভীষণ ব্যাঘ্রটী যেন কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। আর তাঁহাকে আক্রমণ করিল না। তাঁহার উরুতের সেই ক্ষত-চিহ্ন আজীবন বিদ্যমান ছিল।

এইভাবে সময় সময় অরণ্য ও তদন্তর্গত গ্রামের মধ্যে নানা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়া, তিনি ভগবানের অপার প্রত্যক্ষ করুণা দর্শনপূর্ব্বক চমৎকৃত হইয়া ছিলেন। অন্য এক সময় তিনি অরণ্য-মধ্যে চারি পাঁচ দিন কোনরূপ আহার্য্য না পাইয়া কাতর হইয়া ছিলেন। ক্ষুধায়, দুর্ব্বল হইয়া একস্থানে আপন মনে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটা চিলের পদস্খলিত হইয়া রুমালে বাঁধা একটী পুঁটলী নিকটে পতিত হইল। তিনি তাহা দেখিয়া তথা হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন,—উদ্দেশ্য, চিলটা তাহার পুঁটলীটা আবার উঠাইয়া লইয়া যাইবে। তিনি অন্যত্র যাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে, সেই চিলটা পুঁটলিটী উঠাইয়া পুনরায় তাঁহারই সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তিনি এবার ভাবিলেন, হয় ত শ্রীভগবানের কৃপায় ইহাতে আমার প্রয়োজনীয় কিছু থাকিতে পারে। তিনি তখন তাহা খুলিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে একেবারে অবাক্ হইয়া যাইলেন। তাহাতে কতকগুলি গরম 'লুচী', হালুয়া ও আলুর তরকারি ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে এমন অবস্থায় ভগবানের অসীম করুণা-দৃষ্টে তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে, কয় দিব-সের পর কিছু আহার করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিলেন। শুধু

তাহাই নহে, অদূরে একটা ডোবারমত দেখিয়া, তাহাতে জল পান করিতে যাইলেন, কিন্তু সে জলে পাতা পচিয়া অতি দুর্গন্ধ ও মলীন হওয়ায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে পানের অযোগ্য বোধে, তাহাতে কেবল মুখ হাত ধুইয়া, জলের অনুসন্ধানে চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদূর যাইয়াও জল না পাইয়া,হতাশভাবে এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন, তৃষ্ণায় আর চলিতে পারিলেন না। প্রস্রাব করিয়া তখন সেই তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, কিন্তু তৃপ্তি হইল না। এমন সময় কয়েকটী স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখ দিয়াই মাথায় কলসী করিয়া জল লইয়া যাইতেছেন, দেখিতে পাইলেন। তেমন জন-মানব-হীন জঙ্গলের মধ্যে তাঁহাদের দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহার নিকটে আসিয়া পড়িলেন ও মাথার কলসী নামাইয়া বলিলেন—'জল খাবে ?' মেয়েটী তাঁহাকে অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করাইয়া তখনই চলিয়া যাইলেন। তিনিও জলপানান্তে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ভগবতী-বোধে প্রণাম করিলেন। কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তাঁহারাও অমনি দূরে কোথায় সেই বনের মধ্যে যেন মিশিয়া গেলেন।

এই সময় তিনি কোন কোন দিন সুযোগ পাইলে, কোন গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিয়া 'আটা' আদি সংগ্রহপূর্ব্বক 'লিট্টি' পুড়াইয়া লইতেন ও নিজ ঝোলার মধ্যে তাহা রাখিয়া দিতেন। ক্ষুধার সময় তাহারই দুই একটীমাত্র খাইয়া দিনাতিপাত করিতেন।

তিনি তখন ভিক্ষার সময় তাঁহার লোটাটী একেবারে এক-জনের নিকটেই পূর্ণ করিয়া লইতেন। তাহা অপেক্ষা কেহ কম দিলে, তিনি তাহার ভিক্ষা লইতেন না। এক সময় একজনের নিকট

এইরূপ ভিক্ষা করিতে যাওয়ায়, সে ব্যক্তি লোটাটী পূর্ণ করিয়া না দেওয়ায়, তিনি তাঁহার ভিক্ষা লন নাই। তাহাতে সে ব্যক্তি একটু দুঃখ ও ক্রোধ করিয়া বলে যে, "আমার যদি পূর্ণ করিয়া দিবার শক্তি না থাকে, ভিক্ষায় আবার 'জবরদস্তি' কি?" তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে তথা হইতে চলিয়া যাইলে, সে ব্যক্তি তখন তাঁহাকে বার বার সাধ্য-সাধনা করিতে থাকে, কিন্তু তিনি তাহা আর গ্রাহ্য করিলেন না। ইহার পর একজন লোক চাউল ও এক ঢেলা সৈন্ধব-লবণ দেয়, তিনি তাহাই লইয়া যান। পরে যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, ঠিক তাঁহার পিছনে হটাৎ তাঁহার নজর পড়ায় দেখিলেন, একটী লাউগাছ ও তাহাতে কয়েকটী ছোট ছোট লাউ হইয়াছে, তিনি একটা লাউ ভাতে দিয়া সে দিন ভোজন করিলেন। এই ভাবেই নানা ঘটনার মধ্য-দিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

যাহা হউক কামিনীবাবু পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কিছু-দিন পরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন ও নানা তীর্থদর্শন করিতে করিতে —১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরেই প্রসিদ্ধ যোগাচার্য্য-প্রবর পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় গুরুদেবের নিকট ইনি দীক্ষিত হন এবং সেই অবধি অধি-কাংশ সময় কাশীবাস করিতে থাকেন।

শ্রীমৎ বিহারীলাল 'উত্তরাখণ্ড' পরিভ্রমণ করিয়া, পর-বৎসরে কাশীতে ফিরিয়া আসেন ও কামিনীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সংক্ষেপে প্রকাশ করেন যে, "হিমালয়ের কোন নিভৃত-প্রান্তে কোন অসাধারণ মহাপুরুষের নিকট তিনিও 'দীক্ষা' গ্রহণ করিয়াছেন।

কামিনীবাবু বলেন—"তখনও তাঁহার শিখা-সূত্র ছিল ও তাঁহার গুরুর উপদেশ-ক্রমে নিত্য নূতন হাঁড়িতে স্বয়ং অন্নপাক করিয়া তিনি ভোজন করিতেন। শীতলা-মন্দিরের নিকটেই তখন তাঁহার আসন ছিল। এইভাবে দুই মাস অতীত হইলে, পৌষ মাস নাগাইত তিনি হৃষীকেশের "ঝাড়ীতে" চলিয়া গেলেন। বহুকাল হইতে হৃষীকেশের 'ঝাড়িটী' সাধু-সন্ন্যাসীদিগের একটী বিরাট সঙ্ঘ-তপোবন ছিল। গঙ্গা ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমের ঠিক উত্তর দিকে বিস্তৃত শিলা-বালুকাময় সমতল ভূমির উপর নানা বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ অরণ্য ও অসংখ্য তৃণ-কুটীর অবস্থিত ছিল। সহস্রাধিক সাধু-সন্ন্যাসী প্রায় তথায় অবস্থান করিয়া, নিজ নিজ সাধন-ভজন করিতেন। তথায় কোন মহিলারই, রাত্রিকালে নিবাস করিবার আদেশ ছিল না, কেহ তথায় ধূম-পানাদিও করিতে পারিতেন না। খুব কঠোর নিয়মাধীন হইয়া সকলকে তথায় থাকিতে হইত। পূর্ব্বে সে স্থানে যাইলে, সেই সমবেত সাধুদিগের আচার-ব্যবহার দেখিলে, তাঁহাদের সৎসঙ্গে চিত্তে যে, পূত-আনন্দ ও উৎফুল্লতা হইত, তাহা বর্ণনাতীত। পুরাণ-বর্ণিত 'তপোবন'সমূহের সেই প্রত্যক্ষ 'আদর্শ' দেখিয়া তখন প্রাণ-মন পুলকিত হইত—কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে বা বোধ হয় অসাধুর অধিক সমাগমে, সেই স্থানের সে মাহাত্ম্য যেন ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল, কলুষ-নাশিনী মা গঙ্গা, নিজ ক্রোড়ের উপর আর বুঝি সে হীনতা, সে পাপ, সহ্য করিতে পারিলেন না, বিগত সন ১৩৩০।৩১ সালে—ভীষণ বিপ্লব-বন্যায় সেই 'ঝাড়ীর' মূল পর্য্যন্ত তিনি একেবারে বিধৌত করিয়া দিলেন। এখন সে ঝাড়ীর আর চিহ্নমাত্রও নাই। এখনও সে ঝাড়ীর কথা স্মরণ করিলে, মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

আমাদের বিহারীলাল সেই 'ঝাড়ীর' মধ্যেই যাইয়া একটী কুটীরে একান্তে বসিয়া শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধনায় নিরত হইলেন। কিছুদিন পরে, তথা হইতে 'লছমন-ঝোলায়' যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় কতকগুলি স্বদেশ-ভক্ত সাধু, দেশের উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া, তাঁহাকেও নিজেদের দলে মিশাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অমত হওয়ায়, তিনি তথা হইতে গোপনে পলাইয়া পুনরায় কাশীতে আসিতে বাধ্য হন। এবার তিনি কাশীতে ছয় মাস কাল নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিয়াছিলেন। কামিনীবাবু প্রায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন ও কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। একদিন এইমাত্র প্রকাশ করিলেন যে, "অযাচিত যৎসামান্য অন্ন ও ফলমূলাদি যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমার যথেষ্ট হয়, আমি তাহাতেই পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট, আর কিছুই আমার প্রয়োজন নাই।" ইহার পর হইতে তিনি অঙ্গে বস্ত্র পর্য্যন্তও রাখিতেন না, সর্ব্বদাই নগ্ন হইয়া থাকিতেন। কোথাও আর যাইতেন না, কোন কথাও বলিতেন না। সময় সময় প্রয়োজন হইলে, কামিনীবাবুকে লিখিয়া মনের কথা বলিতেন। ইহার পর কামিনীবাবুর সহিত তাঁহার অনেক দিন আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এক দিবস শীতলার পাণ্ডার হাত দিয়া কামিনীবাবু একখানি 'গীতা' ও কিছু খরচ-পত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু গীতাখানি খানিক্ষণ দেখিয়া, আবার ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন, খরচ-পত্র আর ছুঁইলেন না।

এই সময় তিনি বাহিরে বা হরিদ্বার আদি স্থানে যাইতে হইলে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিয়া যাইতেন। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় কখন কখন কামিনীবাবুর সঙ্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিতেন। কামিনীবাবু শ্রীমৎ বিহারীলালের শেষ সময় পর্য্যন্ত অনেক ঘটনাই আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমরাও কামিনী-বাবুর সঙ্গে থাকিয়া ও স্বতন্ত্র-ভাবেও অনেক সময় অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কামিনী-বাবু এখনও উন্নত ও 'গুপ্ত-যোগী' ভাবেই কাশীবাস করিতেছেন, আমাদের সহিত ইনি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধযুক্ত। সে কারণেও বিহারীবাবার সম্বন্ধে অনেক কথাই ইঁহার নিকট জানিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। যাহা হউক এইবার অন্যান্য-সূত্রে তাঁহার 'তীর্থপর্য্যটন' ও পূর্ব্ববর্ণিত 'গুরুলাভ-বিষয়ে' যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই বর্ণন করিতেছি।

শ্রীমৎ বিহারীলাল, ভারতের প্রায় 'সমস্ত-তীর্থ', 'চারিধাম' পরি-দর্শন করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার মনোমত শ্রীগুরু-দেবের কৃপা-সঙ্গ এখনও হইল না। তাঁহার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, তাঁহার জননীর দেহত্যাগ সময়ে যে 'ইষ্টমন্ত্র' তাঁহার মুখে শুনিয়া-ছিলেন, সেই বাক্য যাঁহার মুখে বিনা-প্রশ্নে শুনিতে পাইবেন, তাঁহাকেই নিজ গুরুদেব বলিয়া বরণ করিবেন। এই ভাব তিনি নিজ মনোমধ্যে গোপন রাখিয়াই তীর্থে তীর্থে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিতেছিলেন।

ভারতের উত্তর-প্রান্ত হিমানী-মণ্ডিত পার্ব্বত্য-প্রদেশসমূহে তিনি এইবার পুনরায় প্রবেশ করিলেন। এই হিমালয়-পর্ব্বতমালা সাধারণতঃ 'উত্তরাখণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের পশ্চিম হইতে নেপাল-প্রদেশের পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত পার্ব্বত্যভূমি 'হিমাচল' নামে খ্যাত। ইহা আবার সাধারণতঃ পাঁচটী অংশে বা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। (১ম) পশ্চিম অংশ—"কাশ্মীরখণ্ড", তাহার ঠিক পূর্ব্বে

(২য়) অংশ—"জালন্ধরখণ্ড", অনন্তর (৩য়) বা মধ্য-বিভাগ—"কেদারখণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ, (৪র্থ) অংশ—"কূর্ম্মাচলখণ্ড" এবং (৫ম) বা শেষ অংশ—"নেপালখণ্ড" নামে পরিচিত, ইহাই ভারতের উত্তর অংশের শেষ পূর্ব্ব-বিভাগ।

এই পঞ্চ-খণ্ডের মধ্যে তৃতীয় বা মধ্য-খণ্ডেরই সম্মান অধিক। ইহা 'কেদারখণ্ড' নামে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ হইলেও, এক্ষণে ইহাকেই সাধারণ ভাবে **উত্তরাখণ্ড** বলিয়া সকলে অভিহিত করেন। এই অংশের এতাধিক মাহাত্ম্য হইবার কারণ এই যে,—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বা পবিত্রতমা নদী যাহা সুখদা-মোক্ষদা তথা পরম-গতি-প্রদা 'গঙ্গা' ও তদনুগতা 'যমুনা' নদীও এই প্রদেশ হইতেই জগতে অবতীর্ণা হইয়া,হিন্দুর চিরপূজ্য 'গঙ্গোতরী'ও 'যমুনোত্তরী' তীর্থরাজ-রূপে ইহা বিশ্ববিশ্রুত। তদ্ব্যতীত ভারতের প্রধান একাদশ জ্যোতি-র্লিঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ-লিঙ্গ—'কেদারনাথ', মহাশিবতীর্থ এই স্থলেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, ইহাই 'কেদারখণ্ড' বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের আদেশে শ্রীশ্রীকেদারনাথের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই কেদারখণ্ডের মধ্যেই ভগবান শ্রীবদরীনারায়ণেরও পবিত্র-ভূমি বিদ্যমান। এখানেই নর-নারাণ-রূপী মহাপুরুষের তপোভূমি। শ্রীমন্মহর্ষি ভগবান বাদরায়ণ-ব্যাসদেবের শ্রেষ্ঠ তপোবন বা 'আশ্রম' এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, ইহাকে 'বদরীকাশ্রম' নামে লোকে এখনও অভিহিত করে, এই আশ্রমে বসিয়াই তাঁহার 'বেদান্ত-সূত্র' রচিত হইয়াছিল, পরে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেবও এই তপোভূমিতে বসিয়াই, তাহার 'শারীরক' নামক সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই

কেদারখণ্ডকেই সাধারণতঃ সকলে 'কৈলাসভূমি' বলিয়া বর্ণনা করেন।

আর্য্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ-মধ্যে যে শাস্ত্রীয়-বচন প্রসিদ্ধ আছে—"স্বর্গে মন্দাকিনীস্তথা" ইত্যাদি ; সেই স্বর্গীয়-নদী 'মন্দাকিনী' এই কেদারনাথেরই সুপবিত্র-পাদ বিধৌত করিয়া ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। আবার 'অলকনন্দা-গঙ্গা' ও 'শ্বেত-গঙ্গাদি' মহাপুণ্য স্রোতস্বিনীসমূহও এই বদরী-কাননের মধ্যদিয়া প্রবাহিতা হইয়া মূল ভাগিরথী-গঙ্গাতেই নিজ নিজ অঙ্গ মিশাইয়া দিয়াছেন। যথায় মন্দাকিনী-অঙ্গে অলকনন্দা মিলিয়াছেন, তাহাই 'রুদ্রপ্রয়াগ', যথায় বিষ্ণুগঙ্গা অলকনন্দায় মিশিয়াছেন, তাহাই 'বিষ্ণুপ্রয়াগ'। এই বিষ্ণুপ্রয়াগের উপরেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য—'জ্যোতিঃশ্বর' শিবের অর্চ্চনা করিয়া 'জ্যোতির্মঠ,' 'জোশীমঠ' বা 'যোশীমঠ'—আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই আশ্রম বহুদিন যাবৎ ঘন অরণ্যানি পরিবৃত অবস্থায় সাধারণের পরিত্যক্ত ছিল। সম্প্রতি তাহার জীর্ণোদ্ধার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখনও তথায় শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত 'শাঙ্কর-গঙ্গা', 'শাঙ্কর-যমুনা' নামক ধারাদ্বয় অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এখনও 'ভক্তবৎসল' ভগবানের মূর্ত্তিসহ সেই প্রাচীন মন্দির তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 'পুণ্যাগিরী' দেবীর পবিত্র মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সকল প্রদেশে এক সময় মহাপুণ্যবান শৈবশ্রেষ্ঠ 'বাণরাজা' অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি হইয়া নিজ নূতন রাজধানী দ্বিতীয় 'শোণিতপুর' নামেই এই স্থলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী উষাদেবী এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরী-পার্ব্বতী মহামাতার নিকটে সর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। 'উষীমঠ' বা 'উখীমঠ'রূপে এখনও তাহার অক্ষয়

স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেদারনাথের পূজারী বা 'রাবলগণ' এখনও এই উখীমঠেই তাঁহাদের চিরস্থায়ী আবাস ও আশ্রম রাখিয়াছেন।

যথায় সেই স্বর্গীয় অলকনন্দা গঙ্গার অঙ্গীভূতা হইয়াছেন, তাহাই 'দেবপ্রয়াগ' বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ রহিয়াছে! এইভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থরাজসমূহ,যাহা এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে চিরবিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আবার এই কেদারখণ্ডেরই অন্তর্গত হওয়ায়, সাধারণভাবে ইহাই এক্ষণে "উত্তরাখণ্ড" নামে অভিহিত। এমন পবিত্র ভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে বার বার কাহার না ইচ্ছা হয়?

শ্রীমৎ বিহারীলাল, তাই এই কেদারখণ্ডে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গুপ্ত মনোগত অভিপ্রায় অনুসারে পুনরায় সেই অতি পবিত্র 'গঙ্গোত্তরী' আদি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া 'নাল-ঙ্গাকা ঘাট' অতিক্রমপূর্ব্বক তিব্বতের অন্তর্গত 'মানস-সরোবরের' দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিব্বতই সাধারণতঃ 'সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া শাস্ত্রে ও সাধুমুখে কথিত। এই তিব্বতের মধ্যেই সুপ্রসিদ্ধ 'কৈলাস'পর্ব্বত অবস্থিত। হিমালয়ের অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া মানস-সরোবরের ও কৈলাস-পরিক্রমার জন্য সাধু, ভক্ত ও সন্ন্যাসিগণ প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম-কালে গমন করিয়া থাকেন। ভারতের উত্তরাখণ্ড ও মানস-সরোবর পর্য্যন্ত সমস্ত হিমানী-মণ্ডিত অংশই সাধারণতঃ 'কৈলাস' নামে প্রসিদ্ধ হইলেও, সিদ্ধাশ্রমের মধ্যেই এই ভূতলস্থিত লৌকিক-কৈলাস-পর্ব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য,ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের চারিপ্রান্ত হইতে সমাগত যাত্রিগণ এই সিদ্ধাশ্রমের অন্ত-র্গত কৈলাসে ও মানস-সরোবরে যাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা

করিয়া থাকেন। সকল পথই দুর্গম ও অতীব কষ্টসাধ্য! হিন্দী-ভাষায় এক 'প্রবচন' প্রসিদ্ধ আছে যে,—

"মানস-সরোবর কোন্ পর্শে
যাঁহা বিনা-বাদল হিম-বর্ষে।
উড়ত-কস্কর জীব-তরসে
নর-নারায়ণ যায় পর্শে॥"

অর্থাৎ এ পথে বিনা-বাদল বা বিনা-মেঘেই তুষারপাত ও শীলাবৃষ্টি হয়, ঝড়ে পর্ব্বতের প্রস্তর-কঙ্কর উড়িতে থাকে, তাহাতে জীবমাত্রেই ভীষণ ত্রাসযুক্ত হয়, এমন ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিয়া মানস-সরোবরের সুপবিত্র স্নিগ্ধ সলিল কে স্পর্শ করিবে? কেবল নর-নারায়ণরূপে অতি ভাগ্যবান ও কষ্ট-সহিষ্ণু ভগবানের একান্ত ভক্তগণই তন্ময়-অন্তরে সেই পূত কৈলাস-পাদ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীমৎ বিহারীলাল যে পথ দিয়া কৈলাসের দিকে যাইলেন, সে পথে কেবল উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের লোকেই গমনাগমন করিয়া থাকেন। উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্য-ভারতের তীর্থপ্রেমিকগণ সচরাচর গড়বালস্থিত কেদার-বদরির পথে যোশীমঠ হইতে পূর্ব্বদিকের পথ দিয়া 'নিত্তিঘাট' হইয়া ভোট ও তিব্বত-রাজ্যের মধ্যে প্রথমেই 'দাপানারায়ণের' দর্শন করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে।

কোন কোন যাত্রীর দল হরিদ্বার, দেরাদুন, বিশের, পরে গঙ্গোত্তরীর পথ ধরিয়া পূর্ব্বকথিত ভাবে তিব্বতের মধ্যে প্রথমে গারতোক, থোলিঙ্গ ও মঙ্গলাঙ্গ স্থান হইয়া যাইয়া থাকে

নৈনিতাল, আল্‌মোড়া, বাগেশ্বর ও জোহার হইয়া যাইতে হইলে, প্রথমে শিবচিলিম্ ও জ্ঞানিম হইয়া অনেকে যাইয়া থাকে।

এইভাবে যাহারা মুলক্‌দারম হইয়া যায়, তাহারা তিব্বতে ছাগড়া স্থানে প্রথমে পৌঁছিয়া থাকে। মুল্‌ক্‌ব্যাস হইয়া যাত্রীরা প্রথমে তিব্বতে ডুম্‌জু্য পৌঁছে এবং মুল্ক-চৌদবাঁস হইয়া যাইলে, তিব্বতে প্রথমে 'ঠোকর' স্থানে যাইতে হয়। 'বীরজমলগঞ্জ' নেপাল হইয়া যাত্রীরা 'খোজরনাথ' স্থান দর্শন করিয়া যাইয়া থাকে। তিব্বত-প্রদেশের 'ব্যাপারি'-স্থান, লেদাক, গারতক, লাসা, তাকলাকোট, জ্ঞানিম্‌ ও দাপা আদির পথই এ দিককার সকল যাত্রীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুগম ও সরল। তিব্বতের পথে ব্যাপারিদিগের সহিতই যাইয়া যাত্রীদিগের কৈলাস ও মানস-সরোবর 'দর্শন' ও 'পরিক্রমা' করিতে হয়। তাহাদের সহায়তা ব্যতীত একা এ পথে যাওয়া সঙ্গত ও সম্ভবপর নহে। "জয় কৈলাসনাথ মহাদেবের জয়"! তাঁহারই কৃপায় জীব তাঁহার পর্ব্বত-পাদুকার পরিক্রম করিয়া থাকে। এই কৈলাসের উপরিভাগ চিরশুভ্র তুষার-মুকুটে সমাবৃত, নিম্নে চারিদিকে বিস্তৃত প্রান্তর ও হ্রদ। ইহার 'পরিক্রমা' প্রায় পঁচিশ মাইল পথ—পর্ব্বতের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। ইহার পূর্ব্ব,পশ্চিম,উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে—কয়েক স্থানে'লামা-গুরু' ও 'দেবমূর্ত্তি' আদির দর্শন হইয়া থাকে। এই সমুদায় স্থান তথায় 'গোনয়া' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রথমেই "লাণ্ডী-গোনয়া"—এই স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল ও অষ্টধাতু আদির নানা মূর্ত্তি ও'মহাদেব-পার্ব্বতীর'শঙ্খমর্ম্মর-নির্ম্মিত দিব্যমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্যান্য বহু দর্শনীয় মূর্ত্তিও আছে। এক 'অখণ্ড-দীপ' রাত্রি-দিন এখানে জ্বলিতেছে। উহার জন্য মণ মণ পরিমাণ ঘৃত সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ স্থানে লামা-গুরুগণই দেবমূর্ত্তির পূজারিরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন।

ইহাঁরা প্রায় সকলেই একান্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ, দীর্ঘজীবী ও বিদ্বান। অনেকেরই বয়ঃক্রম প্রায় দুইশত বর্ষেরও অধিক। ইহাঁরা ভিক্ষার জন্যও মুখে কথা বলেন না। যাত্রীদিগের মধ্যে চারি আনা, এক টাকা, বা যাহার যাহা ইচ্ছা 'প্রণামী' দিয়া যায়। এখানে চমরী-গাই ও ছাগলের দুগ্ধ হইতেই ঘৃত হইয়া থাকে, সেই ঘৃততেই পূর্ব্ব-কথিত 'অখণ্ডদীপ' দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে। এই প্রথম গোনয়ায় চারি-হস্ত দীর্ঘ দুইটী অপূর্ব্ব-দর্শন 'হস্তিদন্ত'রক্ষিত আছে। এত বড় হস্তিদন্ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয়-গোনয়া—এই উভয় স্থলেই পূর্ব্বোক্ত-রূপ দেবমূর্ত্তি-সকল ভক্তিভাবে দর্শনীয়। চতুর্থ-গোনয়ায়—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনীয় ও বিশেষ সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। লেণ্ডী হইতে চারি মাইল পরে "তেরফু-গোনয়ায়" অতি অদ্ভুত-দর্শনীয় চারি-হস্ত দীর্ঘ 'মহিষশৃঙ্গ' রক্ষিত আছে। তথা হইতে "গৌরীকুণ্ড" যাইতে হয়। সে পথে কিছু চড়াই উঠিয়া, তুষারাচ্ছাদিত প্রস্তরের নিম্নপথে দুর্গম পরিক্রমা করিতে হয়। গৌরীকুণ্ড হইতে সাত মাইল দূরে "জুলমফু-গোনয়া" দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অদর্শন-দর্শনীয় এক বিচিত্র-স্বরূপ স্ফটিক-শিলামূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এই স্থান হইতে দুই মাইল দূরে "গ্যাঙ্গটাঙ্গ-গোনয়া"। তথায় সকল গোনয়ার ব্যবস্থাপক প্রধান 'লামা-গুরুর' দর্শন হইয়া থাকে। সেই স্থানে পনের-হাত লম্বা একখানি বিশাল 'ব্যাঘ্র-চর্ম্ম' বিদ্যমান আছে।

এই কৈলাস হইতে তিন মাইল নিম্নে 'দারচিন-বাজার'। তথায় আহার্য্য আদি বস্তু পাওয়া যায়। 'গারফুল'-রাজার ব্যবস্থায়, তথায় 'সদাব্রত', 'ধর্ম্মশালা' বা যাত্রিদিগের থাকিবার স্থান আছে।

তথা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে "মান-তলাব" বা "মানস-সরোবর" হ্রদ এবং "রাক্ষস-তলাব" বা রাবণ-হ্রদ",যাহা 'সনাতন' ও 'বৌদ্ধ' উভয়-সম্প্রদায়েরই 'তীর্থরাজ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হ্রদ পনের-মাইল দীর্ঘ ও এগার-মাইল প্রস্থ।

আমাদের শ্রীমৎ বিহারীলাল এই সকল দুর্গম তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এখানে ক্রমেই যেন তাঁহার ভ্রমণ-পিপাসা মন্দীভূত হইতে লাগিল। তাঁহার আর এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে মন সরিল না। তিনি তখন একই স্থানে বার বার ঘুরিতে লাগিলেন। এমন মনোরম স্থান তিনি আর কুত্রাপি দর্শন করেন নাই এবং 'মানসের' ন্যায় এমন অমৃত-স্বরূপ জলও কোথাও পান করেন নাই। তিনি তাহাতেই যেন পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শান্তির-বারি এখনও পরিদৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া, তিনি অন্তরে গভীর দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

শ্রীগুরু-লাভ ও সাধনা।

সিদ্ধাশ্রমে মানস-সরোবরের এই পবিত্র-তটে বিহারীলাল শ্রীগুরু-লাভের আশায় মনের আবেগে এইভাবে যখন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর হইয়াছে। তাহা—ইং ১৮৯৭ অব্দের কথা। 'নীতিবাক্যে' উক্ত আছে—

"যাদৃশীর্ভাবনার্য্যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীঃ॥

যাঁহার যেমন অভিলাষ, তাঁহার সেইরূপ ভাবেই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। তবে সকল-সিদ্ধির মূলে তাঁহার জন্মার্জ্জিত গূঢ় প্রারব্ধই অলক্ষ্যে বিদ্যমান থাকে। সেই কারণে তাহা সময়-সাপেক্ষ। দেশ, কাল ও পাত্রের সমতা না হইলে, কখনও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তখন সেই 'প্রারব্ধ' তাহার সঙ্গ মিলাইয়া দেয়,—'পুরুষার্থ', তাহাতে উৎসাহ ও সাধন-সামর্থ্য প্রয়োগ করে এবং শ্রীগুরুদেব অসীম 'কৃপা'দানে, তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া দেন। তাই ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাসজী বলিয়াছেন :—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
কোয়লাকা ময়লা ছুটে
যব্ আগ্ করে পর্‌বেশ॥"

অর্থাৎ সদ্‌গুরু-সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে, সাধনার-ভেদ তিনি বলিয়া বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেন ও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন,

তখন কয়লার কালিমার ন্যায় শিষ্যের সেই পাপ-মলিনতাপূর্ণ ঘোর অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়। যেমন 'কয়লা' শত-সহস্রবার ধৌত হইলেও, তাহার 'ময়লা' কিছুতেই দূর হয় না, কিন্তু সামান্য এক-খণ্ড 'অগ্নিময় বস্তুর' সংযোগ হইলেই, তাহার অন্তর-বাহির সর্ব্বত্র জ্বলিয়া 'লাল' হইয়া উঠে, ফলে কয়লার মলিনতা তখনই সম্পূর্ণ ভাবে দূর হইতে দেখা যায়। এই ব্যাপারে 'সাধনার **তিনটী** অবস্থারই' যথাযথ প্রয়োজন লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—অগ্নির সংযোগ, দ্বিতীয়তঃ—কয়লার অগ্নি-গ্রহণ করিবার সামর্থ্য এবং তৃতীয়তঃ—অনুকূল বায়ুরূপ সাধন-প্রয়োগ। অগ্নির সংযোগই—'শ্রীগুরুর জ্ঞানময় আগ্নেয় উপদেশ', সদ্‌গুরু-লাভের পর,সাধনার ভেদ-বিধি ও নিয়মাদিসহ জ্ঞানের উপদেশ প্রদত্ত হইলেও,—'প্রারব্ধবশে শিষ্যের হৃদয়ে তাহা ধারণা করিবার শক্তি' না থাকিলে, অর্থাৎ কয়লা যেমন পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক না হইলে, তাহাতে সহজে আগুন ধরে না, সেইরূপ গুরুর জ্ঞানোপদেশও অনেক সময়ে সহজে শিষ্যের বোধগম্য হয় না; কিন্তু সেই ভিজা কয়লা অগ্নির সহিত সংযুক্ত রাখিয়া ক্রমাগত বাতাস দিলে, যেমন তাহা সময়ে নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া অগ্নিময় হইয়া উঠে; সেইরূপ গুরু-কৃপায় জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও,—ক্রমাগত 'সাধন-বায়ুর অনুকূল সহায়তা প্রদান' করিলে, অবশ্যই একদিন শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহার সাধনায় নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হইবে। অতএব সাধন-সম্পর্করূপ 'চেষ্টা' সাধকের পূর্ব্ব হইতেই অভ্যাস করিতে হইবে।

বিহারীলাল গুরুকৃপা-লাভের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অনুসন্ধান-রূপ প্রাথমিক যত্ন ও অদম্য চেষ্টায় সর্ব্বদাই নিয়োজিত রহিয়াছেন।

এত দিনে বুঝি তাঁহার প্রারব্ধের অনুকূল 'সঙ্গ' প্রাপ্ত হইবার কাল সমাগতপ্রায় হইয়াছে। তিনি নানাস্থানে নানা শ্রেণীর সাধু-সজ্জনের সঙ্গ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোমত উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান এত দিনেও মিলিল না। আজ সহসা এক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রতি বিহারীলালের অকস্মাৎ অহেতুকী-ভক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই যেন কি এক অপূর্ব্বভাবে বিমোহিত হইয়া যাইলেন। তাঁহার মনে হইল, ইনি নিশ্চয়ই আমার মনের কথা বলিয়া দিতে পারিবেন। বাস্তবিক সময় হইলে, এমনই হইয়া থাকে!

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক- কেবল ইহ-জন্মের সামান্য চেষ্টার ফল নহে। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া তাহার একটী ধারা যেন অবিরত ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। সে ধারার মধ্যে, সেই সকল জীবরূপ আত্মারই পুনঃ পুনঃ সংযোগ ঘটিতেছে, তাহার অন্যথা হইবার নহে। ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অধীন—'পিতৃলোকের' সহায়তায় জীবের 'ক্ষেত্র ও কুলগত-ধারায়' নিম্ন হইতে ক্রমে উন্নত বংশে জন্ম হয়; পালন বা পুষ্টি-কর্ত্তা বিষ্ণুর অধীন—'দেবলোকের' সহায়তায়, তাহাদের 'সুখ-দুঃখময় ভোগ-ধারায়' কর্ম্মসমূহের সম্পাদন করিবার সঙ্গে, ক্রমে কর্ম্মোন্নতি বা আত্মপুষ্টি লাভ হয় এবং লয় বা মুক্তিদাতা মহেশ্বরের অধীন—'ঋষিলোকের' সহায়তায় তাহাদের জ্ঞান-ধারায়' ক্রমশঃ উন্নত সাধনাময় মুক্তি-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই কারণ দেবতা, ঋষি ও পিতৃ-লোকের 'তর্পণ' বা তৃপ্তাত্মক পূজা সনাতন-ধর্ম্মানুগত নিত্য-কর্ম্মের অন্তর্গত 'অবর্জ্জনীয়-ক্রিয়া' বলিয়া চির-নির্দ্দিষ্ট। আবার মুক্তির অব্যবহিতপূর্ব্ব অন্তিম-সংস্কার বা চতুর্থাশ্রমসুলভ শেষ 'বিরজাযজ্ঞের' অনুষ্ঠান সময়ে

'ঋণত্রয়-মুক্তির' জন্য যে ক্রিয়া-বিধান আছে, তাহাতেও—'দেবঋণ', 'ঋষিঋণ' ও 'পিতৃঋণ' হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং মুক্তির পথে গুরু-শিষ্যের সংযোগ-সম্পর্ক, শিবাধীন সেই ঋষিদিগেরই অবিরোধ জ্ঞান-ধারার মধ্যে অনাদি কাল হইতে নিহিত রহিয়াছে। সেই কারণ গুরুই সাক্ষাৎ 'শিবস্বরূপ' বা একাধারে 'গুরুই—ব্রহ্মা, গুরুই—বিষ্ণু, গুরুই—দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং সেই গুরু-দেবই পরমেশ্বর বা পরমাত্মাস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।

আজ সেই 'সনাতন-ধারাধীন' হইয়াই,আমাদের বিহারীলালের গুরুদেবও যথা-সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় শান্তির আভাস প্রদান করিয়া সমুৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তিনি অবধূত পরমহংসাশ্রমী মহাপুরুষ, স্থানীয় লোকে "পাহাড়ীবাবা" বলিয়াই তাঁহাকে অভিহিত করিত। 'মানস-সরোবরের তটে তাঁহার প্রধান অবস্থিতির স্থান বা আশ্রম হইলেও, তিনি অনেক সময় পবিত্র গঙ্গোত্তরীর পর্ব্বত-গুহাতেও অবস্থান করিতেন। সেই কারণেই বোধ হয়, তাঁহাকে গুরুনির্দ্দিষ্ট অন্ত-রাদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, গঙ্গোত্তরী হইতে সিদ্ধাশ্রমের পথে যাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক প্রভু এত দিন পরে এত পথ ঘুরাইয়া যদিও বা কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন, কিন্তু কোন উপদেশই তখন তিনি দিলেন না, বরং তাঁহাকে 'বাঙ্গালী, বিলাস-পরায়ণ ও দুর্ব্বল-চিত্ত' বলিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন ও তথা হইতে তাড়া-ইয়া দিলেন। বিহারীলাল তাহাতে আদৌ পশ্চাৎপদ হইলেন না, দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন গুরুদেব সেই নবাগত শিষ্যের অবস্থা ও অধিকার-বিষয়ে

তাঁহার অন্তর-দৃষ্টি প্রয়োগ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই কারণ তিনি তাঁহার হৃদয়-বল ও একাগ্রতা-বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষার জন্য সহসা আর কোনও বাক্যালাপ না করিয়া, নিজগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক দিন, দুই দিন করিয়া দেখিতে দেখিতে এক পক্ষকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি আর বাহির হইলেন না, তাঁহাকে দেখাও দিলেন না। বিহারীলাল কিন্তু তদ্গত-চিত্তে প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই গুহাদ্বারেই পূজ্যপাদ গুরুদেবের একান্ত কৃপা-প্রার্থী হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি তীর্থদর্শনের উদ্দেশে যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার নিকট ত্রিশহাজার টাকা ছিল, ক্রমে ছাব্বিশ হাজার টাকা তিনি এত দিনে খরচ করিয়াছেন, এখনও তাঁহার কোমরে চারি হাজার টাকা বাঁধা রহিয়াছে। গুরুদেব তাহা কোনও রূপে জানিতে পারিয়া, বাহিরে আনিয়া অতি স্নেহভরে বলিলেন—"বেটা, তোমার কোমরে যে টাকা বাঁধা রহিয়াছে, উহার আর মায়া কেন? ঐ টাকাগুলি রাখিয়া আর কি করিবে?" গুরুদেব তাঁহার শেষ ত্যাগের সামর্থ্য পরীক্ষার জন্যই বলিলেন—"উহা এইবার 'হরিরলুট' (হরিন্নোট) করিয়া দাও।" বিহারীলাল আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তখনই তাহা ত্যাগ করিলেন, টাকাগুলি সমস্তই ফেলিয়া দিলেন।

ইহা দেখিয়া শ্রীগুরুদেব অধিকতর স্নেহ-সহকারে তাঁহাকে তখনই যথাবিধি দীক্ষা প্রদান করিয়া, তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাঁহার সেই মাতৃবাক্যও সেই সঙ্গে পূর্ণ হইল। সেই ইষ্ট-মন্ত্রই তিনি তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। বিহারীলালের এত দিনের চেষ্টা ও অভিলাষ আজ পরিপূর্ণ হইল। আজ নিজ

গুরুদেবের বিমল কৃপাধারা তিনি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন। নিজেকে যথার্থই আজ কৃত-কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের আজ্ঞায় তিনি এই সময় হইতেই 'মৌনব্রত' ধারণ করিলেন। অনন্তর গুরুদেব তাঁহাকে আদেশ করিলেন—যে, "এই ভাবে তুমি তিন বৎসর কাল একান্ত সাধন-ভজনে অতিবাহিত কর। হয় হরিদ্বারে, না হয় কাশীধামে, অথবা বৃন্দাবনে, যেখানে তোমার ইচ্ছা ও সুবিধা হয়, সেই খানেই থাকিয়া সাধন-নিরত হইয়া অবস্থান করিবে। তাহার পর পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" এই বলিয়া তিনি তখন শিষ্যকে বিদায় দিলেন।

শ্রীমৎ বিহারীলাল সাধনবিধি সমস্ত অবগত হইয়া শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করণান্তর তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক আর বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া, সেই গুহাদ্বার ত্যাগ করিলেন। তিনি সেই দিন হইতেই লোকের নিকট 'সাধু মৌনিবাবা'রূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই সিদ্ধাশ্রম ও চিরশীতল হিমগিরি অতিক্রম করিয়া পুনরায় ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত-অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হিমালয়ের পাদমূলে পবিত্র হৃষীকেশ ও মায়াপুরী বা হরিদ্বার তীর্থে কিছু দিন অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। দ্বাপরান্তের লীলাবতার পূর্ণকলা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পরম প্রিয়ধাম সুপবিত্র বৃন্দাবনের কুসুম-সরোবর—গকুল-কুঞ্জে নিজ সাধনার স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। তথায় তাঁহার খুড়া মহাশয় (শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য) শ্রীমৎ ভারতচন্দ্র দেব মহাশয়, পূর্ব্ব হইতেই 'রাধাকুণ্ডে' অবস্থান করিতেন। তাঁহার কথা ইতোপূর্ব্বে একবার উক্ত হইয়াছে। বিহারীলালের প্রথম নিরুদ্দেশের সময় বৃন্দাবনে এই স্থানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ বারেও

তিনি তাঁহার সাধনাশ্রমী ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুনরায় দেখিয়া আরও আনন্দিত হইলেন, তাঁহাকে অতি যত্নে নিজের নিকট রাখিয়া সর্ব্ববিষয়ে সাধনার সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং বাটীতে 'তার' করিয়া ও পত্র লিখিয়া তাঁহার সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-সহোদর তাঁহাকে বৃন্দাবনে দেখিতে আসিলেন ও তথা হইতে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে লইয়া আসিলেন। তথায় বড়-ভাই ও মেজ-ভাই 'পিতার ইচ্ছা' বলিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি তখন তাঁহাদের বলিলেন—"কাশী-গঙ্গা-বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া,এ খানে প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনারা আমায় বাটীতে লইয়া গিয়া আর থাকিবার জন্য অনুরোধ করিবেন না,—তবে আমি যাইতে পারি।" তদুত্তরে তাঁহারা বলেন—"বাবা ও বৌমা যদি কিছু না বলেন এবং তাঁহারা যদি তোমাকে আসিতে বাধা না দেন, তাহা হইলে. আমাদের আর কিছু আপত্তি থাকিবে না, আমরা কিছুই বলিব না" ইত্যাদি।

সেই কথামত বিহারীলাল তাঁহাদের সঙ্গে বাড়ীতে আসিলেন। তিনি পিতার মনোভাব বেশ ভালই জানিতেন এবং স্ত্রীর কথাও ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না! কিন্তু ভায়েরা পিতাকে বেশ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে,—"আপনি বিহারীলালকে বাড়ীতে থাকিবার জন্য বলুন।" তিনি মুখে তখন কোন কথা বলিলেন না, তবে ছেলেদের অনুরোধে, বিহারীলালের সম্মুখে আসিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন—"সন্ন্যাসের কি কাজ আছেরে নিমাই, আয় আয় বাছা আমার কোলে আয়!" ইত্যাদি। পিতা বড়-ছেলেকে সম্মুখে ডাকিলেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়াই বিহারী-

লালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাবা তোমার জন্য কাতর হন, কাঁদা-কাটা করেন, তুমি এ সব ছেড়ে দাও।" তখন বিহারীলাল পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যদি বলেন, আমি সব ছাড়িয়া দিই।" তখন তাঁহার পিতা নিজের দুই কানে হাত চাপা দিয়া বলিলেন—"বাবা! ও কথা বোলো না, ও সর্ব্বনাশের কথা, বল্‌তে নাই! শচীমার মাত্র এক ছেলে ছিল, তার চৌদ্দ বৎসরের স্ত্রী ঘরে, তিনি যখন ছেলেকে ও কথা বলেন নি, তখন আমি কেন বল্‌বো? আমি তোমার জন্মদাতা পিতা, এখনও আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, তাই আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আত্মোন্নতি কর, তুমি যথার্থ সাধু হইয়া আমাদের বংশের উদ্ধার কর—আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো। বিহারীলাল তখন আনন্দে হাসিমুখে উঠিয়া গেলেন। অন্যান্য ছেলেরা পিতার ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন।

ইতোপূর্ব্বে 'সপ্তম অধ্যায়ে' উক্ত হইয়াছে যে,—ইং ১৮৯৮ অব্দে তিনি বাড়ী আসিয়া আট দিনমাত্র ছিলেন। তখন তিনি নবী-গঞ্জের কাছারি-বাড়িতেই আসিয়া রহিলেন। সাবিত্রীমা, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্রকে (অনিলকে) নিজ মেজ-জায়ের নিকট দিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি পতির আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে তথায় যাইয়া নিত্য রন্ধনাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এক দিন পতিকে ভোজনার্থ অন্নাদি পরিবেশন করিয়া অন্য কর্ম্মোপলক্ষে বাহিরে আসিলেন, সম্মুখে তাঁহার দেবরকে দেখিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরপো, খোকা কেমন আছে, কাঁদে কি?" সাধু বিহারীলাল তাহা জানিতে পারিয়া, ভাইকে অন্য সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,

পত্নীর সন্তানের প্রতি এখনও মায়া রহিয়াছে। তিনি আর কিছু বলিলেন না। অনন্তর স্ত্রীকে সাধনোপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। তিনি তখন কাহারও সহিত একেবারে মিশিতেন না, সততই মৌন-ভাবে নিজ সাধন-ভজনে দিনাতিপাত করিতেন। এইভাবে এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিলেন।

অনন্তর তাঁহার অতীব প্রিয় ও পরে নিজ সমাধিভূমি পবিত্র কাশীধামে দশাশ্বমেধঘাটের উপর, শীতলা-মন্দিরের নিকট, নিজ আসন পাতিয়া একাগ্রভাবে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু কাশীর প্রসিদ্ধ গুণ্ডা বা দুষ্ট অসৎ লোকগুলি কি জানি কেন তাঁহার প্রতি ঘোর বিরুদ্ধাচরণ ও নানাপ্রকারে ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও বোধ হয় **নিজ ঘোর 'প্রারব্ধ-ভোগ'** এইরূপ ভাবনা করিয়া অকাতরে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। তখন তিনি নিজের 'ধূনী' রক্ষা করিতেন, তখনও 'বিরজা-যজ্ঞান্তে সন্ন্যাসাশ্রম' তিনি গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মচারী-যোগী সাধুরূপেই নিজের সাধনা পরিপুষ্ট করিতেছেন মাত্র। শীতলাঘাটের উপর সরস্বতীর মন্দিরের নিকট তখন তাঁহার ধূনী থাকিত।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। বাস্তবিক, সৎকার্য্যে যে পদে পদে বহু বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নানা বিঘ্নসঙ্কুল সাধন-পথে অনেক অপুষ্ট-সাধককেই সময় সময় অতীব অধৈর্য্য ও সাময়িকভাবে সাধনা-বিমুখ হইতেও দেখা যায়। তাহারা তখন নিজ অদৃষ্ট ব্যতীত শ্রীভগবানের উপরেও অযথা দোষারোপ করিতে ত্রুটী করে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই বিঘ্নপ্রদায়ক সঙ্গীদিগকে যথার্থ 'সাধন-শত্রু' জ্ঞানে

তাহাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাসহ ক্রোধ ও অভিসম্পাত না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ভাবে—"আমি ত উহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করি নাই, সেরূপ করিবার প্রবৃত্তিও আমার নাই, তবে উহারা আমার প্রতি কেন এত অসন্তুষ্ট, কেন আমার অযথা নিন্দা ও অনিষ্ট করিয়া পদে পদে আমার সহিত শত্রুতা করে? বরং অনেকের জন্য আমি নিঃস্বার্থভাবে যাহা করিয়াছি, তাহা কি এক বার উহাদের ভাবিবারও অবসর হয় না! এতটুকু কৃতজ্ঞতা-বোধও কি উহাদের নাই, ছিঃ!—ভাল করিলে কি এমনই ভাবে মন্দ করিতে হয়?" কথাটা লৌকিক-ভাবে নিতান্ত সত্য! এ সংসারে আজ কাল 'ভাল করিলেই' যেন তাহার প্রতিদানে 'মন্দই করিতে হয়'!

এক সময়ে বঙ্গের পণ্ডিত-কুলচূড়ামণি 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের এক অনুগত প্রিয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়, 'অমুক ব্যক্তি' প্রায়ই আপনার অত্যন্ত নিন্দাবাদ করিয়া থাকে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"তাই ত হ্যা, আমি বেশ স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, এক দিনও ত কখন তাহার তিলমাত্রও উপকার আমি করি নাই, তবে সে আমার নিন্দা করে কেন?" সে ব্যক্তি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"এ কিরূপ কথা? উপকার করিলে কি মানুষ তাঁহার নিন্দা করে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তাই ত এ-সংসারের নিয়ম।"

তিনি বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি, লোক-চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল, সে কারণ তিনি সেই নিন্দাবাদে বিচলিত হইলেন না। লৌকিক নীতিজ্ঞান-নিপুণ

ব্যক্তিগণ এইরূপেই আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেও, অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষবৃন্দ অন্যরূপে তাহা অনুভব করেন। তাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল এবং তদনুগত ভোগ ও ভোগানর অপরিত্যজ্য-সম্বন্ধ অবগত হইয়া প্রকৃত নাট্যালয়ের অভিনেতার ন্যায় সকল-ভোগকর্ম্ম কেবল প্রারব্ধ-ক্ষয়রূপে নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য ও সম্পন্ন করিয়া যান। অভিনেতাদিগের মধ্যে পরস্পর—প্রেম, প্রীতি, বিরহ, বিদ্বেষ, কলহ ও ঘাত-প্রতিঘাতরূপ নানা ভাবের সংঘটন, তাহাদের অভিনয়-কালে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই অভিনয়-জনিত 'মিলন', 'আঘাত' ও 'আক্রমণ' তাহাদের অন্তরে কখনই 'অনুরাগ' বা 'বিরাগ'রূপ বিকার উৎপাদন করে না; তাহারা নিশ্চয়রূপে জানে যে, আমরা অভিনয় করিতেছি মাত্র; যে, যে পরিচ্ছদে বা যে সাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে নাট্যোল্লিখিত সেই সেইরূপ পাত্র বা পাত্রীরূপে, তাহাদের কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। রাজা, প্রজা, পতি, পত্নী, শত্রু, মিত্র, পুত্র, ও কলত্র আদি যে ভাবেরই অভিনয় হউক না, সে তাহাদের পরিচ্ছদের সহিতই সম্বন্ধ-যুক্ত। সজ্জাগৃহে আসিয়া স্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলে, আর সেই সমুদায় সম্পর্ক বা তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির কোনরূপ জ্ঞান বা তাহাদের অন্তর-মধ্যে সে ভাবের বেগ, অথবা কোনরূপ চিহ্নও স্পর্শ করিয়া থাকে না। জীবের প্রারব্ধ-কর্ম্মসমূহ ঠিক সেইরূপই সম্বন্ধ ও সংঘটনপূর্ণ ব্যাপার মাত্র। সাধারণ মানব, তাহা কেবল অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝিতে না পারিয়া সুখ-দুঃখাদির অনুভবসহ নিজেকে সেই সকল কর্ম্মের 'কর্ত্তা' ভাবিয়া—'নবীন কর্ম্ম' উৎপাদন করে ও পুনঃ পুনঃ 'জন্ম-মৃত্যুর' উপাদান-কারণ সৃষ্টি করে।

বাস্তবিক আমি যাহার যাহার দ্বারা সুখ বা দুঃখ ভোগ করি,

সে আমার ও তাহাদের পরস্পর 'পূর্ব্ব-কর্ম্মফলের' সংযোগমাত্র। আবার আমিও কাহারও কাহারও সুখ বা দুঃখের কারণরূপে যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাও তাহাদের ও আমার কেবল পূর্ব্ব-কর্ম্মফলের পরস্পর সংযোগ-সাধনরূপ বিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রারব্ধ-ভোগমাত্র। যে আজ আমার সুখ বা দুঃখের কারণরূপে মিত্র বা শত্রুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে, পূর্ব্বে আমি নিজ কর্ম্মভোগ-উপলক্ষে ঠিক নির্ব্বিকার-চিত্তে তাহা সম্পাদন করিতে না পারিয়া, নিজ অজ্ঞানতাপূর্ণ অভিমান-বশে, নিজেকেই সেই সকল কর্ম্মের 'কর্ত্তা' মনে করিয়াছিলাম। হৃদয়স্থিত সেই "হৃষীকেশ" বা ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালিকারূপ ঐশী-শক্তিকে ভুলিয়া গিয়া, নিজেই যেন কর্ম্ম-কর্ত্তা—'পুরুষ' সাজিয়া বসিয়াছি। আমি যে কিছু করিতে পারি না, একটী তৃণ নাড়িবারও শক্তি আমার নাই, একটী পরমাণুরও সৃষ্টি, পুষ্টি বা লয় করিবার সামর্থ্য আমার নাই, আমার কেবল তামসিক ও তদনুগত রাজসিক অভিমান-বশে তাহা ভুলিয়া যাই। মুখে একবার-মাত্র—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিলেও, কর্ম্মকালে এক নিমিষের তরেও তাহা মনে রাখিতে পারি না। তাহারই ফলে আমার সতত নবীন-কর্ম্ম উৎপন্ন হইতেছে। আর পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্মফলসমূহ ভোগ করিতে হইতেছে। গুরু-কৃপায় জ্ঞান-দৃষ্টি প্রাপ্ত বা 'উপ-নয়ন' প্রাপ্ত ব্যক্তি, তাহা সহজে দেখিতে পাইয়াই নির্ব্বিকার-চিত্তে ভোগ করিয়া যায়। তাহাতে আদৌ বিচলিত হয় না। নিজ প্রারব্ধ-ক্ষয় হইতেছে বলিয়া, নিশ্চিন্ত-চিত্তে সমস্ত সহ্য ও সমাপন করিয়া যায়।

সাধু বিহারীলাল সেই কারণ কাশীর সেই দুষ্ট গুণ্ডাদিগের

অত্যাচার গ্রাহ্য করিতেন না। তাহারা ক্রমে এতদূর বিরক্ত করিতে লাগিল যে, তাহা আর কহতব্য নহে! সময় সময় তাঁহাকে তাহারা সেই ধূনীর উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত, তাহাতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝলসাইয়া পুড়িয়া যাইত। একবার তাঁহার উরুদেশ এমন ভীষণভাবে পুড়িয়া যায় যে, তাহার জন্য অনেক দিন তাঁহাকে বেশ ভুগিতে হইয়াছিল। কাশীবাসী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা সদৃশা মাতৃ-স্বরূপিণী ভদ্রমহিলারা তখন ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলেন। এই ভাবে তিনি মায়েদের একাধারে স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধন হইয়া উঠিলেন। মায়েদের যত্নে তাঁহার আর কোন কষ্ট রহিল না। তিনি সেই দুষ্ট গুণ্ডাদিগকে কেবল স্নেহবশেই কোন প্রতিবিধান ব্যতীত কখনও তাহাদের প্রতি কোনরূপ তিরস্কারও করিতেন না।

এইরূপ অত্যাচার অনেক মহাপুরুষকেই সময় সময় সহ্য করিতে হয়। বর্ত্তমান-কালের অদ্বিতীয় পরমহংস-প্রবর পূজ্যপাদ **শ্রীমদ্ তৈলঙ্গ (ত্রৈলিঙ্গ) স্বামীকেও** এইরূপ অত্যাচার অনেক সময় সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি আপন-ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কোন দুষ্ট-ব্যক্তি তাঁহার মাথায় 'টিকার' আগুন রাখিয়া গেল, চামড়া পোড়া গন্ধ যখন চারিদিকে বাহির হইল, তখন কোন সৎব্যক্তি আসিয়া সেই আগুন ফেলিয়া দিল, কেহবা মাখন আনিয়া তাহার উপর লাগাইয়া দিল। কেহবা 'ঘোলা-চুণেরজলই' 'দুধ' বলিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিল, তিনিও তখন অম্লানবদনে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার তাঁহাকে অনেক সময় ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভাল মন্দ লোকের সদসৎ এইরূপ ব্যবহারে সাধু বিহারীলালকেও

প্রথম প্রথম অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাকে —"এটা একটা পাগল" বলিয়া নানা অকথ্য-ভাষায় গালাগালি করিত, তিনি তাহাতেও কিছুই বলিতেন না। সময় সময় তাঁহার সেই ধূনিতে দুষ্টরা 'প্রস্রাব' পর্য্যন্তও করিয়া দিত। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি আর 'ধূনি' রাখা সঙ্গত মনে করিলেন না। এক দিন গঙ্গার জলে, সেই ধূনি ফেলিয়া ভাসাইয়া দিলেন। সেই দুষ্টদিগের অত্যাচার হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার আশায়, সেই আসন তখনকার মত তিনি ত্যাগ করিলেন।

সাধু-আশ্রমে 'সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান' করিবার অভ্যাসও করিতে হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ "যাঁহার দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, সুখেতেও কোন প্রকার স্পৃহা থাকে না, যিনি 'আসক্তি ও বিরক্তি-বর্জ্জিত' হইয়া অর্থাৎ ভয় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিসমূহকে সমূলে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই 'স্থিতধী' বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বলা যায়।" যিনি চিরকাল সুখে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছেন, দুঃখের চিহ্নমাত্রও কখন দেখেন নাই, তাঁহার পক্ষে দুঃখ-ভোগসহ সুখ-দুঃখের সমতা-বিষয়ে অভ্যাস করাও যে, তাঁহার সাধন-অঙ্গস্বরূপ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অতএব সাধু-আশ্রমে 'দুঃখ' দেখিয়া 'বিরক্ত' হইলে চলিবে না। ভগবদ্-বাক্যের সার্থকতা-বিষয়ে 'আত্ম-পরীক্ষার' জন্যও ইহার প্রয়োজন আছে।

শ্রীমৎ বিহারীলাল কাশীধাম হইতে উঠিয়া এইবার পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আসিলেন। তথায় নেহালচাঁদ সুখবীর সিংহ মহাশয়ের

বাগানে একান্তে নিজ সাধন-কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। এখানে আর তাঁহার কোনরূপ বিঘ্ন হইল না।

কাশীর দুষ্ট ও গুণ্ডাদিগের অত্যাচারও যেমন, তেমনি শিষ্ট ও ভক্তের সেবা-যত্নও কোন দিন অভাব নাই। তাঁহার এইরূপ কাশীত্যাগে অনেকেই মর্ম্মাহত হইল, করুণার আধার মায়েদের ত কথাই নাই। তাঁহারা সকলে 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বনাথ পাণ্ডা নিজে যাইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া পুনরায় কাশীতে আনিয়া নিজেদের বাড়ীর নিকট একটী মন্দিরে যত্ন করিয়া রাখিল। সকলের সেবা-যত্নে এক্ষণে তাঁহার আর কোনরূপেই সাধন-বিঘ্ন হইল না।

এইভাবে তাঁহার গুরু-নির্দ্দিষ্ট তিনটী বৎসর ক্রমে পূর্ণ হইয়া গেল। সাধু—ইং ১৯০০ অব্দে একচল্লিশ বৎসর বয়সে পুনরায় শ্রীগুরু-চরণ-দর্শনাভিলাষে হরিদ্বার হইয়াই সেই সিদ্ধাশ্রমের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দশম অধ্যায়।

সন্ন্যাসগ্রহণ।

সাধু বিহারীলাল এতদিন গুরুনির্দ্দিষ্ট-বিধানে রীতিমত সাধন-ভজন অভ্যাস করিয়া বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'শম-দমাদি' ষট্‌সাধন-সম্পত্তি এই অল্প দিবসের মধ্যেই বেশ আয়ত্ব হইয়াছে। তিনি এক্ষনে প্রকৃত আদর্শ সাধকরূপে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেছেন। গুরু-আজ্ঞা তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া এত দিনে কৃতার্থ হইয়াছেন। আজ তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইয়াছে। তিনি গুরুদেবের শ্রীচরণ-কমলে পুনরায় উপস্থিত হইবেন। বাস্তবিক ক্রিয়াবান্ সৎশিষ্যের প্রতি যথার্থ সদ্‌গুরুরও যেন অসীম কৃপা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁহাদের সকলের প্রতিই সমান করুণা, সকল শিষ্যই তাঁহাদের সমান স্নেহের পাত্র ; তাঁহাদের স্বার্থপরতা বা পক্ষপাতিতা আদৌ না থাকিলেও, যে যেমন অধিকারী, তাহাকে তেমনই উপদেশ করিতে তাঁহারা যেন বাধ্য। বাস্তবিক জন্মার্জ্জিত সাধন-সুকৃতি না থাকিলে, এক জীবনেই সহসা এতটা উন্নতি ত হইতে পারে না। সাধারণ-লোকে তাহা কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারে না। মহামতি অর্জ্জুনেরও এই ভাবের কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিং বগং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥"

অর্থাৎ "হে মহাবাহো! (সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন) দেব, কোন ব্যক্তি যথারীতি যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধির পূর্ব্বেই দেহত্যাগ সময়ে সংযমশূন্য হইয়া সেই যোগমার্গ হইতে যদি বিচলিত হইয়া যায়, তবে তাহাদের কিরূপ গতি হয়? সেই বিমূঢ় ব্যক্তি কি ব্রহ্মের আশ্রয় পাইল না বলিয়া, 'কর্ম্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' রূপ উভয় অঙ্গ হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া, খণ্ডিত মেঘের ন্যায়, উভয় দিক হইতেই পৃথক হইয়া, বিনষ্ট হইয়া যায়? তাহাদের 'ইহকাল' ও 'পরকাল' বা 'ভোগ' ও 'মোক্ষ' উভয়ই কি নষ্ট হয়? আমার এই সংশয় আপনি সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিয়া দিন। হে কৃষ্ণ! এই সন্দেহ আপনি ব্যতীত কেহই দূর করিতে পারিবে না।"

শ্রীভগবান তদুত্তরে বলিলেন :—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাসস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ "হে পার্থ! তুমি যেরূপ লোকের কথা বলিলে, তিনি কখনই ইহকাল বা পরকাল হইতে বিনষ্ট হইতে পারেন না, কারণ হে তাত! (শিষ্যভাবের বাৎসল্য-প্রকাশক সম্বোধন-বাক্য) বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেহই দুর্গতি লাভ করে না।"

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥”

অর্থাৎ “যোগভ্রষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিলে, তিনি বহুকাল স্বর্গাদিলোকে সুখে-বাস করিয়া পুনরায় ইহলোকে ভাগ্যবান বা লক্ষ্মী-শ্রীসম্পন্ন সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অথবা সেই উন্নত যোগ-ভ্রষ্ট ব্যক্তি অতুল জ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্, সাধু ও যোগিকুলেই জন্ম-গ্রহণ করেন, অবশ্য এমন কুলে জন্মগ্রহণ করা সকলের পক্ষে অতীব দুর্লভ। কারণ হে কুরুনন্দন! যোগী বা সন্ন্যাসীর কুলে জন্মগ্রহণ করিলে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই সেই পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত যোগাদির সংস্কারানুরূপ জ্ঞান ও সাধন-সহায়তা লাভ করিতে পারেন, তখন সেই ব্যক্তি অনায়াসে উন্নত জ্ঞানলাভ করিয়াই, তাহার পরবর্ত্তী যোগাদি ক্রিয়া ও জ্ঞান-সাধনার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে পারেন। তিনি তখন পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস-বশতঃ উন্নত যোগতত্ত্বেরও জিজ্ঞাসু হইয়া, ক্রমে সাধারণ কর্ম্মাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকারী হয়েন। এইরূপে বিশেষ যত্ন-সহকারে ‘যতমান’ আদি বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহযোগে, যোগী সর্ব্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অনেক জন্মের সাধনা-সিদ্ধির ফলে, যখন প্রকৃত ‘বিবেক-জ্ঞান’ লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহার পরমা-গতি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।”

সেই মোক্ষমার্গের অন্তিম অবস্থাই সন্ন্যাস। তাহা সাধারণ সাধুর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বস্তু। দুই এক জন্মের কেবল ভেকধারী-সাধু হইলেই তাহা হইতে পারে না। বহু-জন্মের ক্রমোন্নত সাধনার অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ফলেই যথার্থ সাধু বা আদর্শ-সন্ন্যাসী হইতে পারা যায়। সেই কারণ আমাদের সাধু শ্রীমৎ বিহারীলালের ন্যায় উন্নততম অধিকারীকে জ্ঞানযোগের উপদেশ করিতে, তাঁহার ন্যায় জীবন্মুক্ত পরমহংসাবধূতের আন্তরিক আগ্রহ ত হইবারই কথা, বা জন্মার্জ্জিত সাধনসূত্রে তিনি এই রূপ সৎপাত্রে উপদেশ-প্রদানে যেন পূর্ব্ব হইতেই সংবদ্ধ হইয়া আছেন।

যাহা হউক গুরু-মহারাজ শিষ্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতে দেখিয়া, সানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার বাহ্য ও অন্তরের অবস্থাসমূহ তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া পরম পুলোকিত হইলেন। তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ-প্রদান যে, সার্থক হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। শিষ্যের এ হেন সাধন-পুষ্টতা দেখিয়া এইবার তাঁহাকে **সন্ন্যাস-দীক্ষা** প্রদানের আয়োজন করিলেন।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান সময়ের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার ও বিধি-নিষেধ-বিষয়ে বহুল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যের' ন্যায় 'চাতুরাশ্রম'ও সনাতন-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমরূপী 'অষ্ট-স্তম্ভের' উপরেই যেন আর্য্যের বিশাল ধর্ম্ম-প্রাসাদটী চিরদিন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহার একটীরও জীর্ণতা আসিলে যে, উক্ত মন্দিরমূল সহজেই শিথিল হইয়া আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অধুনা আর্য্যবংশীয়দিগের 'বর্ণ-সঙ্করতা'র ন্যায় 'আশ্রম-সঙ্করতা'ও এতাধিক বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া সেই আদি-যুগের

ঋষি-প্রবর্ত্তিত আশ্রমের যথার্থ 'স্বরূপ' উপলব্ধি করিতেই পারা যায় না।

পূর্ব্বে গর্ভধান হইতে আর্য্যকুলোদ্ভব সন্তানের 'সংস্কার'-কার্য্য আরম্ভ হইত। (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) নিষ্ক্রামণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, ইত্যাদি। প্রাচীনকালে উপনয়নের পর, বালক দণ্ড-গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীরূপে গুরু-গৃহে দ্বাদশ-বৎসর কাল অবস্থান করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। ইহাকেই বা এই অবধি ক্রিয়ানুষ্ঠানকেই আর্য্যের 'ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম' বলিত। ইহার পর—(১০) দশম-সংস্কার 'সমাবর্ত্তন'—এই সময়ে গুরুর আজ্ঞা লইয়া ব্রহ্মচারী নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ইহার অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাই প্রথম-আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য-বৃত্তির ত্যাগান্তে দ্বিতীয়-আশ্রম 'গার্হস্থ্য'-আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণের সন্ধিস্থল। ইহার পরই বা সঙ্গে সঙ্গেই (১১) একাদশ-সংস্কার—'বিবাহ', অর্থাৎ এই সময় হইতেই আর্য্যসন্তান প্রকৃতপক্ষে বিবাহিত স্ত্রী বা সহ-ধর্ম্মিনী-সহ গৃহস্থরূপে দ্বিতীয়-আশ্রমের ধর্ম্ম-প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উক্ত দশম-সংস্কার 'সমাবর্ত্তন', 'বিবাহ'রূপ একাদশ-সংস্কারের পূর্ব্ব-ক্রিয়া বা তদন্তর্গত হইলেও, আজকাল উপনয়ন-সংস্কারেরই অঙ্গ-রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণ এক্ষণে গৃহস্থাশ্রমের সংস্কার-রূপ বিবাহ-ক্রিয়া পর্য্যন্ত 'দশটী সংস্কার' বলিয়াই সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে। যে 'পুরোহিত' ব্রাহ্মণ, এই বিবাহ পর্য্যন্ত দশটী সংস্কার-ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ, এক্ষণে সকলে তাহাকেই 'দশকর্ম্মান্বিত-ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু সে কালে যাঁহারা উক্ত দশ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বেদপারগ হইতেন ও অন্যেরও দশ-বিধ

সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকেই 'দশ-কর্ম্মান্বিত'-ব্রাহ্মণ বলা হইত। এখন আর সেই সকল সংস্কারের উপদ্রব বা 'বালাই' নাই। শাস্ত্র-বিধি এই যে, কোন সংস্কার পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইলে, পরবর্ত্তী বা শ্রেষ্ঠ উপনয়ন-সংস্কার-কালে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আজকাল 'উপনয়ন' ও 'সমাবর্ত্তন'-সংস্কার ব্যতীত সামাজিক বিধি-অনুসারে বিবাহকার্য্য হইতে পারিবে না, এই ভয়েই যেন কোনরূপে এক সঙ্গে দুইটীই সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে, অধুনা উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন্ যেন একটী সংস্কারেই পরিণত হইয়াছে। সেই হেতু বিবাহ পর্য্যন্ত দশটী সংস্কার বলিয়াই এখন সকল লোকের একপ্রকার দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত ত গার্হস্থ্য-আশ্রমই কোনরূপে সম্পন্ন করা হইল। পূর্ব্বকথিত সনাতন-ধর্ম্মের আর দুইটী 'অন্তিম-আশ্রম' যে এখনও অপূর্ণ রহিয়া গেল, তাহা যেন কেহ ভাবিবারও অবসর পান না! তাহাই জীবের জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তৃতীয়—'বানপ্রস্থ'-আশ্রম এবং তদনন্তর চতুর্থ—মোক্ষসাধনরূপ 'সন্ন্যাস' বা অন্তিম-আশ্রম। এই দুই আশ্রমেরও যথাশাস্ত্র সংস্কার-বিধি আছে। সেই সংস্কারগুলি পূর্ণ সংখ্যায় পাঁচটী বা ছয়টী। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত সমাবর্ত্তনকে উপনয়ন হইতে স্বতন্ত্র সংস্কার ধরিলে, এই বানপ্রস্থ-সংস্কারেই * গৃহস্থাশ্রম সম্পন্নপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাসের জন্য একান্তবাস বা 'বনে প্রস্থান' ক্রিয়ার

* "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—ইহা শাস্ত্রাদেশ হইলেও, এখন তাঁহা আর কেহই পালন করেন না—শুক-বেদান্তীরূপে, তাহার প্রয়োজনও মনে করেন না।

যে, শাস্ত্র-বিহিত সংস্কার আছে, তাহাকেই 'দ্বাদশ-সংস্কার' বলিতে হইবে, আর যদি সেরূপ ধরা না হয়, তবে বানপ্রস্থের পূর্ব্বদশাই (১১) 'একাদশ' ও উত্তরদশাকে (১২) 'দ্বাদশ-সংস্কার' ধরিতে হয়।

ইহার পর সন্ন্যাসের চারিটী অবস্থা, যথাক্রমে (১৩) 'কুটীচক' বা 'কুটীচর', (১৪) 'বহুদক', (১৫) 'হংস' ও (১৬) 'পরমহংস', এই ষোলটী সংস্কারের কর্ম্মানুষ্ঠানে চন্দ্রের ষোল-কলার ন্যায় সনাতন-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ষোল-কলাযুক্ত সংস্কারের পূর্ণতা হইয়া থাকে। ইহাই ঋষিনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-বিধি। কিন্তু কালবশে সে সবই যেন লুপ্ত বা গুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে সন্ন্যাস-আশ্রমটী পূর্ব্বকথিত ভীষণ আশ্রম-সঙ্করতার মধ্যেই পড়িয়াছে। কারণ সমাজ ও ধর্ম্মের শাসন এখন আদৌ নাই। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সেই কিঞ্চিৎ গেরুমাটী, গৈরিক বা গিরি-মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া মনোমত বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়া লইতেছে ও 'সন্ন্যাসী' বলিয়া নিজেকে প্রচার করিতেছে। তাহাতে বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার, অথবা তাহাদের পরীক্ষা করিবারও কেহই নাই। সাধন-জ্ঞান-পরিশূন্য দুই এক খানি মুদ্রিত-শাস্ত্র-গ্রন্থের কেবল পঠন-পাঠনে বা 'পেশাদার' সাধুদিগের সঙ্গ করিয়া, কয়েকটী 'বাঁধাবুলি' ও 'গল্প' কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই, যে কেহ এখন সন্ন্যাসী-রূপে অনেকেরই উপদেষ্টা ও যেন অভিজ্ঞ গুরুরূপে নিজের 'পশার' বেশ জমাইতে পারেন।

এই সকল সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে আজকাল সাধারণতঃ 'চারি শ্রেণীর' লোকই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী—কেবল যেন পেটের-দায়েই সাধু, তাহারা স্বভাবতঃ আলস্য-পরায়ণ বা কর্ম্মকাতর; ভিক্ষা-বৃত্তিতে অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই

তাহারা পরিতৃপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর—সাধুরা, সাময়িক বৈরাগ্যাধীন হইয়া অর্থাৎ সংসারে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, হতাশ-প্রেম, বিষয়সম্পত্তির বিনাশহেতু, অথবা বিষয়ের অনিত্যতা বোধেই, এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম বেশ বৈরাগ্যসহ সাধন-ভজনে তৎপর হইয়াও থাকেন, ভাগ্যবশে কেহ কেহ সদ্‌গুরুর কৃপালাভে ও উন্নত প্রারব্ধবশে হয় ত কিঞ্চিৎ আত্মোন্নতি করিতেও সমর্থ হয়েন। তাঁহাদের 'আদর্শ' অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত সাধারণ সাধুদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই নিজ-সাধনার অপুষ্ট-অবস্থাতেই অজ্ঞ ভক্ত-লোকের অসম্ভব প্রশংসা ও সেবা-ভক্তির আতিশয্যে বিমোহিত হইয়া নিজেদের আর 'তাল-সামলাইতে' পারেন না—ফলে, সেই বৈরাগ্য-প্রভাব অতি অল্প দিনের মধ্যেই যেন তাঁহাদের অলক্ষ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ক্রমে তাঁহারা ভোগ-পরবশ ও একেবারে সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। অনেকে আবার এই অবস্থায় 'গুরুগিরির' মোহে পড়িয়া 'আত্মবিভ্রান্ত' হইয়াও যান। যাঁহারা সেই প্রশংসা ও সেবা-ভক্তির বিঘ্নসঙ্কুল তীব্র বাহ্য-তাড়না হইতে অবিচলিত ভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন, কেবল তাঁহারাই কালে 'উন্নত-কোটীতে' অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীতে—যে সকল 'সাধুর' কথা বলা হইতেছে, তাহারা ঘোর আত্ম-প্রবঞ্চক, চিরদিনই নিতান্ত দুর্নীতি-পরায়ণ ও দুর্ব্বৃত্ত, তাহারা ক্রমে জন-সমাজের মধ্যে নিজেদের শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক-ভাবে প্রত্যক্ষ স্বরূপে আর অবস্থান করা অসম্ভব বোধ করিয়াই, পরে 'সন্ন্যাসীদের' এই পবিত্র পরিচ্ছদের আবরণে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলেই, এমন কাজ নাই, যাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য হইলেও, তাহারা করিতে তিলমাত্র পশ্চাদ্‌-

পদ হয় না। যাহা হউক কেবল চতুর্থ-শ্রেণীর—'সন্ন্যাসীরা' সংসারের সম্পূর্ণ অনিত্যতা পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়া, যেন তাঁহারা স্বাভাবিক গতিতেই সুপক্ক বা পরিপুষ্ট-ফলরূপে বিশাল সংসার-বিটপী হইতে আপনা আপনি খসিয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের আর কেহই ভোগাদিরূপ কোন প্রলোভনে বিমোহিত করিতে পারে না। তাঁহারা যেন নিত্য-মুক্ত স্বভাববান্ মহাপুরুষরূপে অল্পকালের সাধনাতেই যথার্থ 'স্থিতধী' হইতে পারেন।

এইরূপ নানা শ্রেণীর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধি-বিপর্য্যয়, আজ বলিয়া নহে, বহুদিন হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। বিকৃত-বৌদ্ধ-সাধুদিগের প্রধানতার সময় হইতেই আশ্রম-ধর্ম্ম এক প্রকার শিথিল হওয়ায়, গৃহস্থের ন্যায় সাধুদিগেরও এই ভীষণ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেব সেই কারণ তখন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের যেন পুনঃ-সংস্কার করিয়া যাইলেন। তাহাতে তিনি 'বিবিদিসা-সন্ন্যাস' ও 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস' ভেদে দুইটী প্রধান বিভাগ প্রচার করিয়া যাইলেন। বিবিদিসা-সন্ন্যাসীদিগকেই 'দণ্ডী-সন্ন্যাসী' বলে, তাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াই যেন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাপূর্ব্বক রীতিমত সাধন-ভজন করিয়া আত্মোন্নতি করিয়া থাকেন এবং পরে বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী-রূপে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন অন্তিম আশ্রমী হইয়া জগৎপূজ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই শাঙ্কর-বিধিও আজকাল নাই বলিলেই হয়! এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান—অনেকেই যেন শঙ্করেরও প্রপিতামহ বা পরমেষ্টিগুরুরূপে নিজেদের পরিচয় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

যাহা হউক আমাদের সাধু শ্রীমৎ বিহারীলাল উক্ত সাধারণ বা পূর্ব্বলিখিত প্রথম তিনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'সাধু' নহেন। তিনি

যথার্থই পূর্ব্বকথিত 'চতুর্থ-শ্রেণীর' অন্তর্গত প্রকৃত 'সন্ন্যাসী' হইবারই উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং তাঁহার এই সন্ন্যাস-সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশেই, গুরুদেব তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠানের অনুকূল সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণানুষ্ঠানের প্রধান কার্য্য '**ঋণত্রয় মুক্তির**' জন্য—১। দেবতা, ২। ঋষি ও ৩। পিতৃগণের, পরে 'আত্ম' বা নিজেরও শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া' এবং 'শিখা-সূত্রের ত্যাগ' বা তাহার পূর্ণাহুতিরূপে—অন্তিম 'বিরজাযজ্ঞ'-সমাধান। তাহা আজ কাল প্রায় কাহারও শাস্ত্র-বিধি অনুসারে জানা নাই। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবেই করিয়া থাকেন। আদর্শ ক্রিয়াবান সাধু ও শাস্ত্র-জ্ঞানের অভাবেই যে, ক্রমে এইভাবে পরিণত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপনয়নাদি সংস্কারের ন্যায় শাস্ত্রীয়-বিধানে এখনও কাহারও কাহারও সন্ন্যাস-সংস্কার হইতে দেখা যায়। বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় অনেকেই যথা-শাস্ত্র সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাহার আদর্শ দিন দিন কম হইয়াই যাইতেছে। সে যাহা হউক বিহারীলাল শাস্ত্র-সম্মত ভাবেই সদ্‌গুরুর কৃপায় আজ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন।

তিনি প্রথমে—সগণসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রাদি দেবতাদিগের, পরে সনকাদি ঋষি, নারদাদি দেবর্ষি ও ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের এবং তৎপরে—পিতৃগণের যথাবিধি পূজা ও প্রত্যেককে স্বতন্ত্র-ভাবে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-গদগদকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন ঃ—

"তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যূয়মনৃণীকুরুতাচিরাৎ॥"

অর্থাৎ "হে পিতৃগণ, হে দেবগণ, হে দেবর্ষি প্রভৃতি ঋষিগণ, আপনারা সকলে তৃপ্ত হউন, আমি 'গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা অচিরে আমাকে আপনাদের স্ব স্ব ঋণসমূহ হইতে মুক্ত করুন।"

এইবার 'আত্মশ্রাদ্ধ' উপলক্ষে শ্রীগুরুর প্রদর্শিত সন্ন্যাস-পদ্ধতি-অনুসারে পুনরায় দেবতা,ঋষি ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান করিলেন। কারণ দেবতা,ঋষি ও পিতৃগণ হইতে এই আত্মা ভিন্ন নহেন, অতএব পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য এইরূপ শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট! অতঃপর উত্তরাভিমুখে বসিয়া কুশ-বিস্তারপূর্ব্বক আত্ম-কুল গোত্র ও নামাদির যথাবিধি উল্লেখসহ নিজের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি সমাপন করিলেন।

'ত্র্যম্বক-মন্ত্রের' উপাসনাপূর্ব্বক এইবার একান্ত ভাবে ব্রহ্মার্চ্চনা করিতে বসিলেন। তাহা সম্পন্ন হইলে, 'বিরজা-বহ্নি' স্থাপনা-পূর্ব্বক গুরু-নির্দ্দিষ্ট বিধিমত যজ্ঞ-কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে 'চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব' ও সমুদায় দৈহিক-কর্ম্মাদির উল্লেখসহ তদ্গত হইয়া একে একে আহুতি দিতে লাগিলেন।

এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, গুরুদেব সমন্ত্র তাঁহার 'শিখা' ছেদন করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি সেই ব্রহ্ম-পুত্রীরূপা শিখাকে সম্বোধন-মন্ত্রে ঘৃতসিক্ত করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। তৎপূর্ব্বে নব-দেবতাযুক্ত, নব-গুণসমন্বিত, নব-সূত্রে-ত্রিধাকৃত ত্রিদণ্ডীরূপী ব্রহ্মসূত্রকেও যথাবিহীত সম্বোধন-মন্ত্রে ঘৃতসিক্ত করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে 'ব্রহ্মাহুতি' করিলেন। অনন্তর 'পূর্ণা-

হুতি' করিয়া—বিরজা-(বি+রজঃ) যজ্ঞ সমাপন করিলেন। কোন কোন স্থলে শিখা-সূত্র পাবকে নিক্ষেপ করিবার পরিবর্ত্তে, শুদ্ধ-জলে বা শুদ্ধ-ভূমিতেই বিসর্জ্জন করিবার বিধি আছে। কিন্তু সাধু বিহারী-লালের গুরুদেব শিখা-সূত্র আহুতি করাইয়া, সেই যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত ভস্মাংশ তাঁহাকে 'প্রাশন' বা খাওয়াইয়া দিলেন। তাহাতে তিনি যেন কি এক অপূর্ব্ব তেজ অনুভব করিতে লাগিলেন। অন্তরে প্রভূত বল উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে গুরুদেব—'সন্ন্যাস-মন্ত্র-প্রাশন' করাইলেন।

শিষ্য বিহারীলাল শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে, গুরুদেব তাঁহার বাহুযুগল ধরিয়া উত্থাপন করাইলেন ও যুক্তকরে অবনত মস্তকে প্রতিপ্রণামসহ বলিলেন ঃ—

"নমস্তুভ্যং নমোমুহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ।
ত্বমেব তদহমেব বিশ্বরূপং নমোঽস্তু তে॥"

অর্থাৎ "তোমাকে নমস্কার, আমাকেও নমস্কার, তোমাকে ও আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে বিশ্বরূপ, তুমি সেই তৎপদবাচ্য পরব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্মই তুমি, অতএব তোমাকে পুনরায় নমস্কার করি।" তাই কথায় বলে—

"এ বড় বিষম ঠাই গুরুশিষ্য ভেদ নাই।"

গুরু এই ভাবে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সাধনাধিকার প্রদান করি-লেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্
লীনং পরব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

অর্থাৎ "যিনি পরব্রহ্মে চিত্তলয় করিবার জন্য এ হেন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কুল পবিত্র হইল, তাঁহার জননী কৃতার্থা হইলেন এবং তাঁহার প্রভাবে বসুন্ধরাও পুণ্যবতী হইলেন। শাস্ত্রান্তরে আদেশ আছে ঃ—

"সন্ন্যাস-গ্রহণমাত্রেই তুমি নিঃসন্দেহ জীব-শিব বা নর-নারায়ণ হইলে, তোমার পিতৃবংশে সপ্তদশ পুরুষ, মাতৃবংশে ত্রয়োদশ পুরুষ এবং তোমার সহধর্ম্মিণীরও পিতৃবংশে সপ্তপুরুষ—আজ লক্ষ্মী-নারায়ণ বা হরগৌরীস্বরূপ হইলেন। অতএব হে নবীন-সন্ন্যাসী! তুমিও আজ ধন্য হইলে, এক্ষণে তুমি পরমহংসরূপে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ—তুমি গৃহস্থের নিকট ভিক্ষায় জীবন-যাপন কর।"

শ্রীমৎ বিহারীলাল এইবার নিজ পরিধেয়-বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিহার-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নগ্নভাবে শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুরুদেবের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া চলিয়া যাইলেন। গুরুদেব—"তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাবাহো" ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গাত্রে ব্রহ্মমন্ত্রে ফুৎকার দিলেন ও চরণামৃতরূপ একপ্রকার রস তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। তিনি তাহাতে যে শক্তি প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বাস্তবিক অবর্ণনীয়, সেই শক্তিবলেই তিনি সকল বেগ অনায়াসে সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন। আর তাঁহার কোন চিন্তা বা মনের গোল রহিল না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই মনে প্রভূত শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, এ সময় কেবল আনুষ্ঠানিক কার্য্যসমূহ,তাঁহার অন্তিম উপলক্ষমাত্র।

এই সময়ে সন্ন্যাসীর পক্ষে কৌপীন ও দণ্ড-কমণ্ডলু লইবার কথা, কিন্তু তিনি গুরুদেবের নিকট হইতে আর কিছুই গ্রহণ

করিলেন না, একেবারেই পরমহংসকোটীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার গুরুদত্ত 'নাম', তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, সেই কারণ তাহা আর কেহই অবগত হইতে পারিলেন না। তিনি তখন অযাচিত-লব্ধ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াই হরিদ্বারের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন—তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিয়াল্লিশ বৎসর হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

পরমহংসের পূর্ব্বাশ্রম-সম্পর্ক।

পরমহংস-অবস্থার নাম, কেহই জানিতে পারিল না, তাহা ইতোপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা এখন হইতে তাঁহাকে **"বিহারীবাবা"** বলিয়াই উল্লেখ করিব।

তিনি কিছুদিন পরে তাঁহার সেই পবিত্র প্রিয়ভূমি কাশীধামে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহার অঙ্গে বস্ত্র নাই, তিনি দিগম্বররূপে দশাশ্বমেধের গঙ্গাতটে বসিয়া রহিলেন। স্নানের ইচ্ছা হইলেই তথা হইতে উঠিয়া, গঙ্গায় অবগাহন করিতেন ও অবিরত ভাবে বহুক্ষণ সন্তরণ করিতেন। কাহারও নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করিতেন না। কাশীবাসী ভক্তজনে যে যাহা দিত তাহাই পরমানন্দে সেবা করিতেন। এই ভাবে তাঁহার দিন-কতক তথায় কাটিয়া গেল। এক দিবস তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা ও আত্মীয়গণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও দেশে একবার লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন।

বিহারীবাবার জনক বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, বহুদিন সাধু-সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে এক বার শেষ-দেখা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারই আদেশে তাঁহার ছেলেরা সাধুবাবাজীকে লইতে আসিয়াছেন। সাধু নিজ জনক-দেবের শেষ-ইচ্ছা অবগত হইয়া বলিলেন—"যদি তোমরা আমাকে তথায় বৃথা আট্‌কাইয়া না রাখ, তাহা হইলে

এক বার যাইতে পারি।" উহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের ছোট ভাই বলিলেন—"আমরা অবশ্য রাখিবার জন্য কিছুমাত্র জেদ করিব না, তবে বৃদ্ধ পিতা ও বৌদিদি (সাবিত্রীমা) যদি আপত্তি করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না" ইত্যাদি।

ইং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহাদেরই আগ্রহে তাঁহাদের সঙ্গে এক বার দেশে আসিলেন। এ বারেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ-সহোদরই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই পিতার সহিত একবার গোপনে দেখা করিলেন এবং নিজের 'সাধনার কথা', 'গুরুর কৃপা-লাভ' ও 'সন্ন্যাস-গ্রহণ' আদি সমস্ত কথাই সংক্ষেপে তাঁহাকে জানাইলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতা অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও বিশেষরূপে উৎসাহ দিয়া বলিলেন—"আমি তোমার এই কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাত দিতে ইচ্ছা করি না। তুমি বংশের উজ্জ্বল রত্ন, ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, তুমি জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া আমাদের বংশেরও উদ্ধার কর" ইত্যাদি।

বাড়ীর সকলে এই কথা পরে শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ও বলিতে লাগিলেন—"বাবা এবারেও উহাকে আটকাইয়া রাখিলেন না।" কিন্তু তাঁহারা ভাবিতে পারিলেন না যে, যিনি মুক্তিপথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে কি আর কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারে?

নবীগঞ্জের বাড়ী নদীর উপরেই, তিনি পরপারে তাঁহার মেজ-দাদার আফিস বা কাছারি বাড়ীর একটী গুদাম-ঘরে পড়িয়া ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। ঘরে লোকের অতিরিক্ত ভিড় হইত দেখিয়া, তিনি "পাঁচ হাত লম্বা ও আড়াই হাত

চওড়া একটী কুটীর তৈয়ার করিয়া দিতে” বলেন। আহারাদি তিনি কিছুই করিতেন না—পাঁচ দিন ক্রমাগত অনাহারেই রহিলেন, পরে তাঁহার মেজ-ভাজ অনেক সাধ্য-সাধনার পর একদিন খাওয়াইলেন; আবার অনাহারে সাত আট দিন কাটিয়া গেল। কেহ খাইতে বলিলে, তিনি ইঙ্গিত করিলেন—যদি “একশত টাকা নগদ দাও, তাহা হইলে খাইতে পারি।” ভ্রাতারা সেই মতই টাকা দিলেন, তিনি তাহা লইয়া নিকটস্থিত ক্ষেতে ছড়াইয়া ফেলিলেন। আত্মীয়রা তাহা কুড়াইতে যাইলেন—তিনি তখন ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—“তোমরা তবে আমাকে টাকা দিলে কোথায়? উহাতে তোমাদের ত এখনও পূরা মমতা রহিয়াছে, তোমরা ঐ টাকা কয়টার মমতা এখনও ত্যাগ করিতে পার নাই?” তাঁহারা তখন টাকা কুড়াইতে নিরস্ত হইলেন। পুনরায় পঞ্চাশ টাকা চাহিয়া লইলেন—এ বারে তাহা নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তথাপিও কিছু খাইলেন না। পিতা এইবারে সকলের অনুরোধে তাঁহাকে খাওয়াইতে যাইলেন। পিতার আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিবেন না ভাবিয়া, তিনি বাহিরে যাইয়া যেন মলত্যাগ করিতে বসিলেন, আর তথা হইতে উঠিতে চান না; ইহা দেখিয়া তাঁহার বড়-ভাই তখন তাঁহাকে গালাগালি দিয়া বাঁধিয়া ঘরে ধরিয়া আনিলেন। অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কেহই কিছু খাওয়াইতে পারিলেন না। তাঁহার হাত-পা সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখে দুধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি দুধ না খাইয়া, মুখের কস্ দিয়া সব ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। তখন পুনরায় সকলে বৃদ্ধ পিতাকে তথায় ডাকিয়া আনিতে গেল। ইতোমধ্যে পিতা তথায় আসিতে

না আসিতে, তিনি দুধের বাটী উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে আরও এগার দিন তাঁহার অনাহারেই কাটিয়া গেল। এই বার সাবিত্রীমা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"খাবার কথাই ত সবাই বলে, আর নূতন কথা কিছু আছে কি? তোমার ছেলেটীর উপর ভারি মায়া হয়েছে, কিন্তু আর বেশী দিন নয়।" একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে সকলেই তাঁহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া যেন বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। এই বার আত্মীয়-স্বজনেরা ভাবিলেন—বাড়ীতে মেয়েদের কাছে কোনরূপে লইয়া যাইতে পারিলে,তাহারা সকলে মিলিয়া যত্ন-আয়ত্ব করিয়া, অবশ্যই কিছু খাওয়াইতে পারিবে। সকলে মিলিয়া তাঁহার বাঘছাল ও কম্বলসহ জোর করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া বাঁধিলেন ও ঠিক যেন শব-দেহের মত তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলেন। তিনি ইহাতেও কোনরূপ বাধা-আপত্তি করিলেন না। তখনও সম্পূর্ণভাবে অটল হইয়াই রহিলেন। সাবিত্রীমাও অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহ কিছুই খাওয়াইতে পারিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া তখন সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক ঘরের মধ্যে এত দিন অনাহারে সাধু বুঝি মৃত্যুপণ করিয়াই পড়িয়া আছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে,—"বাড়ীর সকলে খুব বিরক্ত হইয়াই তাঁহাকে একেবারে বিদায় দিক্।" তখন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মেজ-ভাজ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন—"তুমি হয় খাও, না হয় টাকা দিতেছি, যেথায় তোমার ইচ্ছা হয় যাও।" তিনি বলিলেন—"আমি আর খাবও না—যাবও না।" সকলেই নিরুপায় হইলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ গোপাল অনেক-অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি

যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।" এত দিনে তিনি নিজ মত প্রকাশ করিলেন যে, —"কাশীতে যাইব। আর আহারাদির পর দুই এক দিন একটু সুস্থ হইয়াই যাইব।" এই ভাবেরও ইঙ্গিত করিলেন। বাড়ীর সকলে তখন আনন্দিত হইয়া তাঁহারই অভিমত অনুসারে তাঁহাকে নবীগঞ্জে লইয়া যাইলেন। তথায় তিনি দুই তিন দিন থাকিয়া কাশীধামে যাত্রা করেন।

যাইবার সময় তিনি সাবিত্রীমাকে বলিলেন—"আর কেন, মায়ায় জড়াইয়া আছ, শীঘ্র কাশীতে চলিয়া আসিও।" কিন্তু এই প্রস্তাবে কেহই এক-মত না হওয়ায়, তখন সাবিত্রীমার আর কাশী যাওয়া হইল না। যাইবার দিন পুত্রও প্রণাম করিতে আসিয়া বলিয়াছিল, "আমার পৈতার সময় আপনি আসিবেন।" তদুত্তরে তিনি একটু হাসিয়া তাহাকেই যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র (বিহারীলালের ভ্রাতুষ্পুত্র) তাঁহাকে জল-পথে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া "রিজার্ভ ক্যারেজে" কাশীধামে পৌঁছাইয়া যান। এইরূপে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ হইলে, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল। সেই অবধি আর কেহ তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সেই অবধি তিনিও নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাস করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে মধ্যে জন্মস্থান দেখিবার বিধি আছে। প্রথম প্রথম দ্বাদশ-বৎসরের মধ্যেই অনেকে তাহা করিয়া থাকেন। আমাদের সন্ন্যাসী বিহারীবাবারও সেইরূপ ইচ্ছা এক সময় মনে উদিত হইল। প্রকৃত সন্ন্যাসীর পক্ষে তাঁহার শেষ 'ভূমিষ্ঠ' হইবার স্থান যে, তাঁহার 'তীর্থস্বরূপ', সেই পৃথ্বী-আসন তাঁহার যে অন্তিম

সন্ন্যাসাশ্রম ও একমাত্র চিরশান্তি-প্রদায়িনী অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি, সেই ভূমি-খণ্ডের প্রতি শেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন যে, তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি সেই জন্মস্থানরূপ পরমতীর্থ দেখিবার অভিলাষী হইয়া একদিন আপনমনে নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। তীর্থরাজ কাশীধাম ত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে—ইং ১৯০৫ অব্দে (তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর) নিজ মাতুলালয় "চালতাতলী" গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই নগ্ন অবস্থা, কেবল একখানি কম্বল স্কন্ধে বিলম্বিত রহিয়াছে। 'জন্ম-ভিটা' বা বাড়ীর সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড দিঘী ছিল, তাহার এ-পার হইতে ও-পার প্রায় দেখা যাইত না, তাহারই এক-পাড়ে নিজ কম্বলখানি রাখিয়া দিঘিতে স্নান করিতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলেরা তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া "ওরে একটা পাগল এসেছে রে, একটা পাগল এসেছে" বলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাততালি দিতে লাগিল, পাড়ায় ভারি একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এমন সময় একজন প্রাচীন ব্যক্তি তথায় সহসা আসিয়া পড়িলেন, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, সাধু ফিরিয়া দেখিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মামাদেরই শিষ্য। সেই শিষ্য মহাশয় তখন বালকদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন --"তোরা কি করিতেছিস, উনি যে, এই বাড়ীরই ভাগ্নে, এখন 'মহাপুরুষ'—কাশীর সন্ন্যাসী, তোরা ওঁর পায়ে পড়, তোদের অপরাধ হয়েছে।"

ছেলেরা তখন সকলেই তাঁহার চরণে ধীরে ধীরে ভীতি কুণ্ঠিত ভাবে প্রাণাম করিল। তিনি আপন মনে জন্মস্থানের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর সকলে দেখিয়া তাঁহাকে

চিনিতে পারিলেন, পূর্ব্বাশ্রমের মামাত-ভাই, বড়-মামীমা (যিনি তাঁহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া ছিলেন, তিনি) তাড়া-তাড়ি যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাড়ীতে আনিলেন। পূজার চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া তিনি উপবেশন করিলেন। সকলে তাঁহাকে ভোজনার্থ বার বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে আদৌ রাজী হইলেন না। পরে বড়-মামীমা সেই ন্যাংটা ছেলেকে কোলে করিয়া, কত আদর করিয়া,খাবার জন্য বলিলেন, তাহাতেও তিনি মত করিলেন না। পরে পাড়ার একটী 'মুখোড়' ছেলে বলিল—"ওগো এটা পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ কিনা, উনি এখানে জল গ্রহণ করিবেন না।" এই কথা শুনিয়া বিহারীবাবা তাহার প্রতি একবার কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন ও তখনই উঠিয়া পড়ি-লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মামাত-ভাই ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন দেখিয়া, তিনি একটা কাঁটাবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, তথায় পশ্চাৎগামী আর কেহই চলিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তিনি কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, আর কেহই তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

এই প্রকারে তিনি মাঝে মাঝে আপন ইচ্ছায় দেশ-ভ্রমণও করিতেন। এক বার চৈত্র মাসে ব্রহ্মপুত্রের মেলায় তিনি গিয়া-ছিলেন, এক বৃক্ষমূলে তিনি আপনভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন—ঘটনাচক্রে তাঁহার পিতা ও বাড়ীর কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র-যোগের উপলক্ষে স্নান করিতে গিয়াছেন। সহসা বৃদ্ধের দৃষ্টিতে তিনি পতিত হন। বৃদ্ধ, পুত্রদর্শনে পুলকিত হইয়া কিছু জলখাবার লইয়া ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে যাইলেন। সাধুকে কিছু জল-

খাবার দিলেন। তিনিও পিতৃদত্ত সামগ্রী হইতে কিছু গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট খাবার বৃদ্ধ সাবিত্রীমায়ের জন্য ফিরাইয়া আনিলেন। যখন তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইল, কিন্তু সে সময় তিনি সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও উঠিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার সেই-রূপই উলঙ্গ-অবস্থা। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মাসতুত-ভাই শ্রীমান্ রাসমোহনবাবু তাঁহার বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি আবার তাঁহার বাল্যকাল হইতে বন্ধুও ছিলেন। বিহারীবাবাকে দেখিতে পাইয়া অবিলম্বে তাঁহার সঙ্গ ধরেন ও তাঁহাকে নবীগঞ্জে সঙ্গে করিয়া আনেন। পরে দুই এক-দিন থাকিয়াই উভয়ে একত্র পলাইয়া যান।

তাঁহারা তখন চাঁদপুর হইয়া চন্দ্রনাথে গমন করেন। তথায় শম্ভুনাথের মন্দিরে তাঁহারা অবস্থান করেন। মেহের-কালীবাড়ীর পূজারিদের মধ্যে দুই জনে দুই বোতল মদ লইয়া তাঁহাকে প্রসাদ করিয়া দিবার জন্য বার বার প্রার্থনা করে, কিন্তু তাঁহাদের কোন কথায় তিনি কাণ দিলেন না। সেই কারণ তাহারা ক্রমাগত প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তিনি তখন আর কোন দিকে না চাহিয়া দুই হাতে দুইটী বোতলই তুলিয়া লইয়া অবলীলাক্রমে গলায় ঢালিয়া দিলেন। যখন বোতল দুইটী একেবার খালি হইয়া গেল, তখন তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া তখন ভয়ে পালাইয়া গেল। রাসমোহন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দু-বোতল মদে কি নেশা হইল না?" তিনি বলিলেন—"দ্রব্যগুণের শক্তি যাইবে কোথায়? কিছু ত হয়ই।"

যাহা হউক পরে তথায় রাসমোহনবাবুর শরীর অসুস্থ হয়। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি চাঁদপুরে ফিরাইয়া আনিলেন ও তাঁহাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তথা হইতে নিজে পলাইয়া যাইলেন। আর কেহ তাঁহার দেখা পাইল না।

তাঁহার এই অবস্থায় এক কম্বল-আসন ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে ছিল না। কোথাও যাইতে হইলে, ষ্টেসনে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই কেহ না কেহ তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। তিনি নিজে কখনই বিনা-টিকিটে গাড়ীতে উঠিতেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নাঙ্গাবাবার মন্দির ও অবস্থা।

'সাধু বিহারীবাবা' তাঁহার এই নাম প্রথমে কাশীতে প্রকাশ ছিল না। তিনি যখন কাশীতে আসিয়া গঙ্গার ঘাটের উপর সম্পূর্ণ নগ্ন-অবস্থায় আসন করিলেন, তখন কাশীবাসী সকলেই তাঁহাকে '**নাঙ্গাবাবা**' বলিয়া প্রচার করিয়া তুলিল। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, এত দিনই বা তিনি কোথায় ছিলেন, কোন কথাই কেহ জানিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার কোন আশ্রম বা মঠ ছিল না, সে কারণ তিনি কখন যত্নও করেন নাই। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাদি সকল সময়েই তিনি আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কোন সময়েই তাঁহার কোনরূপ কষ্ট বোধ ছিল না। কত লোকে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কত কথা বলিতে লাগিল, তাহাদের কত কল্পনা-প্রসূত কত কথাই তখন প্রচারিত হইল। দুষ্টদিগের শ্লেষ ও তিরস্কারাদি কিছুরই অভাব হইল না। কিন্তু কাশীবাসী ভক্তবৃন্দ ও ঘাটের পাণ্ডাদিগের তাহা আর ভাল লাগিল না। তাঁহারা যুক্তি করিয়া রথের আকারবিশিষ্ট একটী কাষ্ঠের মন্দির প্রস্তুত করিয়া আনিলেন ও তাঁহাকে বহু সাধ্য-সাধনায় তাহার মধ্যে সতত অবস্থান করিবার জন্য মত করাইলেন। তিনি তখন ইচ্ছামত সেই মন্দিরের মধ্যেই থাকিয়া সচ্চিদানন্দে বিভোর হইয়া রহিলেন। কেবল স্নানের সময় বাহির হইয়া গঙ্গায় প্রাণভরিয়া

অবগাহন করিতেন। তবে তাঁহার ইচ্ছামত সেই মন্দিরটী কখন এ-ঘাটে, কখনও বা ও-ঘাটে পাণ্ডারা ধরাধরি করিয়া সরাইয়া দিত। এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, ভক্তদিগের একান্ত উদ্যোগ আয়োজনে পুঁটীয়ারাণীর ঘাটের উপর তাঁহার জন্য একটী পাকা ছোট মন্দির প্রস্তুত হইল। তিনি তখন তাহাতেই যাইয়া রহিলেন। কিন্তু কতিপয় রুচিবাগীশ বাবু-মহাশয়ের তাহাতে নিতান্ত অপ্রিয় বোধ হইল, কারণ আমাদের এই সাধু-মহারাজ, যে 'নাঙ্গাবাবা'! ঘাটগুলি সর্ব্বদা মেয়ে-ছেলে-ভদ্র-লোকের স্নান-সন্ধ্যার স্থান, এই স্থানে এ হেন নির্লজ্জ বীভৎস্য-দৃশ্য এক সম্পূর্ণ নগ্ন-ব্যক্তিকে বসিতে দেওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহারা প্রাণপণে যোগাড়-যন্ত্র করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্যে সেই মন্দির ভাঙ্গাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন ও এই উপলক্ষে—'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-সাহেব' ও থানাদারকে দিয়া তাঁহাকে এই কথা বলাইতে চেষ্টা করিলেন যে, "তুমি এই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র উঠিয়া যাও।" হিন্দুদিগের দ্বারাই এ চেষ্টা হইলেও, মুসলমান থানাদাদার-সাহেব বলিলেন—"আমি উহাঁকে কখনই বলিতে পারিব না।" তখন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-সাহেব স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে,—"এ অব-স্থায় আপনার এখানে থাকায় কেহ কেহ বিশেষ আপত্তি তুলিয়াছে" ইত্যাদি। এই কথা শুনিয়া তিনি তখনই তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। তিনি কাশীর এক প্রান্তে একেবারে সেই 'অসির' নিকট যাইয়া থাকিলেন।

এ দিকে কাশীবাসী সাধারণ ভক্তগণ তাহাতে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডাদেরও অনেক অসুবিধা ও তাঁহার

সৎসঙ্গ-লাভের সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা তখন সকলে পরামর্শ করিয়া তখনকার 'বেণারসের কালেক্টার-সাহেবের' নিকট সমবেত ভাবে আবেদন করিলেন। সেই আবেদন অনুসারে কালেক্টার-সাহেব স্বয়ং আসিয়া নাঙ্গাবাবার মন্দির পুনরায় প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়া যাইলেন। কারণ সেই পূর্ব্ব-মন্দির তাঁহার যাইবার পরই বিরুদ্ধাচারীদিগের চেষ্টায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। কাশীবাসী প্রায় সকলেই ইহাতে পরম আনন্দিত হইলেন ও পুনরায় তাঁহার জন্য দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর মর্ম্মর-প্রস্তর ও পিত্তল-ধাতু-সহযোগে নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইং সন ১৯১১ অব্দে এই মন্দির সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই উপলক্ষে তিনি এক সময় এই ভাব-প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—"দেখ, আমার বাসের উপযোগী স্থানের অভাবে, আমি ঘাটে আসিয়া বসি নাই। কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশে তোমাদের সাধারণের মঙ্গলের জন্যই, তোমাদের ধর্ম্মে, কঠোর তপস্যা ও সাধনাদিতে বিশ্বাস-স্থাপনের জন্যই এখানে আসিয়াছি। আজ কাল লোকে মনে করে যে, কৃচ্ছ্র সাধনা,তপ ও ঈশ্বরমূলক আরাধনা অসম্ভব। শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামী, ঠাকুর সদানন্দ প্রভৃতি সেকালের লোক; তাঁহাদের ন্যায় শক্তি-সামর্থ্য এখনকার লোকের আদৌ নাই। ভগবানও বুঝি আজ কাল নিদ্রিত হইয়া আছেন, পূজা-পাঠ ও যোগ-ধ্যানে কাহারও কিছুই হয় না, তাই সেই নিবিড় অরণ্য ও তুষার-প্রান্তরের মধ্যে নিজ আসন প্রতিষ্ঠা না করিয়া, শ্রীগুরুদেবের আদেশেই এই লোকারণ্যে, সহরের সর্ব্বপ্রধান বাজারের মধ্যে আসিয়াই বসিয়াছি।"

বাস্তবিক এইরূপ সিদ্ধ ও আদর্শ-সাধক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের

দর্শন পাওয়া আজ কাল একেবারেই দুর্লভ। তিনি এতাধিক লোক-নিন্দা, নির্য্যাতন ও কঠোরতাসহ কেবল লোক-শিক্ষার জন্যই যে, সর্ব্ব-সমক্ষে নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া যাইলেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাঁহার আশৈশব জীবন-আলোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কঠোর সাধনাই ভগবদ্-কৃপা লাভের একমাত্র উপায়।

তিনি প্রায় কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না, প্রশ্নাদির উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিলে—আকার-ইঙ্গিতেই দিতেন, অথবা নিতান্ত প্রয়োজন মত লিখিয়া জানাইতেন। সেই কারণেই পরে সকলে তাঁহাকে 'মৌনীবাবা' বলিত।

এই সময় এক বার তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সেই ইংরাজ-বন্ধুটী বা তাঁহার আপিসের 'বড়সাহেব' তাঁহাকে দেখিতে আসেন। লোক-মুখে তাঁহার এই পরমহংস-অবস্থার কথা শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত এক বার কথা-বার্ত্তা কহিবার জন্য ব্যাকুল হন। সাহেব কাশীতে এই দশাশ্বমেধঘাটে আসিয়া,তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া,একেবারে বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া যাইলেন। কিয়ৎ পরে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসাসহ কত কথাই বলিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরে তিনি একটীমাত্রও কথা বলিলেন না। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। তখন সাহেব কাহারও কাহারও সহিত বিহারীবাবার সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি কি খান, তাঁহার কেমন করিয়া চলে? সাহেব সে সব কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইলেন। তাহাদের দ্বারা তিনি তখন ভাল ভাল ফল-মূলাদি আনাইয়া, তাঁহাকে খাইবার

জন্য ভেট দিলেন। পরে তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার আহার-বিহার এখন বিচিত্র বিধানেই চলিতে লাগিল। পূর্ব্বাশ্রমে যাঁহার ভোগবিলাসিতা চূড়ান্তমাত্রায় ছিল, তাঁহার আজ এই ভাব দেখিলে, কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না যে, ইনিই সেই ব্যক্তি। যাঁহার নিত্য আহারাদির জন্য বাড়ীর সকলেই এক সময় ত্রস্ত ও সদাই ব্যস্ত থাকিত, কোন বিষয়ে ত্রুটী হইলে, যিনি তাহা আর গ্রহণ করিতেন না; তিনি যখন যাহা বলিতেন, তখনই তাহা যে কোন প্রকারে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত, আজ আর তাঁহার সে ভাব নাই; সে গোলযোগ ও উৎকণ্ঠাও আর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় মা। সাধনাবস্থায় ত কথাই নাই, তখন তিনি ত সদা অরণ্য-পর্ব্বতেই অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার মনোমত আহার্য্য ত দূরের কথা, অধিকাংশ দিবসই তাঁহার অনাহারেই কাটিয়া গিয়াছে। যখন গ্রাম বা লোকালয়ে আসিতেন, তখন অযাচিত ভাবে যে যাহা কিছু দিত, তাহাই অতি সমাদরে গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক জীবন-ধারণ করিতেন। কোন বিষয়ের জন্যই তিনি আকাঙ্ক্ষা বা নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার এই সংযম-অভ্যাস যে, কঠোর সাধনার অঙ্গ, তাহা বলাই বাহুল্য!

জীবের 'রসনাই' যেন জ্ঞান-বিন্দু হারাইয়া ('র'এর বিন্দু না থাকিলেই 'ব' হইয়া যায়) 'বাসনা'রূপে জীবকে ভোগের দিকে সদাই আকর্ষণ করিতেছে! বাসনাই আবার রূপভেদে—'কামনা' বা 'কাম'-অঙ্গে বিকসিত হইয়া থাকে। সেই কারণ পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে দুইটী বিশেষ ইন্দ্রিয়ে, দুই দুইটী

করিয়া শক্তিই সাধারণ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা যে কতদূর ভীষণ ও সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্জ্জয়কর, তাহা বলিয়া প্রকাশ করাও দুরূহ। তাহাই যথাক্রমে জীবের—'রসনা' ও 'উপস্থ'। **রসনা** যেমন স্থূলে 'বাক্-যন্ত্র,' তেমনি সূক্ষ্মে সর্ব্বরস-বোধের একমাত্র যন্ত্র; সেইরূপই **উপস্থ** স্থূল ভাবে মূত্র ও শুক্র-ত্যাগ করিবার যন্ত্র হইলেও, সূক্ষ্মভাবে নর-নারীর সংযোগ-সুখ বা সম্ভোগ-জনিত স্পর্শানন্দের অনুভূতি ইহা দ্বারাই সিদ্ধ হয়, সাধনার সময়ে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষাকল্পে স্থূল-শরীরের সার ধন 'বীর্য্যধারণ'-ক্রিয়া এবং সূক্ষ্ম-শরীরের সার বস্তু 'বাক্য-সংযম'-ক্রিয়ার আধাররূপ উক্ত দুইটী ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ ও রস-প্রিয়তারও আসক্তি ত্যাগ করিতে হয়। শ্রদ্ধেয় বিহারীবাবা তাহাতে যেন প্রত্যক্ষ উদাহরণ বা আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

তিনি নিত্য অনেক রাত্রি থাকিতে উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, গঙ্গা-স্নান করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি সাঁতার দিতে খুব ভাল বাসিতেন। স্নানের সময় কোন কোনও দিন সাঁতার দিয়া গঙ্গার পর-পারে যাইয়া বসিতেন, কখনও বা ও পারেই মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্নানান্তে সাঁতার দিয়া ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার মল-মূত্র ত্যাগের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, অনেক সময় পাণ্ডা-দের বাড়ীর নিকটেই করিতেন, ভক্ত-লোকেরা তাহা দেখিতে পাইলেই স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতেন। স্নানের পর প্রায়ই শ্রীমতী সুধা-প্রমুখা মায়েরা তাঁহাকে বালক-পুত্রের ন্যায় মুছাইয়া দিতেন। তাঁহার সেই প্রস্তরমূর্ত্তিসম অচল ও ভাবাতীত অথবা অতি স্বাভাবিক সরল বাল্যভাব বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। মায়ে-দের সেই স্নেহ-বাৎসল্য ভাবপূর্ণ সেবা-পূজা তিনি যেভাবে গ্রহণ

করিতেন, তাহা সাধারণ মানব-দেহে সম্পন্ন হওয়া যথার্থই অত্যন্ত অসম্ভব।

দ্বাপরান্তে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাল্যলীলায় ব্রজ-ধামে ব্রজবাসীবৃন্দের যে ভাবে সেবা লইয়াছিলেন, আজ কলির এই দুর্দ্দিনে বিশ্বনাথসদৃশ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামীর পর আমাদের এই বারাণসী-বিহারী মৌনীবাবা ঠিক তেমনই ভাবে অদ্ভুত দেব-চরিত্র বিকাশে কাশীবাসীর অলৌকিক সেবা লইতেছেন ও সকলের দর্শনানন্দ প্রদান করিতেছেন। আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত আদর্শ-পুরুষের নিকট 'আশঙ্কা' কোন কালেই তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত নর-নারী যে ভাবে ইচ্ছা, তাঁহার সেবা-পূজায় সততই নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাঁহার তৃণ-কাঞ্চন, কর্দ্দম-চন্দন, শত্রু-মিত্র কিছুই ভেদ নাই; স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞানও আজ যেন তাঁহার তিরোহিত হইয়াছে—কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কত লোকে কত পুজা-প্রণামী দিতেছে, সে দিকেও তাঁহার লক্ষ্য নাই, সেবক ও পাণ্ডারা যাহার যেমন ইচ্ছা লইয়া যাইতেছে, তাঁহার কোনও বাধা-আপত্তি নাই।

তিনি কেবল কাঁচা দুধ ও ফল-মূলাদিই সেবা করিতেন। কেহ কেহ সিদ্ধি (ভাং) ও পানও আনিয়া দিত, তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। ভক্তের ইচ্ছা-ক্রমে যখন তখন তাহাও সেবা করিতেন। সম্মুখে ফলমূল সর্ব্বদাই প্রায় পড়িয়া থাকিত, বালকের ন্যায় ইচ্ছামত তাহাও গ্রহণ করিতেন। তিনি দীন-দুঃখী বা নিতান্ত গরীবের প্রদত্ত সামগ্রী অতি আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিতেন। তাহাদের মনে পাছে কষ্ট হয় যে,আমরা 'গরীব' বলিয়া বাবা আমাদের জিনিস গ্রহণ করিলেন না। সেই কারণ তাহাদের ইচ্ছা

প্রথমেই পূর্ণ করিতেন। কখন কখন শিশুর ন্যায় তাহাদের হাতে খাবার দেখিয়া, আগে হইতেই মুখ হাঁ করিয়া থাকিতেন। তাহারাও আনন্দে যেন আটখানা হইয়া পেটের সন্তানের ন্যায় তাঁহার মুখে তাহা তুলিয়া খাওয়াইয়া দিত।

নানা বিধ ফল মুল খাবার-সামগ্রী লোকে দিয়া যাইত, তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত খাইতেন,বাকি পড়িয়া থাকিত ; ভক্ত ও পাণ্ডারা পরে-সব উঠাইয়া লইয়া যাইত। 'পরে খাইব' বলিয়া, তিনি নিজে কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তাঁহার অন্তর যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর সঞ্চয়ের চিন্তা তাঁহাকে উত্যক্ত করিবে কেন ?

কোন কোন ভক্ত চন্দনাদি নানা সুগন্ধ-দ্রব্যও আনিয়া দিত, দর্পণ ও মালাদি লইয়া আসিত, তাহাতেও অনাদর করিতেন না। তাহাদেরও মনে দুঃখ দিতেন না, ভক্তরা সেই সকল বস্তু তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিলে, তিনি তখন বাধা দিতেন না। আবার যাহার ইচ্ছা, সে সেই সকল উঠাইয়া লইয়াও যাইত। তিনি কোন বিষয়েই 'আসক্তি' অথবা 'বিরক্তি' প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার এই ভাব ক্ষণে ক্ষণে সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ শ্রীমৎ "তৈলঙ্গ স্বামী"-কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে সেই শিবস্বরূপ মহাপুরুষের দুই একটী ঘটনা যাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত,এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই এ সময় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অনেক দিনের কথা—স্বামিজী সবেমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে যেখানে সেখানে তখন প্রায়ই আলোচনা হইত। কাশীবাসী একটী অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি বাল্যাবধি স্বামিজীর সহিত নানা সূত্রে সঙ্গ করিতেন, আমরা অবসর মত

তাঁহার নিকট বসিয়া অনেক অপূর্ব্বশ্রুত পুরাতন কথা শুনিতে পাইতাম। তিনিও বেশ ভগবদ্ভক্ত ও সরল হৃদয়বান-পুরুষ ছিলেন।

এক দিন তিনি সেই **তৈলঙ্গ স্বামিজীর*** জীবন-কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন:—"আমরা তখন ছেলে-মানুষ, সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। ২০।২৫ বৎসরমাত্র আমাদের বয়ঃক্রম হইবে। এ দেশে এই সময়কে "গাধা-পচিশী" অবস্থা বলে। বাস্তবিক গাধার মত বুদ্ধি লইয়াই আমরা কতকগুলি সমবয়সী সঙ্গী মিলিয়া স্বামি-

* তৈলঙ্গস্বামীর 'নাম' অনেকে 'ত্রৈলিঙ্গ' বা 'তৈলিঙ্গ' স্বামী বলিয়া উল্লেখ করেন। আমরাও দুই একস্থলে সেইরূপ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার ঐরূপ কোনও নাম প্রচার ছিল না, তিনি পূর্ব্বাশ্রমে মান্দ্রাজী বা 'তৈলঙ্গী' ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই কারণ লোকে তাঁহাকে 'তৈলঙ্গী' স্বামী বা 'তৈলঙ্গী' বাবা বলিয়াই প্রচার করিয়াছিল। এই দেশে এইভাবে 'বাঙ্গালী বাবা', 'পাঞ্জাবী বাবা' 'নেপালী বাবা' প্রভৃতি নামের যথেষ্ট প্রয়োগ ও প্রচার আছে। স্বামিজী-মহারাজের জীবিতাবস্থায় আমরা জানিতাম যে, তাঁহার কোনই শিষ্য ছিল না, তিনি কাহাকেও দীক্ষাপ্রদানে 'মন্ত্র-শিষ্য' করেন নাই। তবে ভক্ত সেবকরূপে অনেকেই যেন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভাবে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। আজকাল তাঁহার অবর্ত্তমানে কেহ কেহ'তাঁহার শিষ্য'বলিয়া নিজেকে প্রচারপূর্ব্বক আত্মপ্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনে বেশ যত্নবান দেখা যায়। কাশীর পরলোকগত 'রুদ্রাক্ষ-বিক্রেতা' ৺ নিবারণ দাসের সহিতও আমাদের পরিচয় ছিল। তাঁহারই প্রচারিত স্বামিজীর এক খানি জীবনী প্রথমে ছাপা হয়, এক্ষণে আরও দুই এক খানি স্বামি-জীর 'জীবনী' (পূর্ব্বগ্রন্থের আধার অবলম্বনেই লিখিত) এক বার কোন ব্যক্তি আমাকে দেখাইয়াছিল। তাহা কতক কতক দেখিয়া, বিশেষ সেই জীবিত গ্রন্থ-কারের বিচিত্র সাধনাবস্থার 'ফটোচিত্র' তাহার মধ্যে দেখিয়া, পুস্তকখানি তখনই তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম। গ্রন্থকারের নাম আর ভাল করিয়া দেখি নাই। আজ কাল গ্রন্থকার হইয়া প্রথমেই নিজের 'স্বরূপ জাহির করা' যেন কাহারও কাহারও একটা উৎকট ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে।

জীকে এক বার উৎকট পরীক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলাম। সকলে মিলিয়া কিছু টাকা একত্র করিয়া, স্বামিজীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলাম—"মহারাজ, আমরা এক দিন আপনার বিশেষরূপ সেবা করিতে চাই।" স্বামিজী তখন কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি উত্তরে, অনুমতি প্রদান করিলেন। আমরা তখন যৌবনের প্রথম বিকাশে উন্মত্তপ্রায় ও অতিশয় দুষ্ট-বুদ্ধি-পরায়ণ, আমরা অধিক মাত্রায় উগ্রবীর্য্য মদ্য ও মাংসাদি সমন্বিত নানা আহার্য্য এবং ভোগ্য-বস্তু সংগ্রহ করিলাম, সে সব একটী নির্জ্জন বাটীতে রাখিলাম; ইহা ব্যতীত বাজারের একটী যুবতী বেশ্যাকেও দশটী টাকা দিয়া তথায় আনিয়া রাখিলাম। তাহার সহিত আমাদের এই সর্ত্ত ছিল যে, আমরা কেহই সম্মুখে থাকিব না—তুমি স্বামিজীকে মদ-মাংসাদি খাওয়াইয়া, তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া, তাঁহার কামের উদ্রেক করাইবে। যদি পার, তবে আরও দশ টাকা আমরা তোমাকে পুরস্কার দিব। বেশ্যা রাজী হইয়া হৃষ্টচিত্তে আসিয়া তথায় বসিয়া আছে। আমরা স্বামিজীকে পূর্ব্ব কথা মত সমাদরে তথায় আনিয়া দিলাম। তিনি উপবেশন করিলে—বেশ্যাটী খুব আনন্দ-সহকারে যেন অতি ভক্তি ভাবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, ও নানা ভাব-ভঙ্গীতে তাঁহাকে মদ্যাদি পান করাইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহা দেখিয়া একে একে সব বাহিরে সরিয়া পড়িলাম। আশে-পাশে খুব সাবধানে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। সে মদ মাংস ক্রমাগতই খাওয়াইয়া যাই-তেছে, তিনিও অম্লানবদনে তাহা সমস্তই উদরস্থ করিতেছেন, সে মদ বোধ হয় বিশজন পাঁড়-মাতালেও উদরস্থ করিতে পারে না, কিন্তু স্বামিজী আমাদের সমস্ত পান করিয়াও অচল অটল, যেন স্থির পাষাণ-

মূর্ত্তি। তাহার সহিত সেই প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীও তিনি অবলীলাক্রমে সমুদায় উদরস্থ করিয়া যাইতেছেন। আমরা ত সেই সব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক্! সেই বেশ্যাটীও টাকার লোভে তাঁহার কামোদ্দীপনার অভিলাষে যতদূর সম্ভব উত্তেজনাকর ক্রিয়া করিতে কিছুমাত্র ক্রুটী করিতেছে না। সত্য বলিতে কি, আমাদের সে ভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—"রক্ত-মাংসযুক্ত জীব-দেহ কখনই এমন ভাবে স্থির থাকিতে পারে না।" প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এই ভাবে সে বেচারী ধস্তাধস্তী করিবার পর, নিজেই সম্পূর্ণ ক্লান্ত হইয়া অতি বিমর্ষ-অন্তরে উঠিয়া নিজ বস্ত্রাদিতে সৌষ্ঠব-সম্পন্না হইয়া বাহিরে আসিল ও তাহার অকৃতকারীতা জ্ঞাপন করিল। আমরা অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমস্তই দেখিয়াছি, সুতরাং তাহার আর বলিবার কিছুই ছিল না। তাহাকে বিদায় দিয়া, আমরা স্বামিজীর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে সকলে উপস্থিত হইলাম।

তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই নির্ব্বিকার ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, আমরা বলিলাম—"মহারাজ কি এখন আশ্রমে যাইবেন?" (পঞ্চগঙ্গার ঘাটের নিকট তাঁহার আশ্রম, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'দক্ষিণকালিকা'র মূর্ত্তি ও সাধনার যন্ত্রাদি এখনও সমভাবে তথায় রক্ষিত আছে।) তিনি আমাদের কথার উত্তরে কিছুই বলিলেন না। আমরা যে তাঁহাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মানব-বোধে অতি ঘৃণ্য ও কদর্য্যভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, সে কথা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার তদবস্থার কি এক প্রকার ভীষণ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, তখন আমরাও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। তিনি আমাদের কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা বা শাসন করিবার ছলেই যেন আমাদিগের দিকে একবার

তীব্র ভাবে চাহিয়া দেখিলেন ও কিয়ৎ পরেই কি এক বিচিত্র ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বলিলেন—“সে কোথায়, সে কোথায় গেল? কে আমার কামের উদ্রেক করাইবে? আমি কি কামের অধীন? তোদের অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহরাও দু’শ বছর আগে আমায় এই অবস্থাই দেখে গেছে। আমি এত কালের বৃদ্ধ বলিয়াই কি বীর্য্যহীন, না তোদের মত নিস্তেজ নিষ্প্রভ? তবে এই দেখ—” বলিতে বলিতে তাঁহার সেই নিস্তেজ লিঙ্গ অসাধারণ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। মানবলিঙ্গ এতাধিক দীর্ঘ হইতে পারে, তাহা কাহারও কল্পনাতেও আসে না। আমরা সকলেই তখন চিত্রিতবৎ স্থির হইয়া রহিলাম। মুখে কাহারও ‘টুঁ’ শব্দটীও নাই, সকলেই ভীত ও অবাক্!

স্বামিজী তখন নিজ দক্ষিণকর কোষবদ্ধ করিয়াই তাহাতে অনায়াসে লিঙ্গভ্রষ্ট যথেষ্ট পরিমাণ শুভ্র পারদসম উজ্জ্বল প্রগাঢ় বীর্য্য গ্রহণ করিলেন, আর বলিলেন—“দেখ, তোরা নিতান্ত বালক, প্রকৃত যোগী, সাধু-সন্ন্যাসী যে কি বস্তু, কিছুই তোরা জানিস না, তাই তোদের বলিতেছি—খবরদার, আর কখনও এমন-ভাবে সন্ন্যাসী বা যোগী-সাধুকে পরীক্ষা করিতে যাস্ না। বীর্য্যহীন শিথিলেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনও জিতেন্দ্রিয় যোগী হইতে পারে না, জানিস্? আমার হাতে এ কি দেখ্ছিস্? এ বিশ্ব-বিনাশক তেজঃ-অগ্নি, ইহা ভূমিস্পর্শ হইলে, এখনই জ্বলিয়া উঠিবে, তোরা সবংশে তাহাতে একেবারে ভস্ম হইয়া যাইবি। তোদের আজ ক্ষমা করিলাম।”—এই বলিয়াই তিনি তাহা নিজের মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ তখন অলৌকিক ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সব কথা বলিতে বলিতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন কাঁপিয়া

উঠিলেন, তাঁহার মুখে তখনও ভয়বিহ্বলতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। আমিও যেন স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—“শিবের মদন-ভস্ম কি এই!”

বাস্তবিক জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণের লীলাসমূহ অদ্ভুত ও অলৌকিক বিচিত্রতাপূর্ণ। পরমহংস মৌনীবাবারও কামগন্ধ-বিরহিত লীলাব্যাপার দেখিলে, উক্ত স্বামিজীর কথা বারবার মনে পড়ে। হায়, আবার কতদিনে এমনই শিবোপম আদর্শ দেখিয়া জগৎ কৃতার্থ হইবে, গৃহী, সাধু-সন্ন্যাসী সকলেই তাঁহার আদর্শে ছায়াময়ী মায়ার মোহিনী-রঙ্গ বুঝিতে পারিবে, আত্ম-কল্যাণকল্পে, কামিনী-কাঞ্চনের বাসনা ও লোভপূর্ণ অবিদ্যার-ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে অভ্যাস করিবে, বৈরাগ্যের ক্রমোন্নত বিমল-ধারার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, আত্ম-বলে বলিয়ান্ হইতে পারিবে! দৃঢ়-ভগবদ্‌বিশ্বাস ও ভক্তি-সহযোগে শ্রীগুরুর উপদেশসহ প্রাণান্ত-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে না পারিলে, সদা পাপাসক্ত জীবের কত জন্মের সঞ্চিত মনের ময়লা কাটে না, বুদ্ধি বিনা-আয়াসে শুদ্ধ হয় না, ভগবদ্‌কৃপালাভ বা তাঁহার যোগসাধনার মূল-উপায় “চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিও” কখন হয় না।

মৌনীবাবার ধারাবাহিক সাধনক্রিয়া আজ তাঁহাকে আত্মোন্নতির চরম-শিখরে তুলিয়া দিয়াছে। এখন প্রতি ঘটে-ঘটেই তিনি সেই অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্ম-পরিধির কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া “বেদান্তসিদ্ধ প্রকৃত অদ্বৈতসত্তা” উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি এখন বিশ্ব হইতে যেন পৃথক হইয়া বিশ্বেরই দ্রষ্টারূপে পরিণত হইয়াছেন। ঘৃত বা মাখন স্বাভাবিকভাবে দুগ্ধাশ্রিত হইলেও, ‘মন্থন-ক্রিয়া’-যোগে তাহা যেমন দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়, আর তাহা

নিজ আশ্রয় বা আধারাত্মক দুগ্ধের তরল-অঙ্গে কিছুতেই মিশ্রিত হয় না, তিনিও তেমনই আজ সাধনক্রিয়ারূপ অবিরত মন্থন-সহযোগে মায়াশ্রিত সংসারী জীব হইয়াও, মায়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সংসার-মায়ায় আর তিনি ডুবিয়া যান না, সংসারও তাঁহাকে পুনরায় নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারে না। ইহাই "**আসক্তি-বিরক্তি-বর্জ্জিত**" **মহাত্মার প্রত্যক্ষ আদর্শলীলা**! জীব এই অসাধারণ অবস্থা দেখিয়াই বিস্মিত হয় ও আত্ম-মুক্তির পথ তখনই অনুসন্ধান করে।

তাঁহার এই নির্লিপ্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোক-শিক্ষার উপযোগী লৌকিক-ভাবের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে বেশ দেখা যাইত। তিনি মৌনী হইয়াও, মাঝে মাঝে ভক্তগণের সহিত যে ভাব-বিনিময় করিতেন, তাহা পূর্ব্বে ভক্তগণের সহিত ব্যবহারে বেশ জানিতে পারা গিয়াছে। তিনি সময় সময় ভক্ত ও পাণ্ডাদিগের সহিত গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। পিছনে হয় ত অনেক লোকেই আসিতেছেন, তিনি সহসা তাঁহাদের সম্মুখে যেন অদৃশ্য বা গুপ্ত হইয়া যাইলেন। "বাবা কোথায় গেলেন, বাবা কোথায় গেলেন" বলিয়া তখন সকলে এ দিক ও দিক খুঁজিতে থাকিতেন, পরে কিছু দূরে দেখেন যে, তিনি আগে আগেই যাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে, একটু হাসিয়া বলিতেন—"তোমাদের পিছনেই ত ছিলাম।" অনেক সময় এইরূপ কত অদ্ভুত ক্রীড়া তিনি ভক্তগণের সঙ্গে করিতেন। কখন বা গভীর রাত্রিতে গঙ্গাগর্ভে সন্তরণ দিতে দিতে কোথায় যে অন্তর্হিত হইতেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। যেন মায়ের কোলের মধ্যে খেলিতে খেলিতে কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইয়া অপার শান্তি উপভোগ করিতেন। যিনি পূর্ব্বাশ্রমে

সর্ব্ববিধ ভোগ ও বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও শান্তি পান নাই, তিনি আজ সেই ক্ষণভঙ্গুর শান্তি পদদলিত করিয়া "জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা"র ক্রোড়ে বসিয়া লৌকিকচক্ষে ভীষণ কষ্টকর বা কঠোরতাময় শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধন-পথে যে চিরশান্তিপ্রদ অনন্ত-আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাহা নশ্বর ভোগান্ধ-ব্যক্তিরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে?

তুষারবিদ্ধ ভীষণ জড়তাপ্রদ অসহ্য শীত, যাহাতে জীবমাত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া থাকে, গ্রীষ্মের প্রখর রবিকর-তপ্ত শীলা-প্রস্তরের অগ্নিসম জ্বালাপ্রদ উত্তাপে পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত যখন বাহিরে থাকে না, বর্ষার প্রবল-ধারাপাতে যখন সকলেই আত্ম-রক্ষার জন্য কোন ৮
নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়াও ব্যাকুলতাপূর্ণ ভাবে চিন্তিত, তখনও আমাদের মৌনিবাবা, নিরাকুল, নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার ও প্রশান্তরূপে ব্রহ্মানন্দ-ভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, এ সকলের কিছুতেই তাঁহার শান্তি-ভঙ্গ হইতেছে না।

সাধারণ লোকে অবশ্য তাঁহার সে অবস্থা দেখিবার অবসর পায় নাই, কারণ সকলেই তখন আপনার আপনার স্থূল-দেহ-রক্ষাতেই ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু যাঁহারা তাঁহারই ন্যায় সেই পরম শান্তি-পথের পথিক, তাঁহারা অনেক সময় তাঁহার সেই গগনসদৃশ প্রশান্ত-গম্ভীর ভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। আর শাস্ত্র-বাক্যের সার-উপদেশ যেন মূর্ত্তভাবে তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিতে-ছেন :—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
ইত্যুক্তং হি সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"

ভগবান মনু সুখ-দুঃখের লক্ষণ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে,

—পরের অধীন হওয়াই দুঃখ, অর্থাৎ কোনরূপে কোন বিষয়ের অধীনতা থাকিলেই, সেই বিষয়ের জন্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কোন বিষয়ের জন্যই অভাব বোধ না থাকিলে, তিনি—স্বাধীন, তিনিই যথার্থ সুখী। শ্রীসদাশিবও এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বমাত্মবশং সৌখ্যং দুঃখং তদ্-বিপরীতম্।
ইতি বিদ্বান মহেশানি লোকে বিজয়তে খলু॥"

আমাদের বিহারীবাবা এই শাস্ত্র-বাক্যেরই প্রত্যক্ষ স্বরূপ। তিনি যথার্থই পরম সুখী, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অসাধারণ 'মহাপুরুষ' পদবি-বাচ্য। এত দিনে তাঁহার জনম-জীবন স্বার্থক হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গ-লাভ করিয়া এবং তাঁহার সেই অলৌকিক আদর্শ অবলোকন করিয়াও, কত লোকের ইহ-পরকালের বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অনেকের মুক্তির-পথ মুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভক্তই ভগবদ্-লীলার সহচর।

যুগে যুগে শ্রীভগবানের এই ধরাধামে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের নানা ভাবে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যেন তাঁহার নিত্য নিয়মাধীন। বাস্তবিক সংসারে যে কোনও বিধ ভগবচ্ছক্তি বিকাশের পূর্ব্ব হইতেই, ভক্তবৃন্দই যেন অগ্রদূত হইয়া জগতে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা সূচনা করিয়া দেন; তাঁহারাই তাঁহার সেই দৈবীশক্তি সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার লীলার সহচর হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ অথবা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সেবক ও সহায়করূপে বিশ্ববাসীর সমক্ষে তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। ভক্ত তাঁহারই যে অন্তরঙ্গ, তাই সময়ে ভক্তাধীন হইয়া তিনিও বুঝি সেই সকল ভক্তের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তুলেন। ভক্ত না হইলে, ভগবানকে কেহই চিনিতে পারে না। আবার অনেক সময় প্রত্যেক লীলাবতারের প্রিয় ভক্তই যে ভগবানের স্বরূপ বা তাঁহার প্রত্যক্ষ বিভূতি, এইরূপই স্পষ্ট প্রতীত হয়। ভক্তির অন্তিম অবস্থায় বা অন্তিম স্তরে—পরাভক্তির অন্তরালে, ভক্ত ও ভগবান যে, একাকার হইয়া যান! এ সবের রহস্য যথার্থ ভক্তরাই ঠিক বুঝিতে পারেন, অথবা তিনি যাঁহাকে বুঝান, যাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করান, তিনিই বোধ হয় কালে ভক্ত হইয়া ভগবদ্-মহিমা-কীর্ত্তন-ছলে স্বয়ং ধন্য হন ও সংসারকেও ধন্য করিয়া তুলেন।

যথার্থ সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাত্মগণও ভগবচ্ছক্তি-পুষ্ট মহাপুরুষ,

তাঁহারাও সেই ভগবানের যেন খণ্ড-অবতাররূপে জগতে তাঁহারই আংশিক লীলা-বিকাশপূর্ব্বক সতত ধর্ম্মের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সদ্‌গুরুর ভক্তিমান্ শিষ্যও সেই একই ধারার অধীন হইয়া গুরু-মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক আত্মোন্নতিসহ ইহ-সংসারে নিজেরও প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। শ্রীভগবান রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, মহাপ্রভু চৈতন্য ও পরমহংসদেব প্রভৃতির বিশিষ্ট শিষ্য ও ভক্তগণই যে, তাঁহাদের অসাধারণ ভগবদ্‌-শক্তি ও মাহাত্ম্য-প্রকাশক, সে বিষয় কাহারও অবিদিত নাই।

আমাদের বিহারীবাবার লীলা-বিকাশ-সম্বন্ধেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণই যে, স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ সহায়ক হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে ঘাটের পাণ্ডা এবং কাশীবাসী নর-নারীগণ প্রধান হইলেও, কাশীর 'গুণ্ডারাই' বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রচারের সর্ব্বপ্রথম কারণ। সর্ব্বপ্রথমে তাহারা বিহারীবাবার প্রতি অসদ্ব্যবহার ও অযথা পীড়ন না করিলে, সাধারণে তাঁহার সাধন-শক্তি, সহিষ্ণুতা ও নির্ব্বিকার ভাব সহজে বুঝিতে পারিত না।

'গুণ্ডারা' তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে, প্রথমে পাণ্ডারাই তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রগামী হইত, তাহাতে তাহারাও সময় সময় অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। এক সময় তাঁহার একান্ত ভক্ত ও সহায়ক সহদেব পাণ্ডা ও ইচ্ছালালের দ্বারা তাহারা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রোধবশে তাহাদের দুই জনকেই হিংস্র জন্তুর ন্যায় কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিল, পরে মন্দিরসহ বিহারীলালকে গঙ্গার গভীর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও, সেই পাণ্ডারা প্রথম হইতেই বাবাকে প্রাণপণে

রক্ষা ও সেবা করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে একবার ধূনির উপর ফেলিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল, তখন কাশীবাসী ভক্তিমতী মায়েরা গুণ্ডাদের কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি এইরূপ অমানুষিক যন্ত্রণা প্রদান দেখিয়া দুঃখে মর্ম্মাহতা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন ও প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহাকে আরোগ্য ও সুস্থ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সেই মায়েরা বিহারীবাবাকে ক্রমে চিনিতে পারেন ও তাঁহার অসাধারণ বিভূতি-সমূহও ক্রমে জানিতে পারিয়া, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

বাবা, নিজ উদরের জন্য এক্ষণে কোনও দিনই কিছুমাত্র যত্নচেষ্টা করিতেন না, অযাচিত ভাবে দুগ্ধ ও ফল-মূলাদি, যে কেহ তাঁহাকে যাহা কিছু দিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি আনন্দের সহিত দিনাতিপাত করিতেন। শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুপ্রভাব যেমন তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারিত না, কাম-ক্রোধাদি রিপুসমূহও তেমনই তাঁহাকে আর বিহ্বল করিতে সমর্থ হইত না।

তিনি সাধারণতঃ মুখে একটীও কথা বলিতেন না, কিন্তু ভক্তগণের সহিত নিজ লীলা-বিকাশের জন্য বৃথা বাক্য বিন্যাস না করিয়াও, নানা অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন। এক সময় ভক্তদের আগ্রহে তাহাদের সহিত গঙ্গায় নৌকারোহণে বেড়াইতেছেন—সহসা সকলের সম্মুখে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেই অতল জলের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া যাইলেন, কেহই আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ভীত ও চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ক্রমে তাহারা সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল, ভাবিতে লাগিল, তিনি

এই ভাবেই বুঝি 'সমাধি' লইলেন ! এমন সময় সহসা দূরে দেখা গেল, তিনি আপনমনে অবলীলাক্রমে গভীর জলের উপর সাঁতার দিতেছেন !

এক বার ভাদ্র মাসের ভরাগঙ্গায়, যখন কাশীর প্রায় সকল ঘাটই ডুবিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, সেই অতল জল ও তাহার প্রবল স্রোত, শক্তিশালী বিচক্ষণ মাল্লারাও যে সময় সহসা জলে ডুব দিতে সাহস করে না, সেই সময় একজন ভক্ত ইচ্ছা করিয়াই, কেবল বাবাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহার ঘটিটী (লোটাটী) দূরে, (বাবার ও অন্যান্য সমাগত ভক্তগণেরও অসাক্ষাতে) গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। সে সময় জলের স্রোতে ভারী পাথরখণ্ডও নিমেষের মধ্যে বিশ হাত অগ্রে ভাসিয়া যায়, সহসা সেই স্থলেই ডুবিয়া তলস্পর্শ করিতে পারে না। সেই লোকটী তখন বাবার নিকট আসিয়া তাহার সেই ঘটিটীর জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করে। তিনি তাহার মনোভাব তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে কারণ একটু হাসিয়া তখনই গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও সেই স্থানেই একটু ডুবদিয়া ঘটিটী তুলিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে তখন লজ্জায় ভক্তিগদ্‌গদ অন্তরে তাহার চরণে নিপতিত হইয়া বার বার 'ক্ষমা' প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ভক্ত মানবের ন্যায় পশু-পক্ষীরাও ঘাটের ধারে বাবার সেই ক্ষুদ্র মন্দিরের আশে পাশে সর্ব্বদা থাকিয়া, তাঁহার সহিত যেন নানা ভাবে আনন্দ-বিনিময় করিত, তাহারা মানুষের মতই যেন তাঁহার সব কথা, সমস্ত ইঙ্গিত, বুঝিতে পারিত, তাঁহারই আদেশ-মত তাহারা কাজও করিত। ভক্তগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা দুগ্ধ ফল-মূলাদি আনিয়া নিবেদন করিত, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা পান

বা ভোজন করিতেন, অবশিষ্ট—যে তখন নিকটে উপস্থিত থাকিত—তাহাকেই প্রদান করিতেন। তাহারাও ভক্তিভাবে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। কোনও মানব-ভক্ত উপস্থিত না থাকিলে, গরু-বাছুর, কুকুর-বানর, কাক-চড়াই আদি পশু-পক্ষীদেরও মধ্যে যে কেহ বা যাহারা উপস্থিত হইত, তাহাদিগকেই দিতেন। সময় সময় দুই তিনটী কুকুর, বানর বা পাখী উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার ইঙ্গিত মত তাহারা একে একে একই পাত্র হইতে দুধ ও ফল-মূল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিভাগ-অনুসারে পান বা ভোজন করিত। কেহ অধিক, কেহ অল্প, বা একের অংশ অন্যে খাইতে পারিত না, অথবা তাহা লইয়া পরস্পরে ঝগড়া বা বিরোধও করিত না।

এক সময় একটী দুষ্ট লোক দুগ্ধের সহিত বিষ-সংযোগ করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দেয়, তিনি তাহা দেখিয়াই প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং লোকটীর বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাহা পান করিলেন না। যে স্থানে তাহা রাখিয়াছিল, সেই স্থানেই তাহা পড়িয়া রহিল। সে লোকটীও তথায় বসিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে আরও দুই চারি জন ভক্ত তথায় উপস্থিত হইল, সকলে বসিয়া আছে, এমন সময় একটী কুকুর আসিয়া তাহাতে মুখ দিতে যাইলে, সকলে তাহাকে বাধা দিতে যাইল, বাবা মানা করিলেন, কুকুরটা সামান্য দুধ পান করিলে, বাবা কুকুরটাকে আর খাইতে নিষেধ করিলেন। তখন সে আর খাইল না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই কুকুরটা তথায় বেহুঁস হইয়া পড়িল, বাবা এক জনকে তাহার সেবা করিতে বলিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ কুকুরের অবস্থা দেখিয়া, তখনই সেই লোকটাকে ধরিয়া পুলিসের

হাতে সমর্পণ করিতে যাইলে, তিনি সেই দুধের পাত্রটী ফেলিয়া দিয়া, তাহাদের নিরস্ত করিলেন।

বিহারীবাবার এই প্রকার নানা লীলা ভক্তগণের মধ্যে সময় সময় প্রকাশ হইয়া পড়িত। সে সকল কথা প্রকাশ করা নানা কারণে অসম্ভব।

তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কাশীবাসী কয়েকটী ভদ্রমহিলাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে সুধন্বা (সুধা), মাহেশ্বরী, লক্ষ্মী, ভুবনেশ্বরী ও রামতারা প্রভৃতি কয়েক জনা তাঁহার অতীব অন্তরঙ্গ সেবিকারূপে তাঁহার লীলা-মাহাত্ম্য বিকাশের প্রধান সহায়িকা ছিলেন। বিহারীবাবার '**জীবনামৃতের**' সহিত ইহাঁদেরও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও তাঁহার সহিত কিরূপ অন্তরঙ্গ-সূত্রে ইহাঁরা জড়িত ছিলেন, তাহার কিছু কিছু প্রকাশ না করিলে, ইহা যথার্থই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ইহাঁদের মধ্যে **সুধা-মা বা সুধন্বার** পরিচয় সর্ব্বাগ্রেই প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ ইনিই তাঁহার শ্রেষ্ঠা সেবিকা ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মায়েদেরও যথাযথ পরিচয় সংক্ষেপে পরে বর্ণিত হইতেছে।

'সুধা' বরিশাল জেলার অন্তর্গত 'গাভা'-নিবাসী অভয়চরণ ঘোষের কন্যা,চারি পুত্রের পর কলিকাতা "কালীঘাটের" শ্রীশ্রীকালী মাতার নিকট একটী কন্যা-কামনায় মানস করিলে, অভয়বাবুর এই কন্যারত্ন লাভ হয়। বরিশালের 'বাকল' গ্রাম-নিবাসী বরদাকান্ত বসুর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু হওয়ায়, বালবিধবা সুধা নিজ জ্যেষ্ঠ-সহোদর শরচ্চন্দ্র ঘোষের নিকটেই প্রতিপালিতা হন। তখন হইতেই তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও সাধনার

নিষ্ঠা প্রবল হইয়া উঠে। বাড়িতেই নিজেদের ঠাকুরঘরে নিত্য পূজাপাঠ লইয়াই সতত ব্যস্ত থাকেন। পুরোহিত মহাশয়ের নিকট পূজা-অর্চ্চনার সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা করিয়া লইতেন। সে কারণ অনেক সময় তাঁহার নিকট ইহাঁকে থাকিতে হইত। সে দৃশ্য কাহারও কাহারও চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সেই উপলক্ষ করিয়া ইহাঁর চরিত্র সম্বন্ধেও স্পষ্ট সন্দেহ করিতে তাহারা বিরত হইল না। ইনি তাহাতে আর পুরোহিতের নিকট সাধানাদি শিক্ষা করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, তাঁহার সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা-বিষয়ে প্রথম হইতেই ইহাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, সেই হেতু আহারাদিতে নিজের সংযম বৃদ্ধি-মানসে, ইনি ক্রমে অন্নত্যাগ করিবার এক অভিনব কল্পনা করিলেন। একটী নির্দ্দিষ্ট নারিকেল-মালা লইয়া, তাহারই এক মালা পরিমাণ চাউল নিত্য লইয়া, তাহাই স্বহস্তে পাক করিয়া এক বেলা ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে প্রত্যহ অবসর সময়ে সেই মালার কিনারা পাথরের শীলের উপর এক বার করিয়া সামান্য সামান্য ঘসিয়া রাখিতেন, তাহাতে মালার গভীরতা ক্রমে কম হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই মালার পরিমিত চাউলও ক্রমে কম হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সেই নিত্য ভোজ্য চাউলের পরিমাণ একেবারে কমিয়া যাইলে, ইহাঁর অনায়াসে অন্নত্যাগ অভ্যস্থ হইয়া গেল। তাহার পরে—তিল, বেলপাতার রস ও নিমপাতা আদি খাইয়াই ইনি জীবন রক্ষা করিতে যত্ন করেন।

এই সময়ে ঢাকার বারদীর শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম পূর্ব্ববঙ্গে যথেষ্টরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার মানসে তথায় যাইলে, ইনি জানিতে পারিলেন যে, ব্রহ্মচারী মহা-

রাজ তৎপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন বিফল-মনোরথ হইয়া, অতীব মনোকষ্টে ইনি ঘরে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর ভট্টপল্লীর এক ব্রাহ্মণের নিকট সাধারণ ভাবে দীক্ষান্তে নিজ ভ্রাতা শরৎবাবুর সহিত কাশীবাস করিতে আসেন। সন ১৩০৭ বঙ্গাব্দে দশাশ্বমেধ ঘাটে পরমহংস-প্রবর আমাদের বিহারীবাবাকে দেখিয়া সহসা ইহাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কি এক অপূর্ব্ব ভাব হয়, ইনি সেই অবধি পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন। তখন হইতেই কায়-মনে তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

এক দিন স্নানান্তে বাবা ঘাটে উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও তাঁহার গাত্র জলসিক্ত, তাঁহার সেই নগ্ন অসাধারণ বালভাব দেখিয়া সুধা-মায়ের ইচ্ছা হইল, বাবার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিব। তিনি এক খানি নূতন গামছা আনিয়া অসঙ্কোচে তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। বাবা তাহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না দেখিয়া, তিনি সেই অবধি নিত্যই স্নানের পর তাঁহার আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিতেন। বাবাও সুশীল বালকটীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সে বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, আমরাও অনেক সময় স্বচক্ষে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতাম। তদবধি সুধা তাঁহার সেবার জন্য নিত্য দুগ্ধ আনিয়া দিতেন, কিন্তু বাবা তাহা প্রথম প্রথম পান করিতেন না, তাহা কুকুরকে খাইতে দিতেন। তাহা দেখিয়াও সুধা প্রত্যহ দুধ আনিতে নিবৃত্তা হইলেন না। এই ভাবে সাত দিন অতীত হইলে, অষ্টম দিবসে সুধা পূর্ব্ববৎ দুধ আনিলে, বাবা তাহাও কুকুরের মুখে দিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি নিত্য দুধ আনিয়া দাও কেন? আমি ত উহা পান করি না, নিত্যই কুকুরকে দিতেছি,

দেখিতে পাইতেছ ?" সুধা তাহার উত্তরে বলিলেন—"আমি দুধ আনিয়া নারায়ণকেই নিবেদন করি, যাঁকে দিই তিনিই তাহা গ্রহণ করেন, এই আমি জানি—তিনি পরে তাহা ফেলিয়া দেন বা কি করেন, সে কথা আমার ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

সুধার কাশীবাসকালে, তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা চারি টাকা করিয়া তাঁহার খরচের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। সুধা সেই টাকা হইতে কেবল একটীমাত্র টাকা নিজের জন্য খরচ করিয়া, বাকি টাকায় বাবার জন্য দুগ্ধ আদিতে খরচ করিতেন। নিজে যবের আটা খরিদ করিয়া তাহাই জলে গুলিয়া প্রত্যহ খাইয়া জীবন-ধারণ করিতেন।

শরৎবাবু কাশীতে আসিলে, সুধা বিহারীবাবাকে—"আমার ছেলে" বলিয়া দেখাইয়া দেন। সেই অবধি বাবার জন্য যাহা কিছু খরচ-পত্র প্রয়োজন হইত, শরৎবাবুই তাহা নিয়মিত পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার থাকিবার জন্য তিনিই প্রথমে ভাল মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন।

বাবা, সুধার সেবা ও ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া কেবল তাঁহার সহিতই কখন কখনও কথা বলিতেন, তাঁহাকে সুবিধা মত শিক্ষা ও উপদেশও প্রদান করিতেন। কোন কোন সময় শিশু বা বালক ভাবে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন-পান করিতেন। সুধা বাল-বিধবা, তাঁহার স্তনে দুধ থাকিবার কথা নহে, কিন্তু দৈবানুগ্রহে তাঁহার স্তনে অফুরন্ত দুগ্ধের সমাবেশ হইল। কেহ কেহ সে কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইল, কেহ বা কত সন্দেহ করিতে লাগিল।

সাংসারিক মানবের মন সংশয়ের চির-সহচর, চাক্ষুষ-দর্শনেও

সত্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু 'সত্য'—চিরদিনই—সত্য, তাহা অগ্নির ন্যায় অধিকক্ষণ মিথ্যারূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে না, সময়ে আপনি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

লোকের মুখে আবরণ দিবার কিছুই নাই, মনে আসিলেই অসংযতবাক্ মানবের পক্ষে তখনই তাহা প্রকাশ করা স্বাভাবিক বা তাহাই যেন তাহাদের প্রাকৃতিক-ধর্ম্ম! তাহাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, ঘৃণা ও লজ্জাদি অন্তরের স্বাভাবিক ভাবসমূহ যেন আপনা আপনিই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে; সেই সঙ্গে কোন না কোন শব্দেও তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। উচ্চ-বর্ণজ ও ব্রহ্মচর্য্য পুষ্ট সৎ-মানব প্রয়োজন মত তাহার সংযম করিতে পারে; আত্ম-প্রবঞ্চক বা ছল-পরায়ণ ব্যক্তিও 'সংযমের' পরিবর্ত্তে তাহার 'সংগোপন' করিতে সমর্থ হয়। সে সকলই অবশ্য ক্রমশঃ অভ্যাসের ফল। সাধারণ মানব প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই তাহার যথাযথ আচরণ করিয়া থাকে। সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানেরও উপদেশ এই যে—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।" ইত্যাদি।

বৈরাগ্যাদি সাধনার অভ্যাসের ফলে, সাধক দুঃখে সুখে সদাই সমজ্ঞান করিতে যত্নবান হইবে। অর্থাৎ তাঁহার দুঃখে কাতরতা-ব্যঞ্জক কোন ভাবেরই বিকাশ হইবে না, অথবা সুখে স্পৃহাশূন্য হইবার কারণ, সুখের অনুভব সময়েও অন্তর-বাহ্যে সেই আনন্দোৎফুল্ল ভাবের আদৌ অভিব্যক্তি হইবে না। তাহাই ভাবাতীত হইবার ক্রমোন্নত পন্থা, তাহা প্রবঞ্চকের আত্ম-গোপনতা নহে! সাধারণ মানব অনেক সময় গীতার এই পবিত্র উপদেশ মুখে উচ্চারণ করিলেও, সাধনা বিনা তাহা কখনই কার্য্যে পরিণত

করিতে পারে না। ছল ও প্রবঞ্চকও নিজ স্বার্থ বা কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্যও তাহার অসৎ ভাবের অভ্যাস করিয়া থাকে, তাহাতেও অসৎ-বৃত্তিপরিপোষক আত্ম-সংযম আছে। কিন্তু ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন আধুনিক লোক-জনের হীন-প্রবৃত্তিবশতঃ পরচর্চ্চা পরনিন্দা করিবার সময়, সেরূপ সদসৎ কোন প্রকারই সংযমের প্রয়োজন হয় না। তাহা যেন সদাই বাধা-আপত্তিবিহীন বা বিচার-বিবেচনা-হীন নিরঙ্কুশ হস্তিযুথের ন্যায় উদ্দাম ও উন্মত্ত। মুখে আসিলেই, যেন অবলীলাক্রমে ও অসংযমে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। তাহার ফলাফলের বিচার করিতেও আর ইচ্ছা হয় না। আবার পরকুৎসা বা নিন্দাজনক কোন কথা শুনিবামাত্র আজকাল প্রায় সকলেই তাহা 'অভ্রান্ত-সত্য' বলিয়াই একেবারে দৃঢ় ধারণা করিয়া বসে, তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে বিচার করিবার তিলমাত্রও অবসর থাকে না। তাহা যেন প্রমাণ-প্রয়োগে একেবারে দৃঢ়মূল সিদ্ধ বা স্বতঃ-সিদ্ধ বেদবাক্যসদৃশ! জীবের এ হেন অধোগতি যে, প্রত্যক্ষ কলিকাল-মাহাত্ম্য—তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই হেতুই প্রকৃত বা সত্যমূলক কাহারও যথার্থ মাহাত্ম্য বা সুখ্যাতিও অনেকের শ্রবণপথে সহসা প্রবেশ করে না, তৎপরিবর্ত্তে বিকৃত নাসাকুঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অপ্রত্যয়তার ভাবোদ্দীপক ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাষাই অবিলম্বে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং 'সুধা'-সম্পর্কীয় এই সকল কথায় অনেকেরই নানা অসৎ ধারনাই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। শিব-অঙ্গস্থিত সর্পের উপর আঘাত করিলে, তাহা যেমন শিবের উপরেও পতিত হয়—সেইরূপ সুধার সম্বন্ধে নিন্দাবাদে বিহারীবাবারও উপর নানা কল্পিত নিন্দা ও সন্দেহ প্রচার হইতে লাগিল। তিনি স্তুতি-নিন্দার অতীত হইলেও,লোকে তাঁহার বিষয়ে

কুৎসা-প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। কেহ কেহ তাঁহার ব্যাভিচার প্রমাণ করিবার মানসে, গোপনে গভীর নিশাকালে তাঁহার আশে পাশে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তাহার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এক দিবস কয়েকটী বিদ্যার্থী বালক আসিয়া এক জন ব্রহ্মচারী সাধুকে গোপনে কি বলিল, তিনি তদুত্তরে তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা কি পাগল হইয়াছ? তিনি মহাপুরুষ, আসক্তি-বিরক্তি-বর্জ্জিত। তোমাদের এরূপ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।" তাহারা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারি। সেই বিদ্যার্থীরা দশাশ্বমেধের নিকট এক প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা দশাশ্বমেধের ঘাটে নিত্য বিচরণ করিত।

ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন - "তোমরা স্বচক্ষে কিছু দেখিয়াছ কি?" তাহারা বলিল—"অনেক রাত্রিতে কোন কোন স্ত্রী-লোককে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।" তিনি বলিলেন—"এ কথায় সন্দেহ করিবার কি আছে? মায়েরা সকল সময়েই ত উহাঁর সেবায় নিযুক্তা থাকেন। আচ্ছা, আজ আমি তোমাদের কথামত তোমাদের কবিরাজ-খানায় রাত্রিতে থাকিয়া সমস্ত দেখিব।"

সেই দিন ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহাদের সহিত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সকল ঘটনাই স্বচক্ষে দেখিয়া একবারে বিমোহিত হইলেন।

গভীর নিশায় কাশীর পথে-ঘাটে যখন জন-মানবের সমাগম নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ, তখনও বাবার নিকট কেহ কেহ স্থির

হইয়া বসিয়া আছে। তিনি ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, কিন্তু সমাগত দুই একটী ভক্ত মাঝে মাঝে তাহাদের আত্ম-নিবেদন করিতেছে। বাবার কতিপয় মোসলমান ভক্তও ছিল, সে কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার কোন কোন ভক্ত ও পাণ্ডাদের অনিচ্ছাবশতঃ দিবসে তাঁহার সেবায় না আসিয়া গভীর নিশাকালেই আসিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিত, ফুলের মালা পরাইয়া দিত, নানা উপাদেয় ফলমূলাদি নিবেদন করিত। তাহারা বলিত—"নেমাজের সময় বাবাকে তাহারা সম্মুখে দেখিতে পায়।" বাবার নিকট তাহারা সানুনয় কৃপা প্রার্থনা করিত। ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি গোপনে থাকিয়া তাহা-দের এই অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। যখন তাহারা চলিয়া গেল, তখন সম্পূর্ণ মহানিশা-কাল—কেহ কোথাও নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল ঝিঁঝির স্বর ব্যতীত আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই, এক জনা মাই ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, মায়ের বক্ষস্থল তখন উন্মুক্ত, পীনোন্নত পয়োধর দুগ্ধে পরিপূর্ণ, শিশুকে স্তন দানের ন্যায় দক্ষিণ-হস্তে নিজ স্তন ধরিয়া বাবার দিকে আগাইয়া ধরিলেন, বাবাও আনন্দগদ্‌গদভাবে নিজের দুইটী হাত ভূমিতলে রাখিয়া, তাঁহার দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া মুখটী বাড়াইয়া দিলেন ও নিতান্ত বালকের ন্যায় স্তন পান করিতে লাগিলেন। পর পর দুইটী স্তনই পান করিয়া বাবা সিধা হইয়া বসিলেন, সেই মাও বক্ষে বস্ত্রাবরণ দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"বাবা, এখন আমি আসি?" তিনি আনন্দাশ্রে সম্মতি দিলে, মা পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় এই অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আনন্দে

বিমোহিত হইলেন। বিদ্যার্থীরাও আজ এই ঘটনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইল। তৎপরে তাহারা নিতান্ত শঙ্কিত ভাবে বাবার নিকটে যাইয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনা ব্রহ্মচারীজী নিজমুখে এক দিন ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। আমরাও অনেক সময় দশাশ্বমেধের নিকট অবস্থান কালে, তাঁহার এইরূপ অনেক লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম।

যাহা হউক সুধার ন্যায় আরও কোন কোন মাও তাঁহাকে বাল-গোপালবোধে নিজ স্তন্য-পান করাইয়া ধন্য হইয়াছেন। কেহ কেহ এখনও তাঁহাদের মধ্যে জীবিতা আছেন, তাঁহাদের মুখে এখনও তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বাল-লীলার কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে হয়। সেই মায়েরা আমার নিকট কখন কখন দর্শন করিতে আসেন, আমি তাঁহাদের সহিত বাবার লীলামৃত আলোচনা করি, তাঁহারাও সাশ্রুনয়নে সেই সকল কথা আমার নিকট অসঙ্কোচে নিবেদন করিয়া যেন নিজেদের ধন্য মনে করেন। এখনও তাঁহারা বাবার সেই মন্দির-দ্বারে বসিয়া তাঁহারই ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—সুধার ন্যায় মাহেশ্বরী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি কয়েকটী মাইও তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ লীলা-সহচরী ছিলেন। "মাহেশ্বরী" মায়েরও 'আত্মকথা' অপূর্ব্ব।

হাবড়া জেলার শিয়াখালাস্থিত প্রসিদ্ধ 'সাতভেয়ে—চাটুজ্যে-দের' পৌত্রী **শ্রীমতী মাহেশ্বরী দেবী** পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত অশেষ পুণ্যফলে শৈশবাবস্থাতেই সাধুভাবাপন্ন ছিলেন। সাধু দেখিলে, সাধুর কথা শুনিলে, তাঁহার সেই বয়সেই বিশেষ আনন্দ হইত। প্রকৃত সাধু-সঙ্গ করিবার জন্য বাল্যাবধি তাঁহার হৃদয়ে

কেমন এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই কারণ দেশে সাধারণ গৃহস্থের অন্তঃপুরে তাঁহার মন আদৌ টিঁকিত না। অল্প বয়সেই বিধবা হওয়ায়, সেই ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিল। কাশীবাস করিবার মানসে নিজ গর্ভধারিণী মাতা ও সহোদরের সঙ্গে তিনি কাশীতে আসেন। আসিবার সময় তাঁহার তীব্র সাধু-দর্শনের বাসনা দেখিয়া তাঁহার মা বলিয়াছিলেন, "কাশীতে যাইয়া তোমাকে 'জগৎ-পিতার' দর্শন করাইয়া দিব। তুমি কোন চিন্তা করিও না।"

মায়ের সহিত কাশীতে আসিয়া দশাশ্বমেধে বিহারীবাবাকে দেখিয়াই মাহেশ্বরী 'জগৎপিতা' বলিয়া তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সেই অবধি তাঁহার দর্শন-মানসে অবসর মত কখন কখন ঘাটে আসিতেন। যখন যাহা জুটিত আনিয়া তাঁহাকে খাইবার জন্য নিবেদন করিয়া দিতেন। এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, বাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও?" মাহেশ্বরী বলিলেন—"আমি কিছুই চাই না, কেবল আপনারি দর্শন ও সেবা করিতেই চাই।" বাবা তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক এক দিন সকালে তাঁহার স্তন্য-পান করিবার ইঙ্গিত করিলেন। তদুত্তরে তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—"বাবা, আমি যে বালবিধবা, আমার মায়ে ত দুধ নাই।" তিনি তখন ভাবে প্রকাশ করিলেন—"যথেষ্ট আছে"। মাহেশ্বরী তখনই নিজ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে, অনুভব করিলেন। কিন্তু মুখে ধীরে ধীরে বলিলেন—"মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দুপুরবেলা আসিব।" তিনি বাবাকে প্রণাম করিয়া তখন চলিয়া গেলেন।

মাহেশ্বরী সেই অবধি নানা চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িলেন—"বাবা আমার মাই-খাইতে চান, কেমন করিয়া তাঁহাকে মাই-

দিব ?" দেখিতে দেখিতে বেলা হইতে লাগিল, তাঁহার নিকট আবার প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন যে, দুপুরবেলা আসিবেন। কি অছিলায়, কেমন করিয়া তেমন সময় বাড়ীর বাহির হইবেন, এইরূপ অশেষ চিন্তায় তাঁহার মন-প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। মাকে বলিয়া, এক আনার ক্ষীর ক্রয় করিয়া, বাবাকে দিতে যাইলেন। কিন্তু দুপুরবেলায়—কত লজ্জা ও ভয়ে তাঁহার পা যেন সরিতেছিল না। কোনরূপে সুধামায়ের বাসায় আসিয়া অন্যমনস্কে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পায়ের উপর পাথরের শীল পড়িয়া গেল; সুধা 'জল-ন্যাকড়া' দিয়া পায়ের আঙ্গুল বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বাবার নিকট যাইলে, তিনি মাই-খাইবার জন্য যেন অতীব আনন্দে মুখ বাড়াইয়া দিলেন, মাহেশ্বরী তখন দ্বিধাশূন্য ভাবে যথাথই পবিত্র মাতৃ-ভাবে তাঁহার মুখে স্তন দিলেন। তিনি একটী মাই খাইয়া অন্য মাইও খাইলেন। সেই অবধিই প্রত্যহ মাহেশ্বরীমা বাবাকে মাই দিতেন। আর তাঁহার সঙ্কোচ থাকিল না। ঘোড়া-ঘাটের 'ক্ষুণ্ণু পাণ্ডা' বাবার এক জন অন্তরঙ্গ-ভক্ত, কখন কখন সে তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকেও মাহেশ্বরী-মায়ের মাই-খাইতে বলিতেন,—সে উত্তরে বলিত—"আপনিই খান।"

কাশীতে এই সব কথাও ক্রমে প্রচার হইয়া পড়ায়, সেই বিষয়ের প্রকৃত আলোচনার উদ্দেশ্যে কাশীবাসী পণ্ডিতগণ এক সভা করেন। তথায় সর্ব্বসমক্ষে বাবা সুধামায়ের ক্রোড়ে বসিয়া শিশুর মত মাই খাইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার এক ভক্ত নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন ঃ—

"ব্রহ্মভাবের খেলাতব, কে জানে হে ভক্ত বিনে,
যারে জানাও সেই তা জানে, কে জানিবে কৃপাবিনে।

ঐ যে তোমার বিমল ভাব,কেউ বলে শিব,কেউ বা কেশব,
সুধাকে পরীক্ষার তরে মাতৃভাবে স্নেহের ফেরে,
জলে স্থলে অচলে প্রান্তরে ফেলিলে তারে;
জেনে তোমায় নন্দদুলাল কাশীবাসী মাতৃগণে
করে ভক্তি, মুক্তি পেতে, আশায় তোমায় স্তন-দানে।
ভালবাস স্তনসুধা, তাই সুধাস্তনে দিলে সুধা,
ঘুচাতে কলঙ্ক-সুধার কাঁদালে আটাশী জনে॥"

শুনা যায় তিনি বাল-গোপাল ভাবে অষ্টআশী জনার স্তন-সুধা পান করিয়াছিলেন।

সাবিত্রীমাকে বাবার নিকট আনয়ন উপলক্ষে, তাঁহার সেবা ও সহায়তাদি বিষয়েও সুধামা প্রভৃতি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। তাহা পরবর্ত্তী অংশে সাধু-জীবনের প্রসঙ্গমধ্যেই উক্ত হইবে।

বাবার আর একটী অন্তরঙ্গ-ভক্ত **শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী**। ইনিও ব্রাহ্মণ-কন্যা। বাঁকুড়া জেলার 'দারাপুর'গ্রামে ইহাঁদের বাস ছিল। বাল্যকালেই দ্বাদশ-বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হইয়া নিজ গর্ভ-ধারিণী মায়ের কাছে ছিলেন। ইং সন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে মায়ের সঙ্গেই কাশীবাস করিতে আসেন। পরে তাঁহার মায়েরই সহিত মাঝে মাঝে বিহারীবাবার নিকট আসিয়া বসিতেন। তাঁহার জননী,বাবার সেবার জন্য 'ঝাঁজর'ভরিয়া গঙ্গাজল আনিয়া দিতেন। লক্ষ্মীমাও তাহাতে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন ও অবসর পাইলেই তাঁহার নিকট বসিয়া কেবল কাঁদিতেন। তাঁহার জননী বাবার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী-মেয়েটীকেও সর্ব্বদা সকরুণ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বাবা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকেও সাহস দেন। এক দিন তিনি লিখিয়া

জানান—"ভয় কি? কাঁদিস না, তোকে উদ্ধার করিব।" লক্ষ্মীর বাল্যাবস্থা হইতে গান গাহিবার অভ্যাস ছিল। বাবা অন্তরে তাহা জানিতে পারেন ও এক দিন ইঙ্গিত করেন—"তুমি ত গান জান, তবে গান গাও।" আর এক দিন বাবা লিখিয়া বলিলেন—"তুমি বিধবা হইবার পর, যে গানটী রচনা করিয়াছিলে, সেইটী গাও।" লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, ভাবিলেন—"এ কথা ত কেহই জানে না, ইনি কেমন করিয়া জানিলেন—ইনি ত তবে মানুষ নন্, নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ শিব বিশ্বনাথ!" সেই অবধি তাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইয়া গেল। সেই অবধি লক্ষ্মী, বাবার সেবায় চিরজীবনের জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহারই ধ্যানে নিজ চিত্ত নিমগ্ন রাখিতেন। অপূর্ব্ব-ভাবমদে যেন উন্মত্তপ্রায় ও সদাই ভজন-নিরত থাকেন। তাঁহার সেই ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠ-নিঃসৃত অসঙ্কোচে অবিরত গীতধ্বনি শুনিয়া অতি বড় পাষণ্ডও বিমোহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাকে সকলেই এখন "পাগলীমা" বলে। যাহা হউক তিনি অবসর মত শ্রীমতী সাবিত্রীমায়েরও সাধ্যমত সেবা করিয়া থাকেন ও মায়ের পতি-পূজার একান্ত সহায়তা করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী-মেয়েটীর গানে, বাবাও খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে স্বরচিত বহু গান বাবাকে শুনাইতেন। তাঁহার দুই একটী স্বরচিত গান নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

এক সময় তাঁহার উপর কোন বিশেষ কারণে বাবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড দিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে নিকটে আসিতেও তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন ও দশাশ্বমেধের উত্তরাংশের ঘাটে, যাহাকে

সাধারণ লোকে কিছু দিন হইতে 'ঘোড়াঘাট' বলে, সেই স্থানেই একা বসিয়া দণ্ড ভোগ করিতে বলেন। তখন লক্ষ্মী-মেয়েটী অতি দুঃখে কাতর ভাবে চিৎকার করিয়া কেবল গাহিতেন। এক দিন নিম্নলিখিত গানটী গাহিলে, বাবা স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় নিকটে আসিবার আদেশ দেন।

রাগিণী—বেহাগ-খাম্বাজ।

"ওহে বিভূতিভূষণ যোগী নারায়ণ,
ধন্য তোমার শাসন ওহে দণ্ডধারি!
তুমি এ ভব সংসারে আনিয়ে আমারে,
কতই রকম সং—সাজালে বিহারি!
সং-সেজে সংসারে, হলাম বড়ই শ্রান্ত,
এ বার শ্রীচরণে স্থান দাও হে শ্রীকান্ত,
আমার বাসনা একান্ত, হে সাবিত্রীকান্ত,
এ জিহ্বা যেন সদাই বলে গো বিহারী॥
তব শ্রীচরণ যে করে সাধন,
ঘুচে যায় যে তার ভবেরই বন্ধন,
ওহে কলঙ্ক-ভঞ্জন, বিপদ-বারণ,
আমায় বিপদে শ্রীপদে রাখিও বিহারি!!
এই কাঙ্গালিনী বলে—শুন কাল সোনা,
আমায় কাঙ্গাল বলে, মনে করিওনা ঘৃণা,
তোমায় কাঙ্গালের নাথ বলে—
আর কেহ ত ডাক্‌বে না, বিহারি,—
আমি যদি এই ভবে ডুবে মরি॥"

তাঁহাকে সকলেই 'পাগলীমা' বলে,সেই কারণ তিনি আর এক দিন পাগলিনীরূপে গাহিয়া ছিলেন,—

বাউল সুর।

"পাগলে করেছে পাগল, তাই ত আমি পাগল হই।
যে যা বলে বলুক লোকে, আমি জানিনাক পাগল বই॥
পাগলেতে কি গুণ জানে, ওগো সদা কথা কয় গোপনে।
পাগল আমার মাথার ঠাকুর, আমি যে তাঁর নাচের-কুকুর,
তু-করে ডাক্‌লে পরে, অমনি এসে খাড়া হই॥"

লক্ষ্মী-মেয়েটী এখন সাবিত্রীমায়ের নিত্য সাথী, সদাই মায়ের কাছে থাকেন, সেবা-শুশ্রূষা করেন, সময় সময় তাঁহার সেই পাগ-লামীতে মা অত্যন্ত বিরক্তও হন্। সে কারণ মাও অনেক সময় তাঁহাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিলে, তিনি তখন মনের দুঃখে কোথায় পলাইয়া যান, পরে ছুটিয়া আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার ক্রোধ উপশমের জন্য গাহিতে থাকেন—

মা-সুর—একতালা।

"সোনার প্রতিমা আমার প্রাণের সাবিত্রি!
ওমা গোলক ছেড়ে, ভূলোকে এলে,
তরাতে এ ঘোর পাতকী॥
সত্যে ছিলে বেদবতী, ত্রেতাযুগে সীতাসতী,
দ্বাপরেতে লক্ষ্মীরূপা, কলিতে সাবিত্রী॥
শুন মা পাষাণের মেয়ে, আর পাষাণে বেঁধোনা হিয়ে,
কৃপা বারি বরষিয়ে, বাঁচাও এ চাতকী॥"

লক্ষ্মী, বিহারীবাবাকেই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ধ্যান করিতেন, এক দিন তাঁহার সম্মুখে তাই নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়া ছিলেন।

ঠুঁ রী।

"শিব মঙ্গলময়, শিব মঙ্গলময়, শিবজ্ঞানময়,
শিব প্রাণময় হে।
প্রেমময় শিব, সুখময় শিব, শিব শান্তিময়,
শিব কান্তিময় হে॥
ও তোর পরিধানে বাঘ ছালা, গলে দোলে হাড় মালা,
কিবা শোভা পায় হে।
ও তোর কর্ণে ধুতুরার ফুল, আঁখি করে ঢুল্ ঢুল্,
পঞ্চ-বদনে ভোলা (রাম-) বিভু-গুণ গায় রে॥
রাধা-গুণ গায় ভোলা, কৃষ্ণ-গুণ গায় রে,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজায়,
ও যে বামে তোর গিরি বালা, কিবা শোভা পায় রে॥"

শ্রীমতী রামতারা দেবীও বাবার একান্ত অনুগতা ভক্ত ও সেবিকা ছিলেন। তিনি ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরা-মোহন চক্রবর্ত্তীর ভগিনী। এখনও তিনি সাবিত্রীমায়ের সেবায় বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। তিনি ভেলুপুরায় তাঁহার সহোদর শ্রীমান্ বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাটীতেই এখন অবস্থান করেন।

বৈদ্য-মা (হারিণী-মা) ইনি জাতিতে বৈদ্য, ইহাঁর পতির নাম, চন্দ্রকুমার সেন। ঢাকা জেলায় ইহাঁদের বাস ছিল। ইনিও বাবাকে স্তন্য-পান করাইয়া ছিলেন। অনেক মায়েই গঞ্জনার ভয়ে অতি

গোপনে আসিয়া বাবাকে স্তন-পান করাইয়া যাইত। বৈদ্য-মাও সেইরূপ আসিতেন। বাবা তাঁহাকে সধবা দেখিয়া, তাঁহার পতির অনুমতি লইয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীকে না বলিয়া গোপনেই যাইতেন। স্বামী তাহা জানিতে পারিয়া বলেন—"তুমি এরূপ ভাবে আর যেতে পার্‌বে না, আর তোমার ত কখনও সন্তানাদি হয় নাই, তোমার মায়ে দুধ কোথায় যে, বাবাকে মাই-খাওয়াইতে যাও? তা ছাড়া তুমি মাই-দাও লজ্জা করে না?" তিনি তখন বাবার কৃপায় বলেন, "বাবা বলিয়াছেন—আমার মায়ে দুধ আছে কিনা দেখ দেখি? ছেলেকে মাই-দিতে আর কোন মায়ের লজ্জা হয়?" এই বলিয়া তখনই স্তন খুলিয়া একটু টিপ দিতেই পিচকারীর মত দুগ্ধের ধারা তাঁহার স্বামীর গাত্রে গিয়া পড়িল। স্বামী দেখিয়া ত অবাক্। বৈদ্য-মা বলিলেন—"দেখ্‌লে? এই মাইটা আমার ছেলে 'বাবাকে' দেই—নাও এই মাইটা তুমি খাও, বাবা বলিয়াছেন।" চন্দ্রবাবু মাথা নীচু করিয়া রহিলেন।

বাবার প্রথম ভক্ত-মায়েদের মধ্যে দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও দুই ভগিনী, কাশীস্থিত প্রসিদ্ধ কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ৺জয়মিত্রের পুত্রবধূ, মানমন্দিরের কর্ম্মদাসী-মাই প্রভৃতি ও ভুবনেশ্বরী দেবীও বিশেষ উল্লেখযোগ্যা ছিলেন।

শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মও বাবার সে সময়ে একান্ত সেবক ও সদা লীলা-সঙ্গী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধি যেন বিকলতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু গণ্যমান্য সদাশয় ব্যক্তিও তাঁহার সেবকরূপে তাঁহার লীলা-সহচর ছিলেন।

বাবার আর একটী ভক্ত শ্রীমান্ কালীপ্রসন্ন, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে আসিতেন। এক দিন বাবা

তাঁহাকে খুব তাড়া দিয়া বলিলেন—"মেয়েদের মত কেবল পা-ধুয়ান কি তোর কাজ? হাতজোড় করে ঐ খানে বসে থাক—ইত্যাদি।" বাবার তিরস্কারে তিনি ঘাটের ধারে একটা গুহার মধ্যে অনাহারে বসিয়া তাঁহার চরণ-চিন্তা করিতে থাকেন। পাঁচ ছয় দিন পরে, বাবার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসেন, তাহার পর বাবার কৃপায় সুস্থ হন। তখন হইতে তাঁহার আর কোনও বিষয়ে কষ্ট ছিল না। তিনি পরে তাঁহার মাতৃচরণ-দর্শনে চলিয়া যান।

রাম সিংহ নামে তাঁহার আর একটী শিষ্যও যথেষ্ট আত্মোন্নতি করিয়াছিল। সে এক্ষণে কাশীলাভ করিয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাবিত্রীমায়ের বৈরাগ্য ও সাধনকাল।

ইতঃপূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে "কর্ত্তব্যপালন" অংশে শ্রীসাবিত্রী-মায়ের সাংসারিক সকল কর্ত্তব্যেরই অবসান-কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে এখন তীব্র বৈরাগ্য-ধারা প্রবাহিত। আর তাঁহার সংসার-বন্ধনের কিছুই নাই। তিনি এক্ষণে সুদৃঢ়চিত্তে পতি ও শ্রীগুরু-চরণ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, আর তিনি সংসারে থাকিতে পারিলেন না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই, মাঘ মাসে তিনি তাঁহার 'মেজ-জা' শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর সহিত কাশী-ধামে আসিলেন। তখন বসন্তকুমারীর মাতা খালিসপুরায় বাসা লইয়া কাশীবাস করিতেন। তাঁহারই বাসায় তিনি দুই দিবস রহিলেন। সেই সময় বিহারীবাবা অসিঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাঁরা অনুসন্ধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে বসন্তকুমারী বিহারী-বাবাকে দেখিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। বাবা সেই অবিরাম ক্রন্দনে কিছুমাত্রই বিচলিত হইলেন না, তিনি অচল ও অটল ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় নীরবেই বসিয়া রহিলেন। কেবল সমাগত ব্যক্তিদিগকে ইঙ্গিত করিলেন—"ইহাঁকে সরাইয়া লইয়া যাও।" পতির আদর্শে সতী সাবিত্রীও এই ব্যাপারে যেন অচল শিলামূর্ত্তির ন্যায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না, কেবল তাঁহার দর্শন-মাত্রেই তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ভাবে মনে মনে আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শোকাবেগ এখানে তিলমাত্রও প্রকাশ হইল না। পূর্ব্ব হইতেই প্রবল বৈরাগ্য তাঁহার

হৃদয় অধিকার করিয়া, তাঁহাকে এই অন্তিম-আশ্রমের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি মুখে কোন বাক্য প্রকাশ না করিলেও, পতির অন্তরে যেন অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় গুপ্ত-ভাবে সঞ্চালিতা হইয়াছিলেন, উভয়ের চিত্ত-প্রবাহ তখন নিশ্চয়ই এক অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য সাধারণের বুদ্ধির অগম্য, নতুবা সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বস্বত্যাগী পরমহংসপ্রবর বিহারীলালের কৃপাকণা তিনি কখনই লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। এই বৈরাগ্যযুক্ত কঠোরতাই তাঁহাকে এমন পতির চরণ-প্রান্তে শেষে আনিতে পারিয়াছিল।

তিনি কাশীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে এ বার থাকিতে পারিলেন না। যে কয় দিন ছিলেন, কেবল পতি-দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিতেন, কোন কথাই বলিতেন না। কয়েকদিন পরে তিনি তাঁহার সেই জায়ের সহিত তীর্থদর্শনে যাইতে বাধ্য হইলেন। মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল ও অযোধ্যাদি তীর্থ পরিদর্শন করিতে তাঁহাদের মাঘ ও ফাল্গুন মাস অতীত হইল, চৈত্র মাসে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পুরী-জগন্নাথধামে অতিবাহিত করিয়া, শ্রাবণ মাসে পুনরায় দেশে আসিয়া পুত্রের বাৎসরিক-কার্য্য সমাধা করিলেন।

অনন্তর ইং ১৯০৯ সালে বাঙ্গালা ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া 'কাশীবাস' করিবার জন্য নিজ জায়ের সহিত পুনরায় আসিলেন ও গোধৌলিয়ায় একটী বাসা করিয়া তথায় রহিলেন।

এই সময় বিহারীবাবা বিদ্যাময়ীর বাড়ীতে থাকিতেন, পরে তিনি পুনরায় দশাশ্বমেধে আসেন। এই বার সাবিত্রীমা তাঁহাকে

প্রণাম করিতে আসিলে, বাবা তাঁহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিলেন ও ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, "এখানে আমাকে আর বিরক্ত করিতে আসিও না।" তাঁহার এই অসন্তুষ্টির কারণ সাবিত্রীমা একেবারে স্তম্ভিতা ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, ফলে তাহার সম্মুখে যাইয়া প্রণাম পর্য্যন্ত করিতেও তাঁহার আর সাহস হইল না। অগত্যা পাণ্ডাদের দ্বারা বার বার তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়া কেবল কাশীতে থাকিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহাতে বাবা কোনরূপ অমত না করিয়া যখন থাকিবার আদেশ প্রদান করিলেন, তখন তিনি মনে মনে যেন একটু বল পাইলেন বটে, কিন্তু তথাপি এক দিনও প্রণাম করিবার জন্য সম্মুখে যাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি তখন যেন পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। এ দিকে তাঁহার 'মেজ-জা' বসন্তকুমারী দেবী তাঁহাকে সেই অবস্থায় কাশীতে আনিয়াছেন বলিয়া ও বিহারীবাবার কোনরূপ সহানুভূতি নাই দেখিয়া, তাঁহার প্রতি অধিকতর ভাবে অনাদর করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দিয়াই ঠিক যেন দাসীর ন্যায় সকল কাজ করাইতে আরম্ভ করিলেন। সুধা, মায়ের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন ও বাবার নিকটে সকল কথা বলিলেন, তদুত্তরে বাবা বলিলেন—"তাহার প্রারব্ধ।" যাহা হউক সুধা বার বার অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে যত্ন করিবার আদেশ গ্রহণ করিলেন। তখন দেবনাথপুরার শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য (বাবার এক জন অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট ভক্ত) দিন স্থির করিয়া দিলে, তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থিত সুধার বাসাতেই মা যাইলেন। তথায় মাহেশ্বরী নিত্য আসিয়া অন্নাদি রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। সেই কথা শুনিয়া বাবা সুধাকে বলেন—"কেন ভাত না খাইয়া কি থাকিতে পারিবে

না?" সুধা তাহাতে আপত্তি করিলে, তিনি তাঁহাকে খুবই তিরস্কার করেন। এমন কি সুধাকেও দুই তিন মাস নিকটে আসিতে দেন নাই। অনেক অনুরোধের পর কেবল প্রণামমাত্র করিবার অনুমতি দেন। তাহার পর তিনি কেদার-পাণ্ডাকে দিয়া সাবিত্রীমাকে ডাকেন। সুধার সহিত অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, দূর হইতেই বলেন—"ছেলে কোথায়?" তিনি উত্তরে ধীরে ধীরে বলেন—"মরে গেছে"। তখন হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন—"যার ছেলে মরে, সে কি কথা কয়?" ও সব চালাকি, আনন্দ কিসের?" এই বলিয়া সংসারের সব কথা ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবিত্রীমা ধীরে ধীরে সকল কথার যথাযথ উত্তর দিলে, তিনি সব শুনিয়া বলিলেন - "আবার বাড়ী যাবে কি না?" উত্তর—'না'। প্রশ্ন—"আমি যা' বলি, সে সব কথা শুন্‌তে পার্‌বে? এখন থেকে সেই ভাবে থাক্‌তে পার্‌বে?" উত্তর—"হাঁ পার্‌বো।" তখন বাবা বলিলেন—"বেশ, রোজ এসো না, যখন ডাকিব, তখনই আসিও।" তাহার পর সাবিত্রীমাকে অনেক উপদেশ দিলেন।

অনন্তর এক দিবস তিনি সাবিত্রীমাকে বলিলেন—"অন্ন ছাড়িয়া কেবল ফল-মূল আর দুধ-মিষ্টান্নের উপরেই তোমাকে নির্ভর করিতে হইবে, পারিবে?" উত্তরে মা বলিলেন—"কেন পার্‌বো না।" আবার এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক সন্ধ্যা মাত্র আহার করিতে হইবে, অযাচিত ভিক্ষার উপর জীবন-রক্ষা করিতে হইবে। সংসারের দিকে আর মমতা রাখিতে পারিবে না, সকল বাসনাই ত্যাগ করিতে হইবে। কেমন, এ সব করিতে পারিবে?" মা উত্তরে বলিলেন—"অবশ্যই পারিব।"

বাবা ইহার পর এক দিবস তাঁহার মনের ভাব জানিবার জন্য ছলনা করিয়া বলিলেন—"দেখ তুমি নিরাশ হইও না, সন্ন্যাসী হইলে যে, স্ত্রী-ত্যাগ করিতে হয়, সকল জায়গায় তাহা দেখা যায় না—কত মুনি ঋষি স্ত্রী লইয়াও ঘরকন্না করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। এই ভাবে তাঁহার মনের ইচ্ছা কি, জানিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সাবিত্রীমা কোন দিনই সে ভাবের বাসনা প্রকাশ করেন নাই। মন্দির-পার্শ্বে তাঁহার নিকট নির্জ্জনে বসিয়াও, কেবল সাধন-ভজনের কথা, এই উন্নত সন্ন্যাস-আশ্রমের কথা এবং নিজ সন্দেহসমূহ দূর করিবার জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা ও সাধনা-বিষয়ক প্রশ্নই করিতেন। কোনও বাজে কথা কখনই বলিতেন না। তিনি সদাই দীনভাবে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিতেন।

ইহার পূর্ব্বে তাঁহার জা' বসন্তকুমারীর নিকট থাকিবার সময় তাঁহার খুবই কষ্ট হইয়াছিল। সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পতির আদেশ-ক্রমে তিনি সুধার বাসায় থাকিবার সময়, এক কাপড় ও এক খানি চাদরমাত্র নিজের জন্য রাখিয়া, তাঁহার সমস্ত আসবাবপত্র তাঁহার সেই জা'কে দিয়া আসিলেন। এমন কি তাঁহার খরচের জন্য মাসিক যে, দশটী করিয়া টাকা আসিত, জায়ের নিকট তাহাও ধরিয়া দিলেন। ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে—বলিতেন—"গরমের জন্য বড় কাপড় পরিতে কষ্ট হয়, তাই ছেঁড়া-ফেঁড়া যা'হউক পরে থাকি!"

বিহারীবাবা, সাবিত্রীমাকে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা আসিতে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলেন,—কেন করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন, কিন্তু অনেকে সে সময় মনে করিয়াছিল যে, হয় ত লোকে মনে

করিবে, বাবাজী এখনও স্ত্রীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয়—লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহাকে সদাই দূরে রাখিতেন। যদিও তাঁহার নিকট কাশীর প্রায় সকল মহিলাই অবারিত ভাবে যাইতে পারিত, তথাপি তাঁহার সহধর্ম্মিনীর যাওয়া নিষেধ হইবার অন্য কি কারণ হইতে পারে? যাহা হউক এই অবস্থায় থাকিয়া পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মনে ক্রমে যেন অসহনীয় কষ্ট হইতে লাগিল। এক দিন তিনি মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, যেন 'মরিয়া' হইয়া, তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখ-ক্রোধের সহিত তাঁহাকে কিছু তীব্র-ভাষায় অযথা ও অকথ্য-কথা বলিয়া ফেলিলেন। তখন কিছুদূরে কয়েকজন পাণ্ডা বসিয়াছিল, তাহারা এই ঘটনায় বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া সাবিত্রীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিল, এমন কি তাঁহাকে তাহারা প্রহার করিয়া, তথা হইতে দূর করিয়া দিবার জন্যও উদ্যত হইল। তিনি তখন নীরবে আরও দৃঢ় ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, যেন তাহাদের দ্বারা প্রহার-খাইবার জন্যই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"দেখি, অদৃষ্টের আরও কি ভোগ আছে, ইহাও খণ্ডন হইয়া যাক্! উহাদেরও বাসনা পূর্ণ হউক!"

বাবা অবিচলিত ভাবে সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন—এক্ষণে তাঁহার দিকে যেন একটুমাত্র করুণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন; তাহাতে পাণ্ডাদের ভাব যেন কিছু বদলাইয়া যাইল। সাবিত্রীমাকে তখন সকলে ঠিক চিনিত না, যাহারা তাঁহাকে জানিত, তাহারা পাণ্ডাদের বলিল—"তোমরা কাহার সহিত অমন কথা বলিতেছ? উনি যে আমাদের 'মাতাজী'! ইত্যাদি" বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলে, তাহারা লজ্জায় যেন ম্রিয়মাণ হইয়া গেল ও অতি কাতরতার সহিত

তাঁহার পায়ে পড়িয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বাবার নিকটেও বলিতে লাগিল—"গুরুবাবা! কি করিলাম, কি হইবে?" এইরূপ বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল ও বার বার ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল।

সাবিত্রীমা তখন হাসিয়া পাণ্ডাদের বলিলেন—"এতে আর কি হয়েছে বাবা! তোমরা স্থির হও। তোমরা ঠিকই করেছিলে, ওঁর প্রতি কেহ এরূপ আচরণ করিলে, তোমরা সন্তান—তোমাদের ত কষ্ট হইবারই কথা! আর যদি তোমরা আমাকে ধরিয়া দু'ঘা মারিতেই, তাতেই বা কি হইত? যাক্—যা' হবার হয়ে গেছে, এখন তোমরা শান্ত হও। তোমরা সন্তান, লজ্জিত হইও না, উঠ।"

যাহা হউক বাবা তাঁহাকে এইভাবে প্রথম প্রথম নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

সাবিত্রীমা চিরকাল বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত করায়, সহসা এতটা ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা বোধ হয় সহ্য হইবে না, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, বিশেষ মাথার 'বালিসটী'ও না থাকিলে, নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে, এই ভাবিয়া পতির নিকট একটীমাত্র বালিস রাখিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাঁহার মন্দিরের তলদেশ বা বসিবার সেই 'পাটাখানি' নিজের হাত-দিয়া বেশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বলিলেন—"আমার বালিসের চেয়ে এই আসনে বড় আরাম হয়, বেশ সুনিদ্রাও হয়।" তিনি শুনিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন ও মনে মনে ভাবিলেন—"যাঁহার বিলাসিতার প্রসাদমাত্র লইয়া আমি এত দিন বিলাস-ভোগ করিতেছি, তাঁহারই

চিরদাসী হইয়াও, আমি একটী বালিসের জন্য আজ কি না বৃথা চিন্তা করিতেছি, ছিঃ!"

ইহার পর হইতে যখন যখন তিনি দর্শন করিতে আসিতেন, তখন তখনই বাবা তাঁহাকে লিখিয়া অনেক উপদেশ দিতেন। তাহাতে নিত্য-কর্ম্মের নিম্নলিখিতরূপ সময়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া ছিলেন।

ভোর ৫টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সাধনাদি কার্য্য, তাহার পর দুই ঘণ্টা বিশ্রামান্তে পুনরায় প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত নিত্য কাজকর্ম্ম করিয়া, কিছুক্ষণ বেশ বিশ্রামান্তে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত, সাধনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

এক দিন 'পাঁচপুকুরের যাত্রা' উপলক্ষে, তাঁহার উক্তরূপ সাধনার অভাব হইলে, বাবা যেন স্বপ্নে তাহা জানিতে পারেন ও নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান ও সাধনাদির কথা জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েদের সঙ্গে এ খানে সে খানে একটু বেড়াইতে যাইবার কথাও হয়। সাবিত্রীমায়ের পায়ে আজ সামান্য বেদনা হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া তিনি এই বারে স্পষ্ট বলিয়া ফেলিলেন—"কেন, পাঁচপুকুর যাইলে, পায়ের বেদনা কমে না? আমি বেশ ঔষধ শিখিলাম। যাক্, কাল থেকে এই গঙ্গার ধারে, ঐ শীতলাঘাটে বসিও।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"একা ও খানে কি করিয়া থাকিব? আর পাণ্ডাদের মধ্যেই বা কেমন করিয়া থাকিব?" বাবা বলিলেন—"আমি ত তাদের ভালই চিনি ইত্যাদি।"

আর এক দিন বাবা, তাঁহাকে সহিষ্ণু করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—"এ আশ্রম বড়ই কঠিন—আর কোনরূপ বিলাসিতা

চলিবে না, সম্পূর্ণ ভিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভিক্ষা কেবল দিনে এক বার বারটার সময়ই করিতে পারিবে।" তিনি তাহাতেই সম্মতা হইলেন, ভাবিলেন—সে সময় ও খানে আর কেহই প্রায় থাকে না, সুতরাং তিনি প্রকারান্তরে জানাইলেন যে,—"আমি পতির ভিক্ষাই পাইব, বিশ্বনাথের রাজ্যে অন্নপূর্ণাই চিরদিন ভিক্ষা দিতেছেন, এখন আবার শিবই ভিক্ষা দিবেন—তাহাই লইব!" বাবা এই কথা শুনিয়া, যেন মনে মনে একটু হাসিলেন ও একটু লজ্জিতও হইলেন।

ইহার পর সুধা ও মাহেশ্বরী, বাবাকে বলিয়া পাণ্ডাদের বাড়ীতে তাঁহাকে আনিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের বাহিরের বাটীতে উপরের অংশে দুই শত টাকা খরচ দিয়া একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উহার জন্য সুধামাইর দাদা এক শত টাকা ও শ্রীমতী রামতারাদেবী এক শত টাকা দিলেন। তখন হইতে সাবিত্রীমাকে লইয়া সুধামা ও মাহেশ্বরীমা উভয়েই তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সুধা পূর্ব্ব হইতেই সাধু-ব্রহ্মচারিণীরূপে বাবার সেবা করিতেন, এক্ষণে মায়ের নিকট থাকিয়া তাঁহারও প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। মাকে কোন কাজ করিতে বা তাঁহার কোন অভাব তাঁহাকে জানিতে দিতেন না, সমস্তই নিজ হাতে সম্পন্ন করিতেন। সুধা বেশ শিক্ষিতা ও ধর্ম্ম-বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই কারণ তিনি বাবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। এক্ষণে মায়ের সঙ্গেও তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইল। মাকে নিজের কাছে লইয়াই শয়ন করিতেন। মাও সুধার সেবা ও ভক্তিতে তাহাকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

এক দিবস বাবার নিকট মায়ের সাধনা-বিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা উপলক্ষে, 'সঙ্গত্যাগের' কথাও হইতেছিল, মায়ের মুখ দিয়া তখন যেন দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, "তিনি সুধার সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এমন কি—তাঁহার (বিহারীবাবার) সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে থাকাও সম্ভব, কিন্তু সুধার সঙ্গ ছাড়া যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।"

বাবা ঈষৎ হাসিয়া জানাইলেন যে—"আমি এমনই কাঁটা দিব, যাহাতে তোমাদের সকল পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।" দৈবচক্র প্রায় সকলেরই অনধিগম্য! বাস্তবিক বাবার দেহ-লীলার অবসানের পরই কতকগুলি লৌকিক ঘটনাচক্রে তাঁহারা পরস্পরেই পৃথক হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক এক্ষণে সাবিত্রীমা সুধার সঙ্গেই রহিলেন। সকলে বেশ আনন্দে আপন আপন সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া, ধর্ম্মালোচনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ফাল্গুন মাসে তাঁহার জা' বসন্তকুমারী দেশে যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাবার অনুমতি চাহিলে, বাবা তদুত্তরে এই রূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন যে,—"উহার বাড়ীতে আর কি আছে, কিসের জন্যই বা তোমার সঙ্গে যাইবে?" বসন্তকুমারী মা বলিলেন—"আমার সেবার জন্যই উহাকে লইয়া যাইতে চাহি।" এ কথার আর কোনও উত্তর তিনি দিলেন না। ফলে সাবিত্রীমার আর যাওয়াও হইল না। বসন্তমা তাহাতে কিছু অসন্তুষ্টা হইয়াই সেবার চলিয়া গেলেন। কিন্তু বৈশাখ মাসে পুনরায় তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বাবার পূর্ব্বাশ্রমের 'মাসতুত-ভাই' ও বাল্যবন্ধু রাসমোহনবাবুকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাবা তখন

'অসি'তে ছিলেন। রাসমোহনবাবু তাঁহার নিকটে এই প্রস্তাব করাতে, তিনি পাথরের উপর জলের দ্বারা লিখিয়া নিম্নলিখিতরূপ উত্তর দিলেন—

"উহার বাপ, মা, ভাই, বোন্, ছেলে, মেয়ে কেউ নাই, কেবল কি উহাদের ভাত রাঁধিতে যাইবে? অনেক কাল সে ত ও সব কাজ করিয়াছে!" রাসমোহন বলিলেন যে,—"তবে উহার খরচ কেহই দেবে না।" তিনি জানাইলেন—"উহার কি কিছুই নাই? একেবারেই কি ও পথের ভিখারী? বেশ, ভিক্ষা করিয়াই খাইবে, কাহারও কিছু দিতে হইবে না!" ইত্যাদি অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সেই সময় বাবার একটী অন্তরঙ্গ ভক্ত কন্যা ও সেবিকা অন্তরাল হইতে এই সকল কথা শুনিয়া ও বাবার লেখা পড়িয়া সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন ও অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা সাবিত্রীমাকে গোপনে বলিয়া যাইলেন। তিনি শুনিয়া উদ্দেশে পতি-পদে প্রণাম করিলেন ও মনে মনে নিজ কল্যাণকর ব্যবস্থার কথা জানিতে পারিয়া, অতীব আনন্দিতা হইলেন এবং অন্তরে যেন অধিকতর বল সঞ্চয় করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাসমোহনবাবু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন ও মিথ্যা করিয়া বলিলেন—"দাদা আপনার উপর রাগ করিতেছেন ও আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন।" তিনি পূর্ব্বাহ্নের প্রকৃত কথা জানিতে পারায়, ইহাঁর উত্তরে একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আমার একটুও বিশ্বাস হয় না! বেশ, 'উনি' আমার কাছে এসে বলুন। আর, আমি উহাঁর ভাতে না কাপড়ে? আমার কেউ নেই, এক 'উনি'—তাও সন্ন্যাসী! আমি ভিক্ষা করে খাব, আমার আর লজ্জা-সরম কি?" ইত্যাদি।

এইরূপে নানা কথাবার্ত্তার পর অগত্যা রাসমোহনবাবু চলিয়া গেলেন।

ইহার আরও কিছু দিন পরে বিবারীবাবা এক দিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, এক দিন তুমি সন্তানের মায়াতে আবদ্ধ ছিলে, আমার সঙ্গে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু সেই মোহে তখন তুমি আসিতে পার নাই, আমার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা মত মেজ-বৌয়ের হাতে ছেলেটীকে দিতেও পার নাই। সেই জন্য তোমার ছেলেটী না মরিলে, তোমার গতি হইবে না বলিয়া তাহা তখন স্পষ্ট করিয়াই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, দেখিতেছি—তোমার আরও একটী বন্ধন আছে, সেটী তোমার ভাসুরের ছেলে—'গোপাল'; সেও না থাকিলে, তোমার পক্ষে ভাল হয়।" সাবিত্রীমা বলিলেন—"তাহার জন্য আমার আর বন্ধন কি? সে আমাকে কোনরূপে ত বিরক্ত করে না, এমন কি কখনও একখানা পত্রও লেখে না।" বাবাজী তাহার উত্তরে বলিলেন—"পরে বুঝিতে পারিবে।"

তাঁহার সিদ্ধ-বাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে। সন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, —মাঘ মাসে, তাঁহার 'দেহত্যাগ' হইবার ঠিক চারি দিন পরেই, গোপাল এবং তাঁহার জায়ের প্রেরিত লোক কাশীতে আসিয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য পীড়া পীড়ি করিতে থাকেন। গোপাল বলিল—"আপনাকে এ বারে যাইতেই হইবে, এত দিন কাকা (বিহারীবাবা) ছিলেন, আপনি তাঁহার আশ্রয়ে এখানে থাকিতেন, তাহাতে কোন কথা ছিল না; এখন আর আপনি এরূপ ভাবে এ খানে একা থাকিতে পারেন না, আপনাকে যাইতেই হইবে।" কিন্তু তিনি কোনরূপে যাইতে রাজী হইলেন না।

তখন গোপাল পুনরায় বলিল—"আপনি বাঁচুন্ আর মরুন্, আমি এ বার নিজে আসিয়াছি, অন্য কোন লোক পাঠাই নাই, সুতরাং আমরা যে কোন প্রকারে পারি, আপনাকে বাঁধিয়াও দেশে লইয়া যাইব।" অবশেষে যথার্থই তাহারা মায়ের মুখ বাঁধিয়া পাতালি-কোলা করিয়া, তাঁহাকে গাড়ির মধ্যে তুলিল। তাহাতে ধস্তাধস্তি করাতে তাঁহার হাত পা কপাল কাটিয়া গেল, মুখ বাঁধা থাকায়, চীৎ-কার করিয়া বা কোন কথাই তিনি বলিতে পারিলেন না। তথাপি এ ব্যাপারে তাঁহার বাসায় ও পথে লোক জমিয়া গেল, ব্যাপার খানা যে কি, তাহা কেহই কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারিল না, সকলেই যেন অবাক্ হইয়া কি এক রঙ্গ দেখিতে লাগিল। মা গাড়ীর মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কাশীর ষ্টেসনে ও রেল-গাড়ীতে উঠিয়াও তাঁহার চৈতন্য হইল না। গোপাল অবশ্য অতি সাবধানেই তাঁহাকে গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া ছিল। মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ী আসিলে, তাঁহার এক বার সামান্যমাত্র চৈতন্য হইয়া-ছিল। যাহা হউক কোনরূপে তাহারা দেশের বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া গেল।

তিনি বাড়ীতে পৌঁছিয়া কিছুতেই থাকিতে সম্মতা হইলেন না, কোনরূপে বারটী দিন কেবল পুষ্করিণীতে স্নান করিবার সময় পেট ভরিয়া জল মাত্র পান করিয়াই যথা তথায় পড়িয়া রহিলেন। পাগলের মত যেখানে সেখানে, যার তার নিকট ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। এই রূপ ব্যাপার দেখিয়া বাড়ীর সব লোক জন ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, পাছে তিনি আত্মঘাতী হন, এই ভাবিয়া শ্রীমান্ গোপাল তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র-সম্পর্কীয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পুনরায় কাশীতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

বাবা,দেহত্যাগ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে সাবিত্রীমায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ প্রদান-উপলক্ষে তিনি নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। সাবিত্রীমাও তখন অকপটে নিজ সকলভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপদেশসমূহ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

উক্ত ঘটনার ঠিক দুই বৎসর পরে—ইং ১৯১৪ অব্দে, পুনরায় তাঁহার দেবর নীলরতনবাবু তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য এক বার কাশীতে আসিলেন ও পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে এত দিন সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিলেও, আজ নিতান্ত হেয় ভাবে অযথা কটু ভাষায় তাঁহার গ্লানি করিতেও, কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার নানা বৃথা কলঙ্ক রটাইয়া,তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতেও, বিচলিত হইলেন না। সাবিত্রীমা তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইলেন ও নয়নজলে নিজ বক্ষঃ ভাসাইয়া বলিলেন—"দেখ, আমি পতিচরণ-অনুসরণ করে, তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই উপদেশে সংসার ছেড়েছি, এখন আমি সন্ন্যাসিনী হই, কি বিলাসিনী হই, সে আমার ভাগ্যের কথা! কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনও সম্বন্ধ কি বন্ধন কিছুই নেই, আমাকে তোমরা আর কোন রকমেই বাধা দিতে পার না, আমার ঘরে ফিরে যাওয়া আর কখনও সম্ভব নয়। সতীত্বের পরিচয় 'তিনিই' গ্রহণ করবেন।" ইত্যাদি তাঁহার দৃঢ়বাক্য শুনিয়া নীলরতনবাবু অগত্যা অবনত মস্তকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

এই সকল অশান্তিপ্রদ ও মর্ম্মান্তিক ঘটনা সম্বন্ধে কেহ কেহ সাবিত্রীমাকে তাঁহার মনের কথা এখনও জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন—"দেখ, সুখ-দুঃখ কিছুই নয়, সমস্তই মনের খেল, যদি কেহ

মনটাকে শরীর হইতে আলাদা করতে পারে, তা হলে আর তার কোন কষ্টই থাকে না—যতক্ষণ মন শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে আবদ্ধ থাকে, তত ক্ষণই জীবের কষ্টের সময়। মন যত ক্ষণ সেই কষ্টের কথা চিন্তা করে, ততক্ষণই কষ্ট পায়, কিন্তু যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন আর কোন কষ্টই তার অনুভব হয় না। আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, সেই সব কথা মনে আসিলে, ফের কষ্ট অনুভব হতে থাকে। মনকে শরীর থেকে ক্রমে ক্রমে আলাদা করতে অভ্যাস করাই শান্তির উপায়।"

"বাস্তবিক এই সংসার ভারি প্রলোভনের স্থান; এ কথা সবাই বলে,সবাই জানেও, কিন্তু এ থেকে জেনে-শুনেও কেউ যে বাঁচ্‌তে চায় না, এইটীই আশ্চর্য্য! এই সংসারের স্বরূপ—ঠিক যেন একটী সুন্দর, সুদৃশ্য ও সুগোল পাকা-লঙ্কা!" সুপুষ্ট হইলেও, ভিতরে তিল-পরিমাণও তাহাতে শাঁস নাই, কেবল খোসা ও বীচি সার। অন্যান্য আহার্য্য-বস্তুর সহিত কেবল সামান্য মুখ-রোচক-মাত্র, কিন্তু লঙ্কা যত খাও বা চিবাও, ততই ক্রমে জীবের গোটা-লাল ভাঙ্গে, আর নাকে চখে জলে ভরে যায়, শেষে ভিতর বাহিরের অবিরত জ্বালায় কেবল 'হা' 'হু' করেই মর্‌তে হয়।"

যাহা হউক সাবিত্রীমাকে বিহারীবাবা নানারূপে সন্ন্যাসিনী-ভাবের উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লজ্জা, ভয়, শোক, দুঃখ ও বিষয়ে আসক্তি আছে কি না এবং সে বিষয়ে কতটাই বা তিনি উপযোগিনী হইতে পারিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্যও বাবা সময় সময় অতি গোপনে তাঁহার কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিতেন—দেখিতেন, তিনি কাহাদের সহিত কি ভাবে বার্ত্তালাপ ও কোন্ বিষয়েরই বা আলোচনা করিতেছেন। কখনও বা অন্যান্য মেয়েদের

সম্মুখে নানাপ্রকার সংসার-বন্ধনের ও বিলাসিতার ভাবের ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার মনোভাব পরীক্ষা করিতেন। যখন বাবাজী দেখি-লেন যে, তিনি এই ভাবে বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন,তখনই তাঁহাকে ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী ভাবে যথার্থ সহধর্ম্মিণী মনে করিলেন ও তাঁহার প্রতি করুণা পরবশ হইলেন। সাবিত্রীমাও পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত অশেষ পুণ্যবলে তখন হইতে আত্মোন্নতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিহারীবাবার প্রথমা-পত্নী শ্রীমতী দক্ষিণামায়ের মধ্যে এইরূপ উন্নত ভাবের ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ও সাধন-প্রতিভা যে ছিল না, তাহা বাবাজী পূর্ব্ব হইতেই নানারূপে পরিজ্ঞাত হইয়া-ছিলেন। সেই কারণ তিনি সাধারণ গৃহস্থ ভাবেই তাঁহার সারা-জীবনখানি অতিবাহিত করিলেন।

সাবিত্রীমায়ের অতি পবিত্র বিরাট মাতৃত্বের অপূর্ব্ব স্নেহ-ভাব যেন কি দৈবীবলে অনায়াসে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। তখন কাশীর স্ত্রী-পুরুষ ভক্তবৃন্দ তাঁহারও সেবার ও শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে এখন কেহ 'সাধুমা,' কেহবা 'মা' বা 'মাজী' ও 'মাতাজী' বলিয়াই নিজ নিজ ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তিনিও যেন মহামায়ার ন্যায়ই একাধারে কঠোর ও করুণাময়ী। সময় সময় তাঁহার নিকট স্নেহ-তিরস্কারও অনেককে ভোগ করিতে হয়। তিনি অপরাধের শাসনও যথেষ্ট করিতে পারেন, এ ভাবটী তাঁহার যেন জন্মার্জ্জিত। বাস্তবিক তাঁহার এই মাতৃভাব অসা-ধারণ ও অপূর্ব্ব।

তিনি পতির নিকট সন্ন্যাসোপযোগী ত্যাগ বেশ ভালরূপেই শিক্ষা করিয়াছেন। 'অগ্নি' ও 'অর্থ' (ধন)-ত্যাগ যে, সন্ন্যাসী-দিগের পক্ষে কেন এতাধিক প্রয়োজনীয়, তাহা অনেকে সহজ

ভাবেও বুঝিতে পারে না। হাতে পয়সা-কড়ি থাকিলে, অনেক সময় তাহার অভিমান হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত তদ্বারা যে কোনও অভিলষিত ভোগের বস্তু, বিলাস ও ব্যসনের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে সহজেই ইচ্ছা হয়, নিত্য ভোগ্য-বস্তুতেও ভাল-মন্দের বিচার যেন অলক্ষ্যেই আসিয়া পড়ে, তাহার ক্ষয়-বৃদ্ধির প্রতিও সদাই লক্ষ্য থাকে, তাহা রক্ষা-কল্পে অনেক সময় মন ভীত ও চঞ্চল হয়। 'অর্থ' যে অনেক 'অনর্থের'ই মূল এবং তাহা যে, সকলের পক্ষে সর্ব্বদা সৎকার্য্যের সহায়কও হয় না, তাহা সর্ব্বত্রই সতত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বাস্তবিক কয়জনেই বা অর্থ পাইয়া,তাহার যথার্থ সৎব্যবহার করিতে পারে? কয় জন তাহা গুরু-দেবতার উদ্দেশে ব্যয় করিতে সমর্থ হয়, কয় জনই বা তাহা অতিথি-অভ্যাগতের সেবা বা দীন-দরিদ্রের অভাব মোচনে সার্থকতা মনে করে। যদিও বা কেহ সেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হয়, হয় ত তাহাতে তাহার অলক্ষ্যে আত্মাভিমান বর্দ্ধিত হয়, সেখানে অন্তরেরও অন্তস্থলে কি.যেন এক আনন্দের বা আত্মশ্লাঘার ভাব উদিত হইয়া, তাহার 'কর্ম্ম-বন্ধন' বৃদ্ধি করে। "প্রকৃত দাস-ভাবে, প্রভুর গচ্ছিত ধনের উপর নিজের স্বামিত্ব-স্থাপন না করিয়া, তাঁহারই অনুরাদেশে অর্থের যথাযথ ব্যয় করিতেছি"—এই ভাব কয় জনের অন্তরে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়? সেই কারণ 'ত্যাগের' সাধনায় প্রথম প্রথম বা আদৌ 'অর্থ' স্পর্শ না করাই ভাল বলিয়া গুরুমণ্ডলীর দৃঢ়-আদেশ। সুতরাং মুমুক্ষু বা সন্ন্যাসীর পক্ষে বৃথা মনের বিবিধ সঙ্কল্প-বৃদ্ধিকর অর্থ বহু-অনর্থের কারণ বলিয়া ত্যাগ করাই ভাল। তবে বর্ত্তমান সময়ে কাল-ধর্ম্মের বশে আত্ম-রক্ষার্থে কিছু কিছু অর্থের সময় সময় প্রয়োজনও হইয়া থাকে। তাহা অবশ্য কেবল প্রয়োজনমাত্রেই অতি সাবধানে

ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। "তাঁহার" প্রকৃত দাস-ভাবে, 'তাঁহারই' যেন গচ্ছিত ধন বোধে, তাহা রক্ষা করা ও যথার্থরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে গোপনে অন্তরের মধ্যে যেন আদৌ 'সঞ্চয়-বুদ্ধি' না আসে।

এই ভাবে **অগ্নি-স্পর্শও** সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, কারণ সাধারণতঃ অগ্নি এক্ষণে কেবল পাক কার্য্যেই প্রয়োজন হয়; কিন্তু প্রাচীন কালে এই 'অগ্নি'ই ঋষি-মুনি আদি প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিত্য-আরাধ্য ও হোম-যজ্ঞাদি নিত্য-কার্য্যের জন্য অপরিত্যজ্য-বস্তুরূপে পরিগণিত ছিল। সকলকেই তখন সাগ্নিক-ব্রাহ্মণরূপে তাঁহাদের উপনয়নের পর হইতে অবিচ্ছেদে 'অগ্নি-রক্ষা' করিতে হইত, পরে পূর্ব্বকথিত ভাবে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়, তাহাতেই 'বিরজাযজ্ঞ' করিয়া অগ্নি-বিসর্জ্জন করিতে হইত। এখন ব্রাহ্মণমাত্রের আর সেই পবিত্র প্রাচীন প্রথা অনুসারে অগ্নি-রক্ষার বিধান নাই, সুতরাং কেবল প্রয়োজন মত নবীন 'অগ্নি-স্থাপন' করিয়াই প্রায় সকলে যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া থাকেন। সেকালে সকল ব্রাহ্মণই উপনয়ান্তে সেই রক্ষিত অগ্নিতে নিত্য হবনাদি সম্পন্ন করিতেন ও তাহাতেই যে কোন আহার্য্য-বস্তু পাক করিয়া —গুরু, দেবতা, অতিথি ও অভ্যাগতদিগের সেবা করণান্তর নিজে তাহাই ইষ্ট-গুরুর প্রসাদ ভাবিয়া ভোজন করিতেন। তখন তাঁহারা কেবলমাত্র নিজের রুচি বা রসনাতৃপ্তি ও দেহ-রক্ষার্থ রন্ধন করা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন—এখন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। কেবল নিজেরই রুচি ও উদরপূরণ করিবার জন্য অধুনা কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি সাধু, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী, সকলেই যেন ব্যতিব্যস্ত! কাহারই সংযম

বা ত্যাগের লেশমাত্রও নাই। যাহা হউক ত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে যে, 'অগ্নিত্যাগ' বিধি বা 'অগ্নিস্পর্শ নিষিদ্ধ' তাহার প্রধান কারণ —আর নিজের জিহ্বা ও উদর পরিতৃপ্তির জন্য, অথবা কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার উপলক্ষে অগ্নি-সংগ্রহ বা তাহার স্থাপনার্থে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে না। তৎপরিবর্ত্তে অযাচিত-লব্ধ বা যথাবিধি যাচ্ঞা-লব্ধ ভিক্ষান্নেই পরিতুষ্ট হইয়া কেবল নিজ প্রারব্ধ-কাল ক্ষয়-মাত্রই করিতে হইবে। আর ভোগের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া, ভোজনের বিলাসিতার প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, এখন হইতে কেবল সাধনভজনেই কাল কাটাইতে হইবে। সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষে অগ্নি স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তবে দেশ-কাল-প্রভাবে, আত্ম-রক্ষাকল্পে কখন কখনও নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায়, "আতুরে নিয়ম নাস্তি"—এই বিধি অনুসারে কোন ভোজন প্রস্তুতের জন্য অথবা অসহ্য শীত নিবারণের পক্ষে অগ্নি স্পর্শ করা যাইতে পারে। ফলতঃ যাহাতে কি গৃহস্থ, কি সাধু, নিজেদের জিহ্বার পরিতৃপ্তি-কামনায়, নিত্য নব নব আহার্য্য প্রস্তুতের ইচ্ছা না হয়, সে বিষয়েই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অপরিত্যজ্য কোন প্রয়োজন অনুসারে অগ্নি স্পর্শ করিতে দোষ নাই। এই কারণেই আমাদের বিহারী-বাবা সাবিত্রীমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মোপযোগী 'অর্থ' ও 'অগ্নি' স্পর্শ-বিষয়েও যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত **নানাবিধ গ্রন্থপাঠ** সম্বন্ধে সাবিত্রীমায়ের প্রতি তাঁহার এই উপদেশ ছিল যে, বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সাধকের পাঠ-করা উচিত নহে, তাহাতে তাহার বৃথা মতিভ্রমই হইয়া থাকে। গুরুর উপদেশ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট-গ্রন্থাদি পাঠ করাই সকলের কর্ত্তব্য। তিনি নিজেও শ্রীগুরুর উপদেশ ক্রমে আর কোন

গ্রন্থাদিই পাঠ করিতেন না, পরমহংস অবস্থায় শ্রীমান্ কামিনীবাবুর প্রদত্ত একখানি গীতা এক বার মাত্র দেখিয়া আবার ফিরৎ দিয়াছিলেন। তিনি সাবিত্রীমাকে এই মাত্র উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সময় মত গীতাদি নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ ভক্তিভাবে পাঠ করিলেই হইবে। যা' তা' গ্রন্থ আর পড়িবার প্রয়োজন নাই। সৎসঙ্গ, তর্কবিহীন ধর্ম্মালোচনা, সদাচার ও অবিরত সদ্‌গুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধনাদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহাই প্রত্যেকের সারা-জীবনের সার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

নর ও নারীর সাধারণ সাধনার ক্রম-বিধান-পক্ষে সামান্য বিভিন্ন বিধিই আর্য্য-সাধন-বিজ্ঞানের গভীর উপদেশে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে এ স্থলে তাহার উল্লেখ সঙ্গত মনে হইতেছে। **'নরের' সাধনাপথ**—"যজ্ঞই" প্রধান-অঙ্গরূপে অবলম্বনীয়। যজ্ঞে—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে —সকাম-ও নিষ্কাম ভাবে 'কর্ম্মযজ্ঞ' প্রথম,পরে উপাসনামূলক 'জপ যজ্ঞ' দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বা অন্তে বেদান্তাদি জ্ঞানতন্ত্রানুকূল আত্মদর্শন ও তত্ত্বাদির বিচারমূলক জ্ঞান যজ্ঞই প্রশস্ত। কিন্তু **'নারীর'** সাধনা কার্য্যে 'তপঃ' বা 'তপস্যাই' শ্রেষ্ঠ অঙ্গরূপে নির্ণিত হইয়াছে। তাহার মূল কারণ 'নর' ও 'নারী' যথাক্রমে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বা পরমপুরুষও পরাপ্রকৃতিরই অংশভূতা অবিদ্যা-সলিলে অলৌকিক ভাবে প্রতিবিম্বিত তাঁহারই অংশরূপে—বিবর্ত্তিত-বিকাশমাত্র। নিগুর্ণ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মায়—যখন গুণের বা তাঁহার শক্তির আবির্ভাবে, তিনি 'সগুণ' বা 'সশক্তি-রূপে দ্বিধা ভেদে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার 'সৎ' ও 'চিৎ অংশই যথাক্রমে—'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'রূপে দ্বিধাকৃত হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই বেদ-বর্ণিত "সোঽকাময়ত বহুস্যাং"ভাবের

বিবর্ত্তনে দ্বিধাভূত সৎ ও চিৎ-অংশের পরবর্ত্তী বিকাশে—'বিদ্যা ও 'অবিদ্যার' বিভিন্ন প্রাদুর্ভাব হয়, অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত 'চিৎ' বা চৈতন্য-সত্তাই আদি জীবাত্মার অহঙ্কাররূপে. 'জীব'-সংজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্ববর্ণিত 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'রই দ্বিবিধ ভাব প্রধানতায় পরিশেষে 'নর' ও 'নারী'রূপে ক্রমে লৌকিক-জগতে পরিচিত হইয়াছে। সেই কারণ 'নরে'—তাঁহার ষোড়শ-কলার আংশিক চৈতন্য বা পুরুষ-প্রধান বিভূতির বিকাশেই যেন পুরুষ-শরীরস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ সৃষ্ট হইয়াছে এবং 'নারীতেও' তাঁহার সেই প্রকৃতি-প্রধানা চৈতন্য-কলার বিকাশেই স্ত্রী-শরীরস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ-কর্ম্মবশে সেই পুরুষ ও প্রকৃতি-প্রধান চৈতন্য-বিভূতি প্রত্যেক নর-নারীতে তাহাদের স্ব স্ব জন্মার্জ্জিত সাধন-কর্ম্মপুষ্ট প্রারব্ধবশে অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চিত বা প্রাধান্য লাভ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ 'শুদ্ধ পুরুষে'—ষোড়শকলার মধ্যে বা যোল-আনার মধ্যে যেন বার-আনা পুরুষ-ভাব এবং চারি-আনা প্রকৃতি-ভাব এবং 'শুদ্ধ-স্ত্রীতে'—যেন বার-আনাই প্রকৃতি-ভাব ও চারি-আনামাত্র পুরুষ ভাব বিদ্যমান থাকে। পুরুষ-প্রধান 'নর'—তাহার অবিরত যজ্ঞপ্রধান সাধনা-ক্রিয়ার ফলে সেই চারি আনা অংশ-পরিমাণ প্রকৃতির অবিদ্যা-ভাব নাশ করিয়া 'ভূঃ', 'ভুব' ও 'স্বঃ' এর অতীত বা উর্দ্ধ 'মহঃ'লোকের' অধিকার পাইয়া, পূর্ণ পুরুষত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং প্রকৃতি প্রধানা 'নারী' বা 'স্ত্রী' প্রথমে নর বা পুরুষের সেবা বা আশ্রয়ে নরেরই 'সহধর্ম্মিণী' হইয়া—অথবা কুমারী-অবস্থায় বা বাল্যে—পিতা প্রভৃতি গুরুজনের, সধবা-অবস্থায় বা যৌবনে—

বিশেষরূপে লৌকিক-পতির এবং বিধবা-অবস্থায় বা বার্দ্ধক্যে—সাধারণতঃ লৌকিক পরম আত্মীয় পুত্রাদির অনুগত ও আশ্রিত হইয়াই বা তাঁহাদিগের উন্নত ও অন্তিম সাধন দশায় সম্পূর্ণ ভাবে সেই একমাত্র অলৌকিক-বিশ্বপতিরস্বরূপ শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর চরণাশ্রিত হইয়া, অবিরত সাধনা দ্বারা তাহার অবিদ্যা-বিলসিত নারীত্বের অবসান করিতে পারে। অর্থাৎ তাহার যেন সেই বার আনা অংশ-পরিমাণ প্রকৃতিভাব নাশপূর্ব্বক পুরুষত্ব লাভ বা তদ্ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তখন তাহারও সেই 'ভূঃ','ভুব' ও 'স্বঃ' এর উপরে 'মহঃ' লোকের অধিকার পাইয়া পূর্ণ পুরুষত্ব লাভ করিয়া থাকে। জীবের 'ভূঃ' বা ভূলোক, 'ভুবঃ' বা অন্তরীক্ষ লোক, ও 'স্বঃ' বা স্বর্গলোক পর্য্যন্তই উক্ত পুরুষ-প্রকৃতির ভাব-বোধক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং তাহাদের উক্ত সম্বন্ধযুক্ত পরস্পরের ভোগাত্মক ও সুখ-দুঃখের হেতুভূত গমনাগমনরূপ ক্রিয়াও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু নরের নানা প্রকার সাধন-যজ্ঞ-প্রধান ক্রিয়ার ফলে এবং নারীর বিবিধ তপঃ-প্রধান ব্রতাদি, বিশেষ নরের যজ্ঞ-কার্য্যে একান্ত ভক্তিযোগে সাহচর্য্য বা সহধর্ম্মিণীরূপে তাহার সেবার ফলেই উক্ত অবিদ্যা বা জীব-বন্ধনরূপ অজ্ঞান ভাব তিরোহিত হইয়া, প্রকৃত পুরুষত্ব লাভ হইয়া থাকে। তখন মহঃলোক-প্রধান ভাবের পরিপুষ্টিতে আর তাহাদের অধোগতি হয় না। অর্থাৎ মহঃলোকে নারিত্বের বা অবিদ্যার স্থান নাই, সেই অবস্থা হইতে জীবাত্মা ক্রমে 'জনঃ', 'তপঃ' ও 'সত্য' লোক পর্য্যন্ত পূর্ব্বার্জ্জিত সাধনাবলেই কেবল পুরুষরূপে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সঙ্গ বা চিন্তা দ্বারাই জীবের যথার্থ ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে বর্ণিত আছে যে,—"তৈলপাক" বা তেলা-

পোকাও সঙ্গবশে ভ্রমর অথবা 'কাচপোকায়" পরিণত হয়। 'রামায়ণে' দেখিতে পাওয়া যায় যে,—সীতা অশোকবনে অবস্থান-কালে, অবিরত রাম-চিন্তার ফলে, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সেই কারণ তাঁহার অনুগতা ত্রিজটাকে তিনি এক দিন ডাকিয়া বলিলেন—"ত্রিজটে, আমি সত্বর এই দেহখানি বিসর্জ্জন করিব।" তাহাতে ত্রিজটা জিজ্ঞাসা করে—"কেন মা?" তখন সীতা বলিলেন—"আমি রাম-চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে যে 'রাম' হইয়া যাইতেছি, আর আমার সীতাত্ব থাকে না, আমি রাম হইয়া যাইলে, আমাদের "লীলা বিঘ্ন" হইবে?" ত্রিজটা বলিল—"তাহাতে ক্ষতি কি মা, আপনি যদি রাম চিন্তা করিয়া রামে পরিণতা হন, তবে আমার রামও আপনার চিন্তা করিতে করিতে অবশ্যই সীতা হইয়া যাইবেন,সুতরাং লীলায় বিঘ্ন হইবে কেন?" ফল কথা—ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক বা প্রেমেতেই হউক,তাঁহার একান্ত সাধনার ফলে, একে অন্যে অবশ্যই পরিণত হইতে পারে। তাই ঋষি-প্রবর্ত্তিত সনাতন সাধন-শাস্ত্রে নারীর তপঃ-প্রধান সাধনার এতাধিক আদর ও এত দৃঢ় আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নারী, নরের সেবা ও তাহার যজ্ঞ-ধর্ম্মের সহায়তা করিয়াই নরের কৃত যজ্ঞ-ফলের অর্দ্ধাংশ অবশ্যই লাভ করিতে পারে। সেই হেতু নারীর আর স্বতন্ত্র যজ্ঞাদির প্রয়োজনই হয় না,তবে উন্নত অব-স্থায় বা উচ্চাধিকারী সাধিকাও যজ্ঞাদির অধিকারিণী হইতে পারে, তখন নারীও নরের ন্যায় সর্ব্ববিধ উন্নত সাধনার ফলে, ক্রমে সন্ন্যাস-অধিকারও লাভ করিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনীরূপে বিশ্ববরেণ্যা হইতে পারেন। তখনই সেই নারী প্রকৃত জগজ্জননীরূপে পরম পূজনীয়া "মাতাজী" আখ্যায় সকলের চিরপূজ্যা হইয়া থাকেন।

বিহারীবাবা, আমাদের সাবিত্রীমাকে সেই ভাবেই ক্রমে উন্নত অধিকারের সাধনোপদেশ দিয়া অন্তিম আশ্রমে পৌঁছাইতে প্রযত্ন করিয়াছেন। আমরাও সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি ও অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি যে, মা তাঁহার কৃপায় অন্তরে প্রকৃত সাধন-সামর্থ্য লাভ করিয়া পরিপুষ্টা ও যশস্বিনী হউন এবং তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরু-পতিদেবতার সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থা হউন, তাঁহার অন্তিম কৃপাধন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হউন।

সাবিত্রীমা বিহারীবাবার যথেষ্ট কৃপা লাভ করিয়া, ক্রমে সন্ন্যাস-ধর্ম্মমূলক ব্রহ্মচারিণীরূপে পরিণতা হইলেন। এখন হইতে তাঁহার আত্মীয়দিগের সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্কই পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি, তাহাদের সহিত পত্র-ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। তবে তাহারা বারবার পত্র দিলে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় উত্তরমাত্র দিতেন। বাটীতে যাহা কিছু নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, সমস্তই ত্যাগ করিলেন, অধিকন্তু তাহাদের কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তবে নিজের স্থান বা মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সাধারণের ন্যায় কিছু কিছু বিশেষ সাহায্য লইয়াছিলেন মাত্র। তিনি এখন কাশীতে পতি-উপদেশে কেবল ভিক্ষার উপরেই জীবন-নির্ভর করিলেন। মধ্যে ঘটনাচক্রে কিছুদিন শ্রীমান্ গোপালের সামান্য সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় বা প্রারব্ধবশে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গোপালের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার পতি-নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুনী-ধর্ম্মানুগত অযাচিত-ভিক্ষাবৃত্তিতেই আত্ম-নির্ভর করিলেন। এখন তাঁহার আর কোনও নির্দ্দিষ্ট আয় রহিল না, যাহা কিছু দুই চারি টাকা পাইতেন, তাহাতে ঠাকুরের সেবা আদিতেই ব্যয়

করিতেন। এখন হইতে তিনি আর সাধারণ লোকের মত সকলের সহিত বৃথা বাক্যালাপ করিতেন না, যাঁহারা বিশেষ অনুগত বিশ্বাসী, ধর্ম্মচর্চ্চা-পরায়ণ, কেবল তাঁহাদের সহিতই প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কহেন, তাহাদিগকেই নিজ কুটীরে আসিতে দেন, কিন্তু তাহাদের নিকটেও সাধারণতঃ কোন প্রয়োজনীয় অভাবের কথা প্রকাশ করেন না। প্রায়ই মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন আসন বা বাঘছালের উপরেই তাঁহার এখন শয়ন ও উপ বেশন। তিনি সূক্ষ্ম **গৈরিক-বস্ত্রই** এখন ব্যবহার করেন, শীতের প্রাদুর্ভাব-সময়েও আর অধিক বস্ত্র ব্যবহার করেন না। ভক্ত মেয়েরাই অধিকাংশ সময়ে তাঁহার বস্ত্র গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া দেন। কখন কখন তিনি স্বয়ংও নিজ বস্ত্র রং করিয়া লন্। ভিতরে ব্রহ্মচারিণীসুলভ কৌপীন ধারণ ও বাহিরে বহির্ব্বাস, উত্তরীয়-বস্ত্র (চাদর) সর্ব্বদা ব্যবহার করেন।

আহার্য্য-সম্বন্ধে ফল-মূল, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, সরবৎ এবং সাগু বা আটা, হয় দুধে,না হয় গঙ্গাজলে গুলিয়া,ভোজন করিয়া থাকেন। পতি বিদ্যমান থাকিতে পাণ্ডাদের বাড়ীতে তাঁহার জন্য যে কুটীর বা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও তিনি তাহাতেই অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং অন্যত্র আর কোথাও থাকিতে হয় না।

বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে তিনি **লেখাপড়া** শিখিবার আদৌ অবসর পান নাই, পতিগৃহে আসিয়া তাঁহার সামান্য অক্ষর-পরিচয়-মাত্র হয়। পরে সামান্য 'ছাপা পুস্তক' পড়িতে পড়িতে এখন ক্রমে ধর্ম্মগ্রন্থাদিও বেশ পাঠ করিতে পারেন।

সাবিত্রীমা বিহারীবাবার কৃপালাভের পর, এই সাধু-আশ্রমে আসিয়াও তাঁহার সহিত প্রথম প্রথম যাহা কিছু বলিবার হইত,

সমস্তই লিখিয়া জানাইতেন। পরে তাঁহার সহিত কিছু দিনের জন্য কথা কহিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। বাবাও তাঁহাকে প্রায় সকল উপদেশই লিখিয়া জানাইতেন। সেই সকল উপদেশ সাবিত্রীমা ও বিশেষ ভাবে সুধামাই লিখিয়া রাখিতেন। তবে তিনি দেহ-রক্ষার কিছু পুর্ব্বে মনের অনেক কথা মুখে প্রকাশ করিয়াও উপ-দেশ করিয়াছিলেন। সেই উপদেশসমূহের মধ্যে কিছু কিছু পরে প্রকাশিত হইল।

কাশীর জন-সাধারণের মধ্যে কোন কোন নীচ প্রকৃতির লোক সাবিত্রীমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া, বিহারীবাবাকে **অন্যথা নিন্দা** করিতে ত্রুটী করিল না। কেহ কেহ প্রকাশ্য ভাবেই বলিত—"হ্যাঁ খুব সাধু, তোমরা জান না, দিনের বেলায় সাধু-সেজে, ঢং করে বসে থাকেন, রাত্রিতে লুকিয়ে লুকিয়ে স্ত্রীর নিকটেও যান! শুধু তাই নয়, স্ত্রীর আসার পূর্ব্ব হইতেই বাবাজী বেশ্যালয়েও যেতেন, এখনও সে সব ত্যাগ করতে পারেন নি। এদিকে সাধুর বিদ্যা সব ভগবানের কৃপায় জাহির হয়ে পড়েছে, ওঁর স্ত্রীর গর্ভ হয়েছে।"

কোন কোন লোক ইহার প্রমাণ লইবার জন্য রাত্রিকালে তাঁহার মন্দিরের আশে পাশে **গোপনে চর** রাখিলেন। কেহ বা স্বয়ংই লুকাইয়া লুকাইয়া খোঁজ লইত,—সাধুবাবা রাত্রিতে কি করেন, কোথায় যান, অথবা তাঁহার স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রী গোপনে আসে কিনা? কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের ভ্রম দূর হইল, অধিকন্তু লজ্জায় তাহারা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। আর কেহ কাহারও সহিত সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না। তাহারা দেখিল —সাধু-বাবাজী সেই হাত-তিনেকমাত্র দীর্ঘ মন্দিরের মধ্যেই সমস্ত রাত্রি আপন মনে বসিয়া আপনার সাধনায় বিভোর হইয়া থাকি-

তেন। তখন ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজ মুখে সাধুর প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে—"সাধুবাবা প্রকৃতই সিদ্ধ-পুরুষ, তাঁহার প্রতি অযথা নিন্দাবাদ করা কর্ত্তব্য নহে।"

এতদ্ব্যতীত বহু স্ত্রীলোকও সাবিত্রীমায়ের কুটীরে যাইয়া নানা ছলে বলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল যে,—বাস্তবিক তাঁহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে কিনা? কোন কোন নিতান্ত বেহায়া ঠোঁটকাটা মেয়ে-মানুষ,এই বিষয়ে তাঁহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা বোধ করিত না। তিনি তাহাদের সকল কথা ও ছলনা নীরবে শুনিয়া ও দেখিয়া যাইতেন এবং কখন কখন মৃদু মৃদু হাসিয়া তাহা-দের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই ভাবেও কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, যখন তাঁহাতে কোনরূপ গর্ভ-লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল না, তখন তাঁহারা যেন রণে পরাস্ত ও হতাশ হইয়া অতিকষ্টে হেঁটমুণ্ডে তাঁহার প্রতি বৃথা নিন্দা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কেহ বা উহাদের মধ্যে ভাল লোক, তাহারা নিজ মুখেই তখন প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বিমল প্রশংসা ও গৌরব-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইল। শ্রীমতী উমাদেবী, প্রসিদ্ধ ডাক্তার ঈশ্বরবাবুর স্ত্রী আদি অনেকেই সর্ব্বদা সাবিত্রী মায়ের নিকট থাকিতেন এবং প্রায়ই একত্র তাঁহার সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তিনি এই সকল ব্যাপার শুনিয়া ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানপুষ্ট প্রমাণ সকলকেই দৃঢ় বাক্যে বলিতেন।

তখন শত্রুপক্ষীয় অনেকেই অগত্যা ইহাঁদের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। অনন্তর তাহাদের মুখেই ইহাঁদের যথেষ্ট প্রশংসার বার্ত্তা শুনিয়া সকলে অধিকতর বিস্মিত, বিমোহিত ও দৃঢ় বিশ্বাস-যুক্ত হইলেন ও যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

নিন্দা অষ্টপাশের মধ্যে একটী প্রধান 'পাশ'-সকলকেই বিনা, বিচারে আবদ্ধ করে। দেবতা, দানব ও মানব, কেহই ইহার হাত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পান না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সকল যুগেই নিন্দার ঘনঘটায় কত রূপে কতই যে, ঘাত-প্রতিঘাত ও বিবাদ-বিশৃঙ্খলা বশে দেশ ও সমাজ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, কত কাল ধরিয়া তাহার ফল বংশ-পরম্পরায় নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ পুরুষোত্তম, লীলা-বিগ্রহরূপ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে কত মহাপুরুষ সিদ্ধ মহাত্মা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা ও সতী প্রভৃতি কত প্রাতঃস্মরণীয়া দৈবশক্তি সম্পন্না নারীশ্রেষ্ঠাগণও কেবল নিন্দার অপ্রতিহত আঘাতেই জর্জ্জরিত হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

'নিন্দা' অনেককে বিনা-কারণে ঘৃণ্য ও অশ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিলেও, মুক্তিকামী সাধক ও মহাত্মাকে সময়ে যেন উন্নতির পথেই অলক্ষ্যে উঠাইয়া দেয়। সেই কারণ অনেকে, সদা প্রশংসা-পরায়ণ ও প্রিয়বাদী মিত্র অপেক্ষা নিন্দাকারী শত্রুকেই প্রকৃত মিত্র বলিয়া মনে করেন। নিন্দা শত্রুভাবে সাধকের অনেক অপ্রত্যক্ষ ও আশঙ্কাপ্রদ দোষ দর্শাইয়া, ভবিষ্যতের সাধনা-পথে যথেষ্ট সাবধানতা ও সহায়তা প্রদান করে।

প্রবাদ আছে—'যাহা রটে, তাহা বটে!' সকল স্থলে ইহার প্রমাণ সত্য বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না, বৃথা ভ্রান্তিও অনেক স্থলে 'কারণ' বলিয়া বুঝা যায়। বাস্তবিক মূল না থাকিলেও, অনেক সময় আকাশ-কুসুমের ন্যায় অনেক নিন্দাবাদ প্রচারিত হয়, তাহা সময় সময়ে আপনা আপনিই তিরোহিত হইতেও দেখা যায়। কিন্তু

অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, নিন্দা করিতে ও নিন্দা শুনিতে যেন অনেকেরই বেশ ভাল লাগে। প্রকৃতি-বশে ইহা বহু লোকের বেশ মুখ-রোচক বস্তু বলিয়াই মনে হয়। নিন্দাকারীর পাত্রাপাত্র বিচার থাকে না। ছুঁচের 'ভাল মন্দ' বা 'নূতন পুরাতন' কোনও বস্ত্রের যেমন বিচার নাই, ছিদ্র করিয়া যাওয়াই তাহার ধর্ম্ম, নিন্দুকও ঠিক সেইরূপ সকলেরই নিন্দা করিয়া আত্মধর্ম্ম ও প্রকৃতির নিত্য পরিচয় দেয় মাত্র! তবে 'সত্য' চিরদিনই সত্য, ক্ষণিক মিথ্যার আবরণে লাঞ্ছিত ও আবৃত হইলেও, বস্ত্রাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সময়ে ফুটিয়া বাহির হইয়াই পড়ে। নিন্দার আবরণে সত্য-স্বরূপ ধার্ম্মিক-প্রকৃতি চিরদিন লাঞ্ছিত হইয়া থাকে না, সেই স্ব-প্রকাশ ভাব, সময়ে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠে ও মিথ্যার অতি ঘৃণ্য আবর্জ্জনা রাশি ধ্বংস করিয়া চিরদিনের তরে তাহার নিজ যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সংসার উদ্ভাসিত করিয়া তুলে।

যাহা হউক বিহারীবাবার অলৌকিক সাধন-সম্পদ এবং সাবিত্রী-মায়ের অসাধারণ পতিভক্তি, নিষ্ঠা ও পতি-প্রদর্শিত নিবৃত্তির সাধনা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই মেঘমুক্ত আদিত্যের ন্যায় তাঁহাদের নিন্দামুক্ত করিয়া তুলিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিহারীবাবার দেহত্যাগ ও সমাধি।

জীবের 'দেহত্যাগ' বা 'প্রাণত্যাগ' শব্দই 'মৃত্যু' নামে অভিহিত। জন্মাইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"জাতস্যহি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবংজন্মমৃতস্য চ।"

অর্থাৎ এই ভূ-লোক, মৃত্যুলোক বা মর্ত্ত্যলোকে জীব মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে, এই মর্ত্ত্য বা ভূ-লোক ব্যতীত অন্য কোন লোকেই মৃত্যু নাই, সুতরাং তথায় জন্মও নাই। এই সংসারে জন্ম হইলে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু মৃত্যু হইলেই সহজে সকলের নিস্তার নাই, অর্থাৎ তাহার সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগম বা ক্রিয়মান্ কর্ম্মসমূহের সম্পূর্ণ ক্ষয় দ্বারা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, মৃত্যুর পরেও নিশ্চয়ই পুনরায় জন্মগ্রহণ দ্বারা সেই সকল কর্ম্মভোগ জনিত লৌকিক সুখ দুঃখ ভোগই করিতে হয়। তবে '**প্রাণত্যাগ**' ও '**দেহত্যাগ**' শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে—'প্রাণত্যাগ হইলে দেহই-প্রধান বোধে যেন প্রাণকে ত্যাগ করিল। সংসারাসক্ত স্থূলদেহাভিমানীদেরই এই ভাব যেন স্বাভাবিক, কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পক্ষে সূক্ষ্ম বা কারণাতীত অবস্থায় স্থিত হইয়া স্থূলাদি ত্রিবিধ দেহত্যাগই তাঁহাদের অন্তিম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাঁহারা তাঁহাদের চিরানুষ্ঠিত অসাধারণ সাধনার ফলস্বরূপ উচ্চতম সমাধিদশায় যখন উপনীত হন, তখনই এই নশ্বর দেহত্যাগের

বাসনা করেন। তাঁহারা তখন আত্মানুভব যোগে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃশাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥”

অর্থাৎ আমার বা আত্মার কখনও জন্ম নাই বা মৃত্যুও নাই, তিনি বা আমি—অজ, নিত্য, অক্ষয় ও পুরাণ, সুতরাং এই দেহ বা শরীর ত্যাগ অথবা বিনষ্ট হইলেও, তাঁহার বা আমার বিনাশ নাই। অতএব মহাপুরুষগণ মৃত্যুর পরিবর্ত্তে আত্মস্থ বা সমাধিমগ্ন হইয়াই অনিত্য দেহাবরণ ত্যাগ করিয়া থাকেন বা চিরমুক্তি লাভ করেন।

ঈশ্বরস্বরূপ মহানুভব ব্যক্তিগণই সেই সমাধি বা মুক্তিপ্রদ অন্তিম দেহত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাপুরুষ অথবা অবতাররূপে জগতে যুগে যুগে আবির্ভূত হন। ধর্ম্মের পালন ও অধর্ম্মের শাসনকল্পে তাঁহাদের নিত্য আদর্শস্বরূপ জগতে প্রকাশ করিয়া সাধু শিষ্য ও ভক্তজনের প্রতিষ্ঠা এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। সংসারের মধ্যে কোনটী নিত্য, কোনগুলিই বা অনিত্য, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তাঁহারাই প্রচার করিয়া যান। এই ভাবে তাঁহাদের প্রারব্ধ-ক্ষয়ের পর, তাঁহাদের মহাযাত্রা উপলক্ষে, তাঁহারা অন্তিম সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। ইহাই তাঁহাদের লীলাবসান-অনুষ্ঠান। সেই হেতু লোকে তাঁহাদের অবস্থাকে 'দেহত্যাগ' বা 'সমাধি'-লাভ বলে।

ভাগ্যবশে সদ্ব্যক্তিগণই তাঁহাদের যথাসময়ে চিনিতে পারিয়া অবিরত ভক্তিভরে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা ও সঙ্গ করিয়া, আত্মোন্নতি করিয়া লয়। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিরা তাঁহাদের ঘোর দুরদৃষ্ট

বশতঃ তাঁহাদের আদৌ চিনিতে না পারিয়া নানারূপে অনাদর, অপমান ও নির্য্যাতন করিতেই বদ্ধ পরিকর হয়।

অনিত্য-সংসার-ভোগে সাধারণ জীব যেন চির-আসক্ত, মহাপুরুষের আদর্শ তাহাদের সেই অসৎ ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ ও আচার-ব্যবহার দেখিলে, তাহারা স্বভাবতঃ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। জন্ম-জন্মার্জ্জিত সাধন-ফলে চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, জীবের সদেচ্ছার উদয় হয় না, ভগবদ্ কৃপালাভেও রুচি হয় না। জীবের সৎ প্রারব্ধ, ইষ্টগুরুর কৃপা, সৎ-সঙ্গ ও সাধনাদি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই সাধু-সজ্জন, যোগী-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষ ও অবতারাদির প্রকৃত মাহাত্ম্য তাহাদের অনুভব হইতে পারে। তখনই তাহারা সেই সকল অসাধারণ পুরুষের কৃপালাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সত্যাদি সকল যুগেই এইভাবে দৈব ও অসুর ভাবাপন্ন উভয়বিধ মানবের ক্রমাগত আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। ভগবান রামচন্দ্র আদর্শ প্রজারঞ্জন ছলে সংসারে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়া যাইলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই? কিন্তু তাঁহার প্রতিও নিন্দা ও নির্য্যাতন করিতে লোকের অভাব হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে অভূতপূর্ব্ব দ্বৈতাদ্বৈত ভাববিনিময়ে জগতে প্রেম-ভক্তি ও জ্ঞানের যে সর্ব্বতোমুখ অভিনব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারও সেই অসাধারণ কর্ম্মযোগের পথে লোকের প্রশংসা ও নিন্দার অপ্রতুল ছিল না। তাঁহার প্রেম-যমুনায় কত ভাবের তরঙ্গই না তখন উঠিয়াছিল, ভক্তের হৃদয়েও হাসি-কান্নারূপে তিনি আবার কতই না লহরীলীলার বিকাশ করিয়াছিলেন? এক জন তাঁহার প্রেম প্রবাহে মজিয়া বলিয়া

ফেলিলেন—"প্রেমের এই মজা"—"যত কাঁদায় তত কাঁদাই, জলে জল বাঁধাই, মুণের সাগর করে মন্থন, সুধার মাখন তায় উঠাই, যত পাই আপনি খাই, আর সবে তত খাওয়াই।" এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যদেবও গৌড়ে হরিনামের যে প্রবল বন্যা বহাইয়াছিলেন, তাহাতেও জগতের কত সৎলোক সেই ভাবের স্রোতে গোলকের পথে ভাসিয়া যাইল, আবার কত অসৎজীব তাঁহার তিরস্কার ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া কত কীর্ত্তিই করিল !

ভারতের বাহিরে শান্তধর্ম্মের অদ্বিতীয় প্রচারক মহাত্মা যীশুখৃষ্টও জগতে কত লোকের পরম প্রিয় হইয়াছিলেন, আবার কত দুষ্ট লোকের ঘোর ষড়যন্ত্রে অবশেষে আত্মবিসর্জ্জন করিতেই বাধ্য হইলেন। মোসলেম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদেরও ধর্ম্ম-প্রচার ব্যপদেশে ঘোর আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এইভাবে ভগবান বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি সকল মহাপুরুষই সৎব্যক্তির নিকট যথেষ্ট সমাদর, অসদ্ব্যক্তির নিকট সময় সময় নানারূপে নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়—অনুগত ভক্ত ও শিষ্যগণের অবিশ্রান্ত শ্রুতিমধুর অযথা **প্রশংসা-মদিরার** সুতীব্র মাদকতা দোষে বহু সাধু মহাত্মার চিত্ত মদমুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদের জ্ঞানদৃষ্টির হীনতা উৎপাদন করে, তাহারা তাহাতে যেন অন্ধ হইয়া যান, আত্মদর্শনের প্রতি আর দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, মুক্তির পথে আর যেন অগ্রসর হইতে পারেন না, ক্রমে আদর্শ হারাইয়া তাঁহারা নিম্নগামীই হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাকারী দুষ্ট শত্রুসম অসৎব্যক্তিগণের অবিরত তীব্র কটাক্ষ, নিন্দা ও নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার ফলে—তাঁহারা সদাই শঙ্কিতভাবে

আত্মদোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হন ও সৎ আদর্শরক্ষা-কল্পে সদাই যত্নবান হইয়া থাকেন, সর্ব্বাঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া সতত আত্মদর্শনেই মনোযোগী হইয়া থাকেন। অতএব মুমুক্ষু সাধুর পক্ষে **ভক্ত ও অভক্ত** উভয় যে সমভাবে উপযোগী, তাহা একরূপ অসংশয়েই বলিতে পারা যায়।

আমাদের পরমহংস বিহারীবাবাও তদনুরূপ চিরন্তনবিধ মহা-পুরুষ-জনোচিত লৌকিক স্তুতি-নিন্দার হস্ত হইতে যে নিষ্কৃতি পান নাই, তাহা ইতোপূর্ব্বেই অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। যাহারা জন্মার্জ্জিত সুবুদ্ধি ও শুদ্ধান্তঃকরণের ফলে, তাঁহার সৎ-স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তাহারা তাঁহার কৃপা ও সৎসঙ্গ লাভে আত্মো-ন্নতিপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার সেবা ও সম্মান করিয়া নিজ নিজ জীবন সার্থক করিয়াছিল। তাহারা তাঁহার সেই অসাধারণ মৌনীভাবের ভিতর দিয়াই সকলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল যে, তিনি অন্তরে অভ্রান্তভাবে সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন, **"ব্রহ্ম-সত্য ও জগৎ মিথ্যা"** এই মহাবাক্যের সত্যতা তিনি তাঁহার প্রতি অঙ্গ-বিক্ষেপে ও ব্যবহার দ্বারাই জগতে অতি পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানী প্রকৃত কর্ম্মী সাধুদিগের মধ্যে একটী প্রবচন প্রচলিত আছে যে—

"কথনীকে ঘর বহুতমিলে, করণীকে ঘর দূর।"

বাস্তবিক আজকাল সর্ব্বত্রই কর্ম্মীর নিতান্ত অভাব, সকলেই 'কথার ভট্ চার্জ্জি'! কাজে কথায় কেহই প্রায় মিল রাখিতে পারে না। কেবল মুখে বলা বা উপদেশ প্রদান অপেক্ষা আদর্শরূপে তাহা কাজে করিয়া দেখাইতে পারিলে, উপদেশ সমূহ যে, অনেকের পক্ষে

বিশেষ হৃদয়-গ্রাহী, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, স্থায়ী ও সহজবোধ্য হয়, তাহা অবধারিত সত্য।

বিহারীবাবা আত্মজ্ঞান বলে, সকলেরই মনোভাব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, সুতরাং সেই ভাবেই সমাগত শিষ্ট ও দুষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত যথাযথ ব্যবহার করিতে, তাঁহার তিলমাত্রও বিলম্ব হইত না।

দশাশ্বমেধ ঘাটে তৃতীয় বার যে মন্দির প্রস্তুত হয়, তাহাতে তিনি ইং সন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে—বাঙ্গলা অগ্রহায়ণ মাসে ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে পুনরায় আসিয়া উপবেশন করেন। কিন্তু তাহার বিরোধী লোকেরা আবার তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। অনেকেই তাঁহাকে ঘাটের উপর তদবস্থায় থাকিবার জন্য আপত্তি করিতে লাগিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ সোমনাথ ভাদুড়ী ও নীলরতন বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অন্যের প্ররোচনায় তাহাতে যোগ দিলেন। কৈলাশচন্দ্র সেন এই ভাবের গোলযোগ দেখিয়া এক দিন তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আবার কেন এলে ?"

এই ভাবে কতক দিন গত হইলে, পৌষ মাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশীর দিন তিনি বলিলেন—"আমার এখানে থাকায় যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে এক মাসের মধ্যেই আমি একেবারে চলিয়া যাইব। আর বৃথা এ সকল উৎপাতে প্রয়োজন নাই।" তিনি পাণ্ডাদের শিবের ঘরে সাবিত্রীমায়ের কুটীরের পার্শ্বেই আসিয়া থাকিলেন। বলিলেন—"আমি আর কাহাকেও বিরক্ত করিতে চাই না, তবে আমার নিকটে এখন আর কেহ যেন না আসে। কেবল আমার প্রয়োজন মত দ্রব্যগুলি যথাসময়ে আমার নিকট রাখিয়া দিও।" সেইভাবেই তাঁহার একান্ত ভক্তিমতী সেবিকা

সুধামা সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি মাখন খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া, সুধা ঘরেই টাট্‌কা মাখন তুলিয়া বাবাকে খাওয়াইতেন। এই সময় এক দিন শ্রীমান্‌ রামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, শ্রীমান্‌ কামিনী-বাবুও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বাবা মাথা নাড়িয়া ও ইঙ্গিতে মজুম-দার মহাশয়ের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। কামিনীবাবুকেও জানান যে, এক মাসের মধ্যেই কোথাও চলিয়া যাইবেন। তাঁহার দেহত্যাগের বিশ পঁচিশ দিন পূর্ব্বেই এই ঘটনা হয়।

রামতারামা সময় সময় তাঁহাকে পান সাজিয়া খাওয়াইতেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন পানে কিছু অধিক চুণ ছিল,তিনি বলিলেন—"আর পান খাবনা।" এই দিন তিনি যেন বিশেষ উদাস ভাব-যুক্ত ছিলেন, ভক্তবৃন্দ তাহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে তিনি মন্দিরের দরজা খুলিয়া তথায় সারা-রাত্রি আপন ভাবে বসিয়া থাকেন। দুষ্ট-লোকেদের অবিরত উপহাস সত্ত্বেও তিনি তখন মন্দিরের দ্বার আর বন্ধ করিলেন না। সচ্চিদা-নন্দ ভাবে সর্ব্বক্ষণ বিভোর হইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই অচঞ্চল কঠোর ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, যদি কেহ আজ তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্তও করে,তথাপি সেই মন্দিরের মধ্য হইতে নিজ আসন ত্যাগ করিবেন না!

যাহা হউক রাত্রি অধিক হইলে, তাঁহার তিরস্কারকারীর দল ক্রমে চলিয়া গেল, তখনও তিনি পূর্ব্ববৎ অচঞ্চল ও আত্মস্থ হইয়া রহিলেন। অনন্তর রাত্রি তিনটার সময় তিনি সেই আসন ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর স্নিগ্ধ সলিলে প্রাণভরিয়া তাঁহার অন্তিম অব-গাহন করিয়া লইলেন। সাবিত্রীমা তাহা দেখিয়া সুধাকে তখনই

ডাকিয়া দিলেন। সুধা মাখন তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে তিনি ঘাটে উঠিলে, 'কাশীনাথ' বাবাজী নামক একটী নাগা সাধু (তাঁহার একান্ত ভক্ত) তাড়াতাড়ি তাঁহাকে মুছাইয়া দিলেন। তিনি পুনরায় মন্দিরের মধ্যে আসিয়া উপবেসন করিলেন ও এইবার সেই মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সে সময় কি ভাবে তিনি তাঁহার অন্তিম সাধন-ক্রিয়া সমাধা করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

প্রভাতে পাঁচটা কি সাড়ে-পাঁচটার সময় পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার তিনি না খোলায়, সুধামা যাইয়া বাহির হইতে বাবাকে ডাকিলেন। তিনি বলিলেন—"কে, মা ?" সুধা বলিলেন—"আজ্ঞা, হ্যাঁ বাবা।" তিনি তখন দ্বার খুলিয়া দিলেন ও যেন একটু ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া—বলভদ্র পাণ্ডার পূজার বাড়ীতে, সাবিত্রীমায়ের (কুটীরে) ঘরে আসিলেন ও বাঘছালখান ফেলিয়া দিয়া কেবল কম্বলের উপরেই বসিলেন।

আজ সোমবার, তৃতীয়া, ২২শে মাঘ সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। সাবিত্রীমা সুধাকে পাঠাইয়া নিজে তখনই স্নানাদি সমাপনার্থে ঘাটের দিকে যাইলেন। সুধা ঘরের দরজার নিকট আসিয়া তথা হইতেই সাবিত্রীমাকে ডাক দিয়া বলিলেন—"মা, বাবা ঘরে এসেছেন।" বাবা সুধাকে দিয়া কেদার পাণ্ডাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া বলিল—"কি গুরুজী, হুকুম্ ?" তিনি উত্তরে নিজ অঙ্গুলিতে তুড়ি দিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"চলিলাম।" পাণ্ডা মনে করিল—"অন্যত্র কোথায় বুঝি যাইবেন, তাই বলিতেছেন।" তিনি তখন হাসিতে হাসিতে নিজের নাড়ী দেখিতে লাগিলেন, পুনরায় হাসিয়া

মুখে বলিলেন—"চল্লাম।" ইহা শুনিয়া সকলেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতসম যেন স্তম্ভিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সকলেই ভীষণ মর্ম্মাহত হইল। সুধার নিকট তিনি জল চাহিয়া পান করিলেন। মাহেশ্বরী তাড়াতাড়ি বাবার পরম ভক্ত উমাচরণ কবিরাজকে ডাকিতে গেল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"বড় পাইখানার বেগ হইয়াছে, সারিয়া শীঘ্রই যাইতেছি, তুমি চল।" বৈদ্যের মুখে এইরূপ শব্দ রোগীর পক্ষে অশুভ-লক্ষণ বলিয়া সাধারণের ধারণা। যাহা হউক ইতোমধ্যেই তিনি এক বার গভীর ভাবে শ্বাস টানিলেন ও পুনরায় জল পান করিতে চাহিলেন। এবার সাবিত্রীমা জল দিলেন,—এক ঘটী গঙ্গাজল তখন যেন প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া সংসারের সকল পিপাসা একেবারে মিটাইয়া লইলেন। তাহার পর হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া আবার বিশেষ জোর দিয়া দ্বিতীয় বার শ্বাস টানিলেন ও ঘরের জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চির-শান্তিময়ী "জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদ্বিগঙ্গার" স্থূলস্বরূপ ও নিজ আসন-মন্দিরটীর দিকেও একবার দেখিয়া যেন তাহাদের নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। সাবিত্রীমা তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তখন পুনরায় কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। বাবা বলিলেন—"কি হবে?"

সাবিত্রীমা তাহা শুনিয়া যেন 'দিশেহারা' ও 'পাগলপারা' হইয়া গেলেন, সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পিছনের দিকে সাবিত্রীমা ও সম্মুখের দিকে সুধামা তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন। বাবা তাহাদিগকে এক্ষণে মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"তোমরা

আমাকে এখন আর ছুঁইও না, আমি চল্লাম্, তোমরা কেঁদো না—” এই বলিয়া তৃতীয় বার আবার শ্বাস টানিলেন। এই বার তিনি তাঁহার জিহ্বা বাহির করিয়া দেখাইলেন—জিহ্বায় যেন একটু সামান্য রক্তের মত লাল চিহ্ন দেখা গেল। ইহাই তাঁহার শেষ শ্বাস গ্রহণ। পর মুহূর্ত্তেই বেলা প্রায় সাড়ে-ছয়টার সময় সূক্ষ্ম-শরীর প্রধান তাঁহার প্রাণবায়ু সকলের অলক্ষ্যে বাহির করিয়া সেই নশ্বর দেহে তথায় যেন বসিয়াই অন্তিম **সমাধি-অবস্থায়** তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার দিকে বা পূর্ব্ব দিকে তাঁহার মাথাটী হেলিয়া পড়িল। তাহার পরই তাঁহার দেহ তদবস্থায় গড়াইয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া পড়িয়া গেল।

তিনি পূর্ব্বে কখন কখন এইরূপ ভাব দেখাইতেন। সুতরাং সাবিত্রীমা কেদার পাণ্ডাকে তখনই আবার ডাকাইলেন, উমাচরণ কবিরাজও আসিলেন, কেদার বাবার হাতে পায়ে নিজের হাত দিয়া দেখিয়া যেন প্রাণান্তসম দুঃখ ও বিরক্তির ছলে মাকে ধাক্কা দিয়া, ছল ছল নেত্রে বলিল—“বাবা যে, ফাঁকি দিয়ে গিয়েছেন? কি বলে গেলেন?”

প্রয়াগের ‘কুম্ভের’ মেলার ফেরৎ অসংখ্য সাধু-সজ্জন সে সময় গঙ্গায় চড়ায় ও তীরে অবস্থান করিতেছেন, প্রয়াগঘাটে ও তাহার চতুর্দ্দিকে যেন বিরাট মেলা বসিয়াছে, তাঁহাদের দেখিবার জন্য কত শত শত লোক সমাগত, এ সময় কাশীর সাধু-সংঘের শোভা বাস্তবিক অবর্ণনীয়! কে যে, চারিদিকে সংবাদ দিল, তাহার ঠিক নাই, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সেই ঘর হইতে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য; কাশীবাসী ও সাধু-সজ্জনে ঘর-বাড়ী

ভরিয়া গেল—তিনি যেন নিশ্চল ও নিশ্চিন্তভাবে সেই ঘরে শুইয়া নিদ্রিত হইয়া আছেন।

সাবিত্রীমা তখনও বুঝি মনে করিতেছেন—"পরমহংসদেবের দেহে প্রাণ আছে"—তিনি যেন অবাক্ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবস্থিত। লৌকিক প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার এই সাধারণ বিধি-নিয়মের ব্যতিক্রম জীবের সহজে হয় না, যাহা নাই—তাহা যেন আছে, যাহা অসম্ভব তাহাও বুঝি সম্ভব হইতে পারে; এই ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধিতেই জীব পুনঃ পুনঃ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। তবে উন্নত সাধন-পরায়ণ বা আত্ম-জ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তি ক্ষণিকের তরে এই ভাবে লৌকিক বন্ধনের দশায় পতিত হইয়াও, অচিরে মুক্ত হইতে পারে। সাবিত্রীমাও কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই ভাবের-প্রাবল্যে পতিত হইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার পতি আজ প্রারব্ধ ভোগাবসানে নিজ স্থূল-দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সেই অবিনশ্বর উমাপতি বিশ্বনাথ-অঙ্গে চির-মিলন লাভ করিয়াছেন।"

ভক্ত সেবিকারা যেন তাঁহার জননী ও কন্যার ন্যায় নানা ভাবে তাঁহার সেবা যত্ন ও সান্ত্বনা দিতেছেন। এমন সময় 'বিন্দু' ঘাটিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট বাবার অন্তিম-সেবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন মা যেন শিহরিয়া উঠিলেন ও ছল ছল নেত্রে নিজ পতি পরমহংসদেবের সেই পরিত্যক্ত দেহের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিলেন, পরে বিন্দুর দিকে চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

যাহার কার্য্য তিনিই সম্পন্ন করেন। সাধুর অন্তিম-সংস্কার তিনিই এই বার সাধুরূপে সম্পন্ন করিবেন। ভক্ত-ভগবানের নিগূঢ় সম্বন্ধ সতত বিদ্যমান। তাঁহার বোঝা তিনিই বহন না করিলে আর কে করিবে? আর কেই বা ভক্ত, কেই বা ভগবান! তখন

যে সবই তন্ময়—একাকার ; তিনি যে সর্ব্বব্যাপী সনাতন নিত্য সত্য নির্ব্বিকার, তখন যে, তিনিই ঘটে ঘটে বিরাজ-মান আকাশ-বাতাস ব্যাপিয়া কেবল তিনিই যে বিদ্যমান ! চারি দিকে তাঁহারই নাম, তাঁহারই গুণ-গান, তাঁহার তরেই আজ সর্ব্বত্র সর্ব্ব মুখে হা-হুতাশ, ক্রন্দন বা অবিরত অশ্রু-বর্ষণ ! আজ কত লোকে কত ভাবে তাঁহারই কথায় চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। সাধু-মণ্ডলী সেই মহাপুরুষের দেহ-সমাধির মানসে আজ যেন পিপিলিকা-শ্রেণীর ন্যায় সারবন্দি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—"শিব শিবমহাদেব" রবে গগন-পবন মাতাইয়া তুলিয়াছেন, ঘাটের পাণ্ডারা তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহসা এরূপ অন্তর্দ্ধান ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইলেও, তাঁহার এই অন্তিম সংস্কার-অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছে। সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সযত্নে তাঁহার সেই পবিত্র দেহ-খানি ধরাধরি করিয়া বাহিরে তাঁহার সেই মন্দিরের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তখন দলে দলে কাশীর সকল নর-নারী সমাগত হইতে লাগিলেন। আমরাও তখন দশাশ্বমেধেই অবস্থান করিতাম, বৃদ্ধা-মাতাজী গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তখনই তিনি সেই সংবাদ আসিয়া দিলেন। আমরাও তাঁহার মহাপ্রস্থান-উপলক্ষে তাঁহার দেহ-মন্দিরটী দেখিয়া আসিলাম।

কাশীতে গ্রহণাদি যোগের সময় ঘাটে যেরূপ জনতা হইয়া থাকে, আজ ঠিক সেই ভাবে দশাশ্বমেধ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘাট-গুলি জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই শ্রদ্ধা-সহযোগে অবিরত নয়নজলে যেন তাঁহার তর্পণ করিতেছেন—কত ফুলমালা-বিল্বপত্রে তাঁহার সেই-পূত অঙ্গ আজ শোভিত ও সুবাসিত কুঙ্কুম

চন্দনাদিতে চর্চ্চিত করিয়া দিয়াছেন। সে অপরূপ ভাব যথার্থই বর্ণনাতীত।

বেলা প্রায় এগারটার সময় তাঁহার সেই সুশোভিত সুপবিত্র দেহ পুনরায় ভক্তি-যত্নে সকলে সাজাইয়া অধিকতর শোভান্বিত করিয়া অতীব শ্রদ্ধা ও সমাদরে একখানি বজরা-নৌকার উপর সকলে তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং অতি সমারোহে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-করতালাদি নানা বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত দিন গঙ্গার উপর বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঘাটের ধারে ধারে অগণ্য নর-নারী তাঁহার দর্শন ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের সম্মুখ হইতে ক্রমে কেদার ঘাট পর্য্যন্ত সেই নৌকার শোভাযাত্রা লইয়া গেলেন, পরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেলেন। তখনও তাঁহার দর্শন-পাইবার উদ্দেশে দলে দলে সকলশ্রেণীর লোকেরই সমাগম হইতে লাগিল।

অনন্তর একটী সুন্দর 'প্রস্তর-পেটিকা' বা পাথরের 'টাঁকার' মধ্যে তাঁহার সেই সুশোভিত দেহ-খানি সকলে অতি সাবধানে রক্ষা করিলেন। পুনরায় যেন কাশীবাসী সমবেত কণ্ঠে—একস্বরে "শিব-শিব মহাদেব" রবে মনিকর্ণিকার-গঙ্গাবক্ষ বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন ও সেই "শিব-শিবাধারটী" সযত্নে ভক্তি-গদ্‌গদ-ভাবে সকলে ধরাধরি করিয়া সুস্নিগ্ধ স্বচ্ছ গঙ্গাজলে সমাধিমগ্ন করিয়া দিলেন। মায়ের অতীব প্রিয়-সন্তান আজ মায়েরই ক্রোড়ে চির-শান্তি লাভ করিতে চলিলেন।

এত দেখিয়াও তাঁহার চিরবিরুদ্ধাচারী কোন কোন দুষ্ট লোক তাঁহার এইরূপ সাধুজনোচিত দেহত্যাগের বিষয়েও টীকা করিতে

ছাড়িল না। ভগবান জীবের মুখে অধরোষ্ঠরূপে কোন বাক্য বলা বা না বলার জন্য দৃঢ় দ্বার প্রদান করিলেও, নিজ নিজ বৃত্তি ও সংযমের অভাবে অনেকেই তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। সুতরাং পরমহংসদেব এত অল্প সময়ের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়া কেহ বলিল—"নিশ্চয়ই প্লেগ হইয়াছিল," কেহ বা বলিল —"মুখে রক্ত উঠিয়া মারা গেল," এই রূপ কত কি বলিয়া তাহারা যেন তৃপ্তি লাভ করিল। যাহা হউক তাহাতে তাঁহার কিছুই ক্ষতি হইল না। তিনি সকলের সমক্ষে প্রবল প্রতাপেই চলিয়া গেলেন।

সংসারে তিনিই যথার্থ ধন্য-পুরুষ, যিনি অন্তে জগজ্জননী পতিত-পাবনী গঙ্গামাতার পবিত্র অঙ্ক এমনই ভাবে অধিকার করিতে পারেন। এক দিন শ্রীমৎ বিহারীবাবা নব-কুমাররূপে গর্ভধারিণী গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে কত স্নেহ-আদরে শায়িত ছিলেন। তিনি কত যত্ন ও আশায় বুক বাঁধিয়া শ্রীশ্রীষষ্ঠীদেবীর চরণ-তলে শয়ন করাইয়া দিয়াছিলেন, কত সমারোহে অন্নপ্রাশন আদি সংস্কার-কার্য্যে আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। উপনয়ন-বিবাহাদিতেও কত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ সেই সন্তানকেই জগদ্‌গুরু পরমহংসরূপে সংসারে প্রসিদ্ধ করাইয়া, জগজ্জননী জ্ঞান-প্রবাহিনী গঙ্গারূপিণী মা আমার আত্মক্রোড়ে লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ধন্য মাতার অপরিসীম স্নেহ, ধন্য মাতার অপার করুণা, ধন্য ভক্তবৎ-সলা-নামের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য! "মাতৃকৃপাহি কেবলম্"! আজ নর-নারায়ণরূপে জগতের "বিহারীবাবা" সেই অপরিত্যাজ্য মায়েরই বিশাল-অঙ্কে অনন্ত-শয়নের উদ্দেশেই যাত্রা করিলেন।

ওঁ শান্তি, ওঁ ভক্তি, ওঁ মুক্তি ওঁ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ও বাবার আবির্ভাব।

সাবিত্রীমা পতির উপদেশে সর্ব্বত্যাগী হইয়াও,আজ সহসা যেন নিরাশ্রয়া, অনাথিনীরূপে সংসারসাগরে নিপতিতা হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পতি প্রদর্শিত শান্তিপথ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া সুস্থির চিত্ত হইতে সমর্থা হইলেন। যাঁহার সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ-সদৃশ এমন পতি,সেই অন্নপূর্ণা-সদৃশা সতীর শোক-মোহ কত ক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? শরতের মেঘের মত ক্ষণকালের তরে প্রখর আত্মজ্ঞান-রূপ সূর্য্যের কিরণ আবরণ করিয়া, তখনই তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে পতির কায়ার পরিবর্ত্তে যেন পতির ছায়া-মূর্ত্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, তাঁহারই পাদপদ্ম অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া,এই পবিত্র কাশীধামে একান্ত ভাবে সাধনা-নিরতা হইতে যত্নবতী হইলেন।

তাঁহার পরমপূজ্য পতি-দেবতা আজ যেন গুটিকাবদ্ধ কীটের ন্যায় আত্ম-গুহায় এত কাল সাধনাপূর্ব্বক সহসা তাহা ভেদ করিয়া অতি বিচিত্র প্রজাপতিসদৃশ সকলের অলক্ষ্যে নির্গত হইয়া, বিশ্ব-পতিতে মিলিত হইয়া যাইলেন। সাধন, জগতের ভাস্করসম তিনি আজ আত্ম-কিরণপ্রভা সঙ্কোচন করিয়া যেন অস্তাচল-পার্শ্বে আশ্রয় লইলেন। আহা, সাবিত্রীসতী আর তাঁহার সেই বিমল রশ্মিপ্রভা স্থূল-নয়নে দর্শন করিতে পারিবেন না! কেবল তিনি বলিয়া নহেন, তাঁহার সহিত সুধা মা প্রভৃতি সেই মহাপুরুষের প্রত্যেক ভক্ত ও

অনুগত ব্যক্তিই তাহাতে এখন হইতে বঞ্চিত হইলেন। মা যেন আশ্রয়হীনা লতাটীর মত সহসা প্রবল বাত্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্না হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও, তাঁহার নিত্য-প্রিয়ধন ভক্ত ত্যাগ করিতে পারেন নাই। লোক-নয়নে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইলেও, তিনি এখন প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে রাসেশ্বর রাসবিহারীরূপে যেন নিত্য বিরাজিত। তাঁহার দয়া অপরিসীম, তিনি একান্ত ভক্তগণের অন্তরে কতই স্নেহ ও সাহসের কথা গোপনে বলিতেছেন, কত সাহস ও উপদেশ দিতে-ছেন, তাঁহার আশ্রিতের আবার ভাবনা কি? বিশেষ সতী-সাবিত্রীর ত কথাই নাই, তিনি যে তাঁহার অন্তরের অবিচ্ছেদ নিত্য-দেবতা! কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যবলে তাঁহার শক্তিরূপিণী, সহ-ধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গীরূপে তাঁহার আদিলীলার সহচারিণী হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে পতির জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরেও তিনি সেই পতি-দেবতার পরমহংস-রূপের প্রতীক মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাতেও যে তিনি সদাই প্রত্যক্ষ বা জাগ্রত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন॥ সাবিত্রীমা প্রভৃতি সত্বরেই তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন। তিনি সেই মূর্ত্তি অবলম্বনেই অবিলম্বে তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তাঁহার সেই পরিত্যক্ত মন্দিরের শূন্য আসন, সাবিত্রীমায়ের হৃদয়-কুটীর এবং ভক্ত-সন্তানগণের অন্তর-মন্দির অচিরে পূর্ণ হইয়া গেল। কাশীতে ভক্তবৃন্দের যেন অভিনব নিত্য বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হইল।

সচ্চিদানন্দময়ী পরমাত্ম-শক্তি স্বপ্রকাশ হইলেও, নিগু‍র্ণ-সত্তায় তাঁহার অস্তিত্ব কেহই যথার্থ অনুভব করিতে পারে না। তিনি

সগুণ হইয়াই সদা সাধক ও ভক্তের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার 'গুণই' প্রকৃতি, তাহাই তাঁহার 'শক্তি'। সেই শক্তিই তাঁহাকে জগতে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—অগ্নিপ্রমুখ দেবতারাও যখন সেই ব্রহ্ম-প্রাদুর্ভাব অনুভব করিতে পারিলেন না, তখন দেবতাদিগের অধিশ্বর—'ইন্দ্র'দেব, 'হৈমবতী-উমারূপা ব্রহ্মশক্তি'-সহযোগে বা তাঁহারই আদি প্রকাশ-সত্তা—'পরা'নাদরূপা 'শব্দ' অথবা প্রথম বাক্য-সহযোগে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও শুদ্ধ সনাতন হইলেও, তাঁহারই বোধ-শক্তিরূপা জ্ঞানের বিকাশ ব্যতীত কাহারও আত্মজ্ঞান হয় না। সংসারেও তাঁহার প্রত্যক্ষ বিভূতি সূর্য্যদেব সদা প্রকাশমান থাকিলেও, তাঁহার গুণ বা কিরণ ব্যতীত তেমনই কাহারও নয়ন-পটে প্রতিভাত হন না। ছায়ানুগত 'কিরণ-প্রভা' ধরিয়াই মূল-আলোকের নিকট পৌঁছান যায়, ঘণ্টাদি শব্দ-যন্ত্রের 'ধ্বনি'-সহযোগেই তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়। সাবিত্রীমাও আজ সেই মহাত্মার শক্তিস্বরূপে তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশিকা। তিনি ভক্তি-গদ্‌গদভাবে আজ অবিরত নয়নের প্রেম-অশ্রুধারায় তাঁহার সেই অন্তর-দেবতার উদ্দেশে নিজ হৃদয়দেশ ভাসাইয়া সেই অদৃশ্য তদ্‌পাদপদ্ম বিধৌত করিতে লাগিলেন। এখন হইতে তিনি সেই প্রত্যক্ষ দেবতার পূজার জন্য, তাঁহার প্রীতি-কামনায়, তাঁহারই প্রিয় উপচার সহযোগে পূর্ব্বের ন্যায় যেন সাক্ষাৎ ভাবেই তাঁহার সেবায় গভীররূপে নিরত হইলেন। সুধা মা প্রভৃতি বাবার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও বহু সদাশয় ব্যক্তি সমবেত-শক্তিতে তাঁহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। শক্তিময়ী ভক্তের বোঝা স্বয়ং ভগবানই বহন করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে শক্তির সহায়তা ব্যতীত কোন কর্ম্মই সহজে সুসিদ্ধ হয় না—দেবাসুরের মহাসমরে অদ্বিতীয়া দৈব-শক্তিসম্পন্না মহামায়ার সাহায্যেই দেবতাবৃন্দ সকল অসুর বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান রামচন্দ্রও সেই আদ্যাশক্তির সহায়তায় রাবণবধ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার-সাধন করিতে পারিয়াছিলেন; তাই শক্তিমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতাগণের স্তবে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভগবানের অপেক্ষা তাঁহার নাম, গুণ, শক্তি ও ভক্তের মহিমাই সর্ব্বত্র যেন অগ্রে ফুটিয়া উঠে, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেও অগ্রে 'শক্তি'—পরে 'তিনি'। 'উমাশঙ্কর,' 'লক্ষ্মীনারায়ণ,' 'সীতারাম,' 'রাধেশ্যাম' আদি যুগল নামেও তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিলেও, সাবিত্রীমায়ের একান্তভাবে তাঁহার আরাধনার ফলে—তিনি প্রত্যক্ষরূপেই তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এক দিন মন্দিরের দ্বার খুলিবামাত্র, তিনি দেখিলেন—পরমহংসদেব জীবন্তভাবে তথায় বসিয়া আছেন, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত ও একেবারে পুলকিত হইয়া যাইলেন এবং প্রভুর চরণপ্রান্তে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক, তাঁহার সেই সুকোমল চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা তুলিয়া যেমন তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে যাইলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখনই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া সাবিত্রীমা যেন হতভম্ব হইয়া স্থির হইয়া গেলেন ও তাঁহার এই অলৌকিক আগমন ও দর্শন-দান ভাব কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের কথা, এক বার সম্মুখ হইতে তাঁহার সেই প্রকট পরিচিত কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইলেন।

—"আর বসে কেন, উঠে যাও।" তখন সাবিত্রীমা হতাশ হইয়া উঠিয়া যাইলেন।

ঘাটের পাণ্ডারাও কোন কোন দিন সকালে, কোন দিন বা সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরের সম্মুখে তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। লক্ষ্মীমাও বাবার মন্দির পরিষ্কার করিতে যাইয়া, তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বকথিত পাণ্ডাদের বাটীতে মায়ের কুটীর মধ্যে যথায় বাবা দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এক দিন সাবিত্রীমা ও একটী ভক্ত-মেয়ে গল্প করিতে বসিয়াছিলেন, উহাঁরা উভয়েই স্পষ্টরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন—তিনি তখন সেই বাটীর স্থাপিত শিবের পার্শ্বদিয়া সশরীরে চলিয়া গেলেন। মা এখনও নিত্যই তাঁহাকে ধ্যানকালে অন্তরে স্পষ্ট দেখিতে পান। যখন কোন সঙ্কটে পড়িয়া বা কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে করিয়া মা একাগ্র ভাবে তাঁহার চিন্তা করেন, তখন বাবা কৃপা করিয়া মাঝে মাঝে উপস্থিত হন ও তাহার যথাযথ উপায় করিয়া বা মাকে অভয় প্রদান করিয়া যান।

বাবার এক জন মুসলমান ভক্ত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—সে ব্যক্তি পাণ্ডাদের মাঝে মাঝে বলিতেন—"বাবা যখন তোমাদেরই ঠাকুর, তখন তোমরা তাঁহাকে বেঁধে রাখ না কেন? এখনও যে তিনি আমাদের 'নেমাজের' সময় পূর্ব্বের মত আমার সামনে আসিয়া কৃপা করেন। আমি তাই তাঁহার পবিত্র আসনের দর্শন ও স্পর্শন করিতে আসি।"

সুধন্বামাও প্রায় তাঁর দর্শন লাভ করিতেন। বাবার দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে যখন তিনি কেদার-বদরী আদি উত্তরাখণ্ডের তীর্থাদি-

দর্শন করিতে যান, তখনও তিনি তাঁহার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই ভাবেই তাঁহার বিপদে আপদে সেই সুদূর পর্ব্বত-প্রান্তরেও তাঁহাকে বার বার রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় বাবার আর এক জন ভক্ত শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্ম সুধামার সঙ্গে ছিল, সেও অবিরত বাবার কৃপালাভ করিত। পরে কাশীধামে তাঁহার মন্দিরের মধ্যেও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল। যাহা হউক সেই কেদার-বদরীর পথে সুধামা এক বার দস্যুর হস্তে পতিত হন। তাঁহার সব সঙ্গীরা সামান্য অগ্রবর্ত্তী হইলে, সুধামা একাকী কিছু পিছনে পড়িলে, কয়েক জন দস্যু যাত্রীরূপে তাঁহার পিছু লইয়াছিল —তাঁহাকে একাকী পাইয়া, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায় ও পাথর দিয়া তাঁহার মুখে ও মাথায় এমন ভাবে আঘাত করে যে, তাঁহার দাঁতগুলি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়, যন্ত্রণায় তাঁহার কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি থাকে না —তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন; তখন তাহারা তাঁহার টাকাকড়ি যথাসম্বল সমস্তই কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে পাহাড়ের এক নির্জ্জন গুহার মধ্যে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলিয়া দিয়া যায়। তাঁহার সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি সকলেই আগে চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা এ সব কিছুই জানিতে পারিল না। এ দিকে সুধামা একটু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, বাবাকে স্মরণ করিয়া কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বাবা অন্তরে তাহা জানিতে পারিয়া,তখনই তথায় সশরীরে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে ছোট মেয়ের মত পাছালিকোলা করিয়া উপরে লইয়া আসেন ও মুখে জল দিয়া সুস্থির করিলেন। যখন সুধা একটু সুস্থ বোধ করিলেন, তখনই তিনি কোথায় সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। সুধা বাবার এই অলৌকিক কৃপা-ব্যাপারে

একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই মৃত্যুঞ্জয় অতি ব্যস্ততার সহিত অনুসন্ধান করিতে করিতে পথের ধারে তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পায়। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে চটীতে লইয়া যায় ও সেই দস্যুদের অনুসন্ধান করে। বাবার কৃপায় দস্যুরাও যেন হতভম্ব হইয়া সেই চটীর পার্শ্বের এক স্থলে গোপনে বসিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তাহাদের ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। এ কথা সুধামা পরে কাশীতে আসিয়া সকলের নিকটেই ব্যক্ত করেন। মৃত্যুঞ্জয়ও সে কথা এখনও সবিস্তারে বলিয়া থাকে।

বাবা শরীরে ও অশরীরে যখন যাহার প্রতি করুণা করিতেন, তখন সেই মনে করিত যে, তিনি যেন তাহারই হইয়া আছেন। তাঁহার আবির্ভাবে ভক্তবৃন্দ চন্দনের সুগন্ধ অনুভব করিতেন। তাঁহার দেহী অবস্থাতেও এই দৈবী ব্যাপার সকলেই অনুভব করিতেন।

এখনও তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের প্রদত্ত উপচারাদি তিনি আনন্দ-সহকারে মন্দিরে গ্রহণ করেন। কোন কোন বস্তুর জন্য তাঁহাদের প্রতি অন্তর-আদেশও প্রদান করেন। সে কারণ মধ্যে মধ্যে অনেকেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপচারাদি আনিয়া তাঁহার সমীপে নিবেদন করেন। শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ রায় প্রায় নিত্যই আজকাল মন্দিরের পাদপীঠে বসিয়া এই সকল ব্যাপার শ্রবণ ও দর্শন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আশ্রম-কষ্টমোচন।

"বিহারীবাবার" এই মন্দিরটী বা তাঁহার এই স্মৃতি-আশ্রমটীর রক্ষা-কল্পে সাবিত্রীমা প্রভৃতিকে যে, যথেষ্টই কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইং ১৯১৬ অব্দের জুন মাসে এক "বাঙ্গালী বৃদ্ধ বৈদ্য-সন্তান" কাশীবাস করিতে আসিলেন, তিনি ২০শে জুন দশাশ্বমেধের ঘাটের উপর বাবার এই আশ্রম বা মন্দিরটী এবং সাবিত্রী-মায়ের সহিত অন্যান্য মায়েদের অকৃত্রিম ভক্তি-ভাবপূর্ণ 'আশ্রমসেবা' দেখিয়া—তাঁহাদের কার্য্যাবলীর কতক কতক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া, তিনি যেন বিমোহিত হইলেন। তাঁহারও হৃদয়ে অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। তিনি মন্দিরপাদে প্রণত হইয়া, সাবিত্রীমাকেও ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন। তাহার পর নিত্যই ঘাটের ধারে বেড়াইতে আসিয়া তাঁহাদের বিষয় যতই জানিতে পারিলেন, ততই তাঁহার মন সেই মন্দির বা আশ্রমটীর প্রতি যেন অলক্ষ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সঙ্কীর্ণ মন্দিরটীর স্থানটুকু যাহাতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইতে পারে, সেই বিষয়ে অবিরত চিন্তা ও তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশ্রমের প্রতি এই রূপ শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও সাবিত্রীমায়ের প্রতি ক্রমশঃ জননীর ন্যায় ভক্তিভাব দেখিয়া,আশ্রমস্থ

সকলেই তাঁহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনিও আশ্রমের এক জন **অন্তরঙ্গ-সেবক**রূপে পরিণত হইলেন। সাবিত্রীমাও তাঁহাকে যথার্থ সন্তানের ন্যায়ই স্নেহ করিতে লাগিলেন, তিনিও মাতৃচরণ-পূজা করিয়া যেন নিজেকে ধন্য বোধ করিলেন।

তিনি আশ্রমের শ্রী-বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা যে, কত দূর সফল হইবে, সে বিষয়ে সাবিত্রীমার মনে কিছু সন্দেহ হইতে লাগিল। কারণ তিনি ইতোপূর্ব্বে আশ্রমের জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি যেরূপ লাঞ্ছনা-ভোগ করিয়াছেন, তাহা কহতব্য নহে। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এখন যেন নিশ্চেষ্ট হইয়াই বসিয়া আছেন। এরূপ অবস্থায় পুনরায় এই সেবক-সন্তানের নূতন চেষ্টাও পাছে সম্পূর্ণ বিফল হয় ও পরে তাঁহারও মনোস্তাপের কারণ হয়, এই ভাবিয়া তাঁহাকে এক দিন একান্তে ডাকিয়া আশ্রম-সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে তাঁহার পূর্ব্ব-চেষ্টার সকল কথাই বলিলেন।

আজ—১০ই অক্টোবর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ বেলা ৩টার সময় সাবিত্রীমা তাঁহার সেই সেবক সন্তানকে মন্দিরের সমস্ত বিবরণ শুনাইবার জন্য আহ্বান করিলেন: তিনিও যথাসময়ে মায়ের কুটীরে উপস্থিত হইয়া, মায়ের আদেশমত আসন গ্রহণ করিলেন। মা, তখন জানালার নিকটে বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বাবা, এই মন্দিরের স্থানটুকু বাড়াইবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও, এখন একেবারে হতাশ হইয়াছি, আর চেষ্টা করা বৃথা, এই মনে করিয়া এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আর

কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। বাবা, তুমি যদি ইহার জন্য কিছু চেষ্টা কর, তাহা হইলে, এই সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ঘটনা সমস্তই তোমার শুনিয়া রাখা দরকার। তাহার পর যেমন বিবেচনা হয় করিবে।

"প্রথমে 'উনি' (মৌনীবাবা) একটী কাষ্ঠের মন্দিরে থাকিতেন। তাহা পুঁটীয়ারাণীর ও মিউনিসিপ্যালিটীর জমীতেই বসান ছিল।"

পুঁটীয়ারাজ ও মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবহার—"পুঁটীয়ারাণীর কাছে কিছু স্থানের জন্য আবেদন করা হয়। তাহাতে তিনি তিন শত টাকা চাহেন। ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া তাহাই দেওয়া হইবে স্থির করেন। কিন্তু রাজ-সরকার হইতে আদেশ হয় যে, 'সাধুবাবা' যখন মন্দির ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন বা কোথাও হইতে মন্দিরে আসিবেন, তখন সে সংবাদ রাজ-সরকারে প্রদান করিতে হইবে। এই অদ্ভুত 'আদেশ', শুনিয়া, বিশেষ সর্ব্বত্যাগী পরমহংস সাধুকে এই রূপ বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিতে কাহারও প্রবৃত্তি ও সাহস হইল না— তিনি নাঙ্গা-সাধু, তাঁহার আবার বিধি-নিয়ম কি? তিনি 'নগ্ন' বা ন্যাংটা ভাবে ঘাটের উপর থাকিতেন বলিয়া কোন কোন রুচি-বাগীশ বড়লোক রাণীর কর্ম্মচারী ও মিউনিসিপ্যালিটীর লোক-জনের সহিত পরামর্শ করিয়া একযোগে সে মন্দিরও ভাঙ্গিয়া দেন। তিনি তখন 'অসীতে' গিয়া রহিলেন। পরে উমাচরণ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"কাশীতে কি এমন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক নাই যে, সাধুর মর্য্যাদা রক্ষা করেন?" তিনি, বাবু রামমোহন দে উকিল মহাশয়, অন্যান্য কাশীবাসী ভদ্রলোক ও পাণ্ডারা মিলিয়া

উদ্যোগপূর্ব্বক দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর পাকা মন্দির (উপস্থিত মন্দিরের পাদপীঠ ও অন্যান্য আসবাবপত্র) প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নীলরতনবাবু ও সোমনাথবাবু ভিতরে ভিতরে এই রূপ হুকুম লেখাপড়া করিয়া রাখেন যে, ''যত দিন সাধু জীবিত থাকিবেন, তত দিন মন্দির ঘাটে থাকিবে।'' এ বিষয় আশ্রমের লোক কিছুই জানিতে পারিল না। তিনি (পরমহংসদেব) ইং ১৯১২ অব্দে দেহত্যাগ করিলে, মিউনিসিপ্যালিটী হইতে হুকুম আসিল যে, "মন্দির আর থাকিবে না—উহা শীঘ্র উঠাইয়া লওয়া হউক।" যথেষ্ট চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কেহই শুনিল না, অগত্যা মন্দিরের জিনিসপত্র সব তুলিয়া আনিতে হইল। এই সময় দৈবযোগে **পুলিসের বড়সাহেব** (ই, কে, কী) ও তাঁহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ব্বক মন্দিরটী পূর্ব্ববৎ রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া গেলেন। পরে **মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারীসাহেব** এবং তাঁহার লোক জন আসিয়া বলিলেন—"পুলিসের এ বিষয়ে কোন হাত নাই, অতএব মন্দির এখনই সরাইয়া লইতেই হইবে।"

"এই সব অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া আমি যেন নিরুপায় ও সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িলাম। তখন আমি এতই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার মস্তিষ্কও বুঝি ঠিক ছিল না—আমি ক্রমে যেন **উন্মাদিনী ও রণরঙ্গিনী** হইয়া উঠিলাম, আমার মূর্ত্তি তখন যে কি এক ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তাহা আমি নিজেও জানিতে পারি নাই, তখন আমি যথার্থই কি যেন এক অলৌকিক শক্তিপুষ্ট হইয়া একেবারে 'মরিয়া' হইয়া উঠিলাম।

আমি এক খানি বড় 'বঁটী' লইয়া তখন মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দৃঢ় হইয়া বসিলাম, মেয়েদেরও সকলকে তথায় বসিতে বলিলাম। আমার মুখ হইতে তখন দৃঢ়স্বরে বাহির হইল যে, "যাহারা প্রথমে আমার এই মন্দিরে হাত দিবে বা কোনরূপে আমাকে বাধা দিবে —তা সেক্রেটারীই কি, আর কালেক্টারই বা কি,—তাহারই গলা আমি আগে কাটিয়া, পরে নিজের গলা কাটিব, দেখি, কে কি করে? আমি ত একা, আমার প্রাণ এই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য গেলে ক্ষতি কি?"

"এদিকে **কালেক্টারের** নিকটেও এই আশ্রমের ভক্তগণ আবেদন করিয়াছে—যাহাতে এই মন্দিরটী রক্ষিত হয়। উপস্থিত তখন মন্দিরটী পূর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু ভোটে কম হওয়াতে সে আবেদন মিটিংএ না-মঞ্জুর হইল।

"তখন আমি **কমিশনার-বাহাদুরের** নিকট স্বয়ং যাইয়া, মন্দির রক্ষার জন্য কাঁদিয়া পড়িলাম। কমিশনারসাহেবের (ই, এ, মন্‌লী) হৃদয়ে তাহাতে যেন কোন দৈবী প্রভাব হইল, **রাজা মতিচাঁদ** ভাইস-চেয়ারম্যান্‌ও তাহাতে সহায়তা করিলেন। তিনি কমিশনার-সাহেবকে গোপনে বলেন যে, সন্ন্যাসিনী 'মাতাজী'পাগলের মত হইয়াছেন, একে তাঁহার অসাধারণ পতি-বিয়োগ-কষ্ট, তাহার উপর তাঁহার একমাত্র অবলম্বন মন্দিরটীর উপর বার বার এইরূপ অন্যায় অত্যাচার, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছে। উহাঁকে একটু স্থান না দিলে, বোধ হয় বেচারী মারা যাইবেন। যাহাতে উহাঁর পতির স্মৃতি-মন্দিরটী রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু যত্ন করুন। ইত্যাদি।"

"কমিশনার-সাহেব তখন কালেক্‌টার-সাহেবকে বলিলেন—ঘাটের উপর ছাড়া, না হয় আর কোথাও একটু স্থান মাতাজীকে দেওয়া হউক। তদনুসারে কালেকটার কোন উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কোথাও বেশ মনোমত স্থান যোগাড় হইল না। দুর্গাবাড়ীর নিকট এক ভক্তের স্থান ছিল, কিন্তু সম্মুখের স্থান দিতে না চাওয়াতে,তাহা লওয়া হইল না। কি বলিব বাবা, 'তিনি' থাকিতে যে সব লোক সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা-ভিখারী হইয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে পড়িয়া থাকিত, তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর হইতে, তাহাদের অধিকাংশই ক্রমে আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করিল। কেহ কিছু বলিলে, তাহারা বলিত,—"তিনি হৃদয়ের ধন হৃদয়েই আছেন ইত্যাদি"। যাহা হউক এমন মহাপুরুষের স্মৃতি-কীর্ত্তি যে, সকল সন্তানেরই রাখা কর্ত্তব্য, তাহা স্বার্থপর-জগৎ স্মরণ রাখিতে পারে না। পাপের প্রবল প্রবাহে কৃতজ্ঞতা এ সংসার হইতে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাক্ সে সব কথা,—আমার হৃদয়-দেবতা, বল-ভরসা একমাত্র তিনিই, তাঁহারই পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি স্ত্রী-উপাধিযুক্ত হইয়াও, তাঁহারই স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষার জন্য এতটা করিতে সাহস পাইয়াছি। নতুবা আমি অন্তঃপুরের কুল-বধূ, কেহ কখনও আমার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আজ আর আমার লজ্জা-সরম কিছুই নাই, তিনিই আমার লজ্জা, তিনিই আমার সরম! বাবা, তিনি আমায় অন্তর-আদেশে যাহা করাইবেন, আমি তাহাই অবলীলাক্রমে করিয়া যাইব। আমি আর কোনও চিন্তা করি না।

"অনন্তর এই ভাবে বহু চেষ্টার পর, মিউনিসিপ্যালিটী হইতে উপস্থিত এই স্থানটুকু লওয়া হইয়াছে। তাঁহারা দয়া করিয়া এই

স্থানটুকু বিনামূল্যেই দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে, পাছে কোন গণ্ডগোল হয়, ভাবিয়া সকলের পরামর্শে আট ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া স্থান পঞ্চাশ টাকায় লওয়া হয়। স্থান-সম্বন্ধে এইরূপ লেখাপড়া হইল যে, উহা মন্দিরের কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

কোন কোন লোকের **কুমন্ত্রণায় সেক্রেটারী সাহেবও** প্রথম প্রথম আশ্রমের লোককে নানা প্রকারে কষ্ট দেন, সে কারণ তাঁহাকেও বহু কটু-কথা এবং মন্দ-ব্যবহার কাছারীতে বসিয়াও সহ্য করিতে হইয়াছে। যখন তিনি এই নূতন স্থান দেখিতে আসেন, তখন আমি তাঁহার মুখের উপর স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে,—"দেখুন, আপনি সরকারের চাকর মাত্র, আজ আছেন, কাল নাই; এ জমি-জায়গাও আপনার নয়, তবে কেন বৃথা আশ্রমের লোককে এই ধর্ম্ম-কাজে বাধা দেন?" তিনি বলিলেন—"কতকগুলি লোকে কালেক্‌টারের নিকট যাইয়া বলেন যে, এই মন্দির উঠাইয়া দেওয়া উচিত, সেই জন্য তাঁহার হুকুম মতই আমরা কাজ করি।" তখন আমি বলিলাম—"পরের মুখে ঝাল না খাইয়া, নিজেই দেখিয়া কাজ করিলে ত কোন গণ্ডগোল হয় না। তুমি মনে করিওনা যে, সাধু-সন্ন্যাসীকে বৃথা কষ্ট দিলে, কাহারও মঙ্গল হবে? ভগবান দুষ্টের-দমন আর শিষ্টের-পালন ঠিক 'নিক্তির' ওজনেই করে থাকেন।"

সুধন্বা নিকটে ছিল, সে রাগের মাথায় কিছু অপ্রিয় কথায় * * * গালাগালি দিয়াও ফেলিল। সেক্রেটারী বলিলেন—"আপনি সব ছাড়িয়াছেন, কিন্তু 'মুখ' ঠিক করিতে পারেন নাই।" উত্তরে আমি তখন বলিলাম—"উহা কেবল তোমাদের মত দুষ্ট-দমনের

জন্যই আমরা রাখিয়াছি।" সেক্রেটারী এই কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

তখন মাহেশ্বরী ও অন্যান্য মেয়েদের তাঁহার নিকট পাঠাইয়া অনেক করিয়া মন্দিরের পিছনের দেওয়ালটুকু দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি উহাতে মত দিলেন না। সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া, ব্যর্থ হইল দেখিয়া, এখন এক প্রকার নিরুপায় ও নিশ্চিন্ত হইয়াই বসিয়া আছি।"

এই আশ্রমের স্থান-সংগ্রহ ও ইহা স্থাপনের জন্য সাবিত্রীমাকে যে কত ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নয়। বাস্তবিক যিনি উচ্চবংশীয়া ও অন্তঃপুরবাসিনী কুলবধূ, আজ তিনি ভিখারিণী ও পাগলিনীরূপে সকলের সহিত যে ভাবে দেখা-শুনা, অনুনয়-উপরোধ, প্রার্থনা-ক্রন্দন, সাধ্য-সাধনা, পরিশেষে অপ্রিয় ভাষায় তর্ক-বিতণ্ডা পর্য্যন্তও করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা যথার্থই তাঁহার পক্ষে স্বপ্নাতীত ও অসাধারণ বলিতে হইবে। এইরূপ কত করিয়াই যে, তিনি এই দেব-কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা কেই বা লক্ষ্য করিয়াছে?

আহা, সাবিত্রীমা ও সুধন্বা এই কার্য্যোপলক্ষে কতদিন যে, অনাহারে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সারাদিন হাঁটিতে হাঁটিতে প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ, পরিশ্রান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়াছেন, সর্ব্বদা একাগ্র ভাবে এই ধর্ম্ম-কার্য্যে উভয়েই একলক্ষ্য করিয়া, অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিয়া 'তাঁহার' চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, কত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, কেবল চিরশান্তিময়ী গঙ্গার বক্ষে অবগাহন মাত্র করিয়াই অনাহারে শান্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা আর কে দেখিয়াছে? সকল কার্য্যেই সেই একমাত্র দ্রষ্টা, ভগবান—

'তিনিই,' যাঁহার স্মৃতি-মন্দিরের উদ্দেশে এই জীবনপণ আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন। তিনি নানা রূপে ইহাঁদের ঘোর পরীক্ষার পর তবে এই শান্তি দিয়াছেন। তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ইহাঁরা আজ যেন ধন্য হইয়াছেন।

সাবিত্রীমা তাঁহার সেই ভক্ত-সন্তানকে এই সকল ঘটনার কথা সবিস্তারে বলিলেন। তিনিও মায়ের মুখে সকল কথা শুনিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন ও শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা জানিয়া বলিলেন—"মা, কাহার দ্বারা কখন কি কাজ হয়, তিনিই জানেন। বাস্তবিক, এই জন্যই লোকে বলে—বিনা কষ্টে শ্রীকৃষ্ণধন লাভ হয় না। আপনার এই অদ্ভুত কার্য্যই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নারায়ণের কৃপাই আমার সম্বল।"

মা পুনরায় বলিলেন—"ইহাতে আর কতদূর কি যে সুবিধা হইবে, তা বুঝিতেছি না, তবে তুমি এখন যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর।"

তিনি বলিলেন—"মা, ভগবৎ কৃপা যে কখন কার উপর কি ভাবে পতিত হয়, কে বলিতে পারে? তাঁহার নাম লইয়া, তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আর এক বার চেষ্টা করিয়া দেখাই যাক্, তাঁর কাজ তিনি ত নিজেই করিবেন, আমরা কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র! নতুবা কে 'মা,' কাহার 'ছেলে,' কেই বা বাঁধিল এমন স্নেহ-সূত্রে,—নারায়ণ ভিন্ন আর কেই বা তা জানেন মা?"

মন্দির-প্রস্তুত সম্বন্ধে মা বলিলেন—"মন্দিরের নিম্ন অংশটা" কাশীর প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাকটার সারনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁহার পিতা মাতার স্মরণার্থ" নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শ্বেতপাথরের আসন ও মন্দিরের দ্বার-জানালা, বাবু ললিতচন্দ্র বসু পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। মন্দিরের উপরের পিতলের কাজগুলি, সমস্তই বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ দিয়াছিলেন। এই সমস্ত একত্র মিলাইয়া মন্দিরের উপরের অংশটী প্রস্তুত হইয়াছে।"

ইহাঁদের এইরূপ সহায়তা দ্বারা যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে সাধারণের নিত্য দর্শনীয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ভগবান ভক্তগণের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল-বিধান করুন।

মূর্ত্তি-স্থাপনার বিষয়েও মা বলিলেন—"তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিলেন যে, তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। সকলের বিশেষ আগ্রহে সুধ-ন্বাকে অবলম্বন করিয়া কাজে হাত দিলাম। উভয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। সুধাই, নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। রমেশবাবু (ফটোগ্রাফার) দুই শত টাকা লইয়া জয়পুর হইতে মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবার জন্য যাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না, কেবল খরচান্ত সার হইল। আর এক জনও দুই শত টাকা মূর্ত্তি-প্রস্তুতের জন্য লইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি আর কোনও হিসাব পর্যন্ত দিলেন না। পরে **মহাবীর মিস্ত্রীর** সহিত স্থির হইল যে, সে পাঁচ শত টাকায় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিবে। দুই বৎসরে উহা প্রস্তুত হইল। এত অধিক দিন বিলম্ব হওয়ায়, চাঁদা-দাতাগণ ভাবিলেন, টাকা বুঝি আমরা খাইয়া ফেলিয়াছি। মিস্ত্রীকে এই সব বলিয়া ক্রমাগত তাগাদা করায়, শেষে একটু শীঘ্র করিয়া সে কার্য্য শেষ করিয়া দেয়। এই সময় এমন কিছু দৈব-ঘটনা ঘটে,

যাহাতে মিস্ত্রীও ভীত হইয়া উহা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া দিতে বাধ্য হয়।

মূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে, আশুতোষবাবু পঁচিশ টাকা মাত্র লইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক মূর্ত্তিটী মন্দিরে বসাইয়া দেন। অন্যে অনেক টাকা চাহিয়াছিল।

মন্দিরের সিঁড়ির জন্য, আর দেওয়ালে ঘোড়িয়া (পাথরের ব্র্যাকেট) লাগাইয়া মন্দিরের স্থান একটু প্রশস্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা-চরিত্র করা হইল। কিন্তু তাহার সমস্তই নিষ্ফল হইল। যখন পুঁটিয়ার রাণী কাশীতে আসেন, পরে চলিয়া যান, তখনও চেষ্টা হয়। সেক্রেটারীর বিশেষ ধৈর্য্য ও সহ্য গুণের ফলেই এবং তাঁহারই দয়ায় আশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি নিজে সৎব্যক্তি হইলেও, নানা অপরিহার্য্য কারণে, কিছু কিছু গণ্ডগোল হইয়াছিল। যাহাই হউক তাঁহার প্রশংসা না করিলে অন্যায় হয়। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।"

"**তাঁহার চিত্র** সম্বন্ধে—বরিশাল নিবাসী বাবু মতিলাল ঘোষ অতি যত্ন সহকারে দুই খানি অয়েল-পেন্টিং চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রভুর ভক্ত ছিলেন, সে কারণ তাঁহাকে মূল্য কিছুই দিতে হয় নাই, কেবলমাত্র রং ও মশলাই দিতে হইয়াছিল। তাহার এক খানি আশ্রমে (মন্দিরে), আর এক খানি এই কুটীরে রক্ষিত হইয়াছে।"

"**মন্দিরের প্রতিষ্ঠা**-সংস্কার—ইং ১৯১৫ অব্দে—বাঙ্গালা আশ্বিন মাসে রবিবার, নবমী (বিজয়া) সংক্রান্তির দিন—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাবিধি সংস্কারপূর্ব্বক দেবতার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। তদুপলক্ষে যথাসম্ভব দক্ষিণাদি,

ব্রাহ্মণ ও ভক্তবৃন্দের সেবা ভোজনাদিরও বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, সমস্তই তাঁহার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এতদুপলক্ষে শ্রীমতী **দক্ষিণাদেবী** (বাবার প্রথমা স্ত্রী) ও **বসন্ত কুমারী** (মধ্যম ভ্রাতৃজায়া) **দেবীও** উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহের সহিত সকল কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।"

মন্দিরাদি স্থাপনের আয় ব্যয়—এই কার্য্যে অতি কষ্টে অর্থ-সংগ্রহ হইয়াছিল। নিম্নে তাহার একটী হিসাব প্রদত্ত হইতেছে।

জমা——	খরচ——
দেশ হইতে প্রাপ্ত ৫০০৲	জমীর মূল্য—৫০৲
বসন্তকুমারী দেবী ২০০৲	মূর্ত্তির মূল্য—৫০০৲
কাশীবাসীর চাঁদা ৩০০৲	মূর্ত্তি আনিবার জন্য—৩০৲
	পূজাদির খরচ—৬০৲
জমা মোট ১০০০৲	খরচ মোট ৬৪০৲

বাবু কুলদীপ সিংহ মন্দির ও মকদ্দমা আদিতে বিশেষ সাহায্য করেন। তাহার মারফত মকদ্দমার খরচ বাবদে —৩৬০৲

মোট খরচ ১০০০৲

উকিল ও অন্যান্য মহোদয় গণের সহায়তা না পাইলে, আশ্রমের কার্য্য সুসম্পন্ন হইত না। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

বাবু রামমোহন দে—ইনি কাশীর প্রধান উকিল, আশ্রমের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছেন। সময় সময় নিজ হইতেও ব্যয়াদি করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ রায়—ইনি প্রথমে না জানিয়া এক বার ওকালতীর পারিশ্রমিক লইয়াছিলেন, পরে আশ্রমের পবিত্র কার্য্য জানিয়া দুঃখপ্রকাশ করেন, পরে আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

বাবু রজনীকান্ত দত্ত ও মথুরাপ্রসাদ—ইহাঁরাও বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করেন।

সেবক ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আশ্রমের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও নানা প্রকারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। 'ঠাকুর' অবশ্যই ইহাদেরও কল্যাণ-বিধান করিবেন।

১। মিঃ ই, এ, মনলী—কমিশনার বাহাদুর; ২। মিঃ সি, এ, সি, ষ্ট্রেটফিল্ড—কালেক্টার সাহেব; ৩। মিঃ ইঃ, কে, কী—পুলিস-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট; ৪। এ, সি, মুখার্জী—মিউনিসিপ্যাল-সেক্রেটারী; ৫। অনারেবল রাজা মতিচাঁদ—মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান; ৬, গোস্বামী রামপুরীজী—মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; ৭। বাবু সত্যনারায়ণ—মিউনিসিপ্যালিটীর, ৮। রামমোহন দে—উকিল; ৯। ভূপেন্দ্রনাথ রায়—উকিল; ১০। রজনীকান্ত বাবু—উকিল; ১১। প্রমদাচরণ বাবু—উকিল; ১২। সারনাথ সান্ন্যাল—কণ্ট্রাক্‌টার, ১৩। উমাচরণ কবিরত্ন—কবিরাজ; ১৪। প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—পেন্‌সনার্; ১৫। ললিতচন্দ্র বসু—জমীদার; ১৬। শরচ্চন্দ্র ঘোষ—জমিদার; ১৭। মতিলাল ঘোষ—আর্টিষ্ট; ১৮। মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্ম—সেবক; ১৯। মহাবীরলাল—ভাস্কর; ২০। বলভদ্র পাণ্ডা—ঘাটের পাণ্ডা; ২১। গিরীশচন্দ্র নিয়োগী—ভক্ত; ২২। রসিকলাল গাঙ্গুলী—ভক্ত, ২৩। কুলদ্দীপ সিংহ—সেবক; ২৪। বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য—পুরোহিত; ২৫। কাশীনাথ বাবাজী—নাগা সন্ন্যাসী (পূজারী ও আরতিকারী)।

আশ্রমের মহিলাসেবিকাবৃন্দ—শ্রীমতী দক্ষিণা-দেবী, বসন্তকুমারীদেবী, রামতারাদেবী, মাহেশ্বরীদেবী; রণরঙ্গিনী-দেবী, কুলদাসুন্দরীদেবী, লক্ষ্মীসুন্দরীদেবী, ভুবনমোহিনীদেবী, কৃপাময়ীদেবী, এবং সুধন্বামাতা সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি। ইহাঁরা সতত আশ্রমের আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেন ও একান্ত সেবা করিয়া থাকেন। নারায়ণ ইহাদের সার্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-বিধান করুন।

আশ্রমের উদ্দেশ্য—পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর কাশীবাসী সকলেই বলিলেন—"কলিকালের জীবের পক্ষে অসাধ্য-সাধন" যাহা তিনি প্রত্যক্ষ আদর্শরূপে সকলকে দেখাইয়া যাইলেন, তাঁহার সেই অসাধারণ 'স্বরূপ' লোক-শিক্ষার জন্য ও তাঁহার স্মৃতি-সম্মানার্থ অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।" সেই উৎসাহ-বাক্যে সাবিত্রীমা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ একমত হইয়া পূর্ব্বকথিত ভাবে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহারই সেই অলৌকিক ভাব-দৃষ্টে, সাধন-শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ ও উপাদান-মাত্র। এই স্থূল মূর্ত্তি দেখিয়াই, যাহাতে ক্রমে জীবের সেই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতীত ভাব-মূর্ত্তির স্বরূপ উদ্বোধিত হয়, সেই আশাতেই এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি-সমন্বিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি যে ভাবে আসক্তি-বিরক্তি-বর্জ্জিত হইয়া, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া-ছিলেন, তাঁহার ভক্ত, সেবক ও দর্শকগণ তাঁহার ঐ স্থূল মূর্ত্তি অব-লম্বন করিয়া, স্থূল ভাবেই তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া, ক্রমে সেই অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দময়ের অক্ষুন্ন আনন্দ-সত্তায় উপনীত হইতে পারেন. এই আশাতেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথার্থ সাধনাভিজ্ঞ গুরুদেবের সিদ্ধ উপদেশ লাভ করিয়া, তাঁহারই ন্যায় অদম্য-সাধনায় সকলে অগ্রসর হও, অবশ্যই শান্তি ও সিদ্ধি

লাভ করিতে পারিবে। এই আশ্রম সেই কথাই যেন সতত অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিতেছে। আর এই উদ্দেশ্য যাহাতে চিরদিন অতি পবিত্রভাবে রক্ষিত হয়, সেই চেষ্টাই আশ্রমের সেবক ও ভক্তবৃন্দ অহরহঃ কামনা করিতেছেন। তিনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আশ্রমের সেবা—এই আশ্রমের কোন স্থায়ী আয় নাই, ভক্তগণের প্রদত্ত যৎসামান্য পূজা ও দানেই ইহাঁর সেবাকার্য্য কোন রূপে পরিচালিত হইতেছে। সাবিত্রীমা কোন দিন কাহারও নিকট কিছুই ভিক্ষা প্রার্থনা করেন না। সে কারণ প্রথম প্রথম কোন রূপে এক আধ পয়সার মটর ভিজাইয়াই, তিনি ঠাকুরের সেবা দিয়াছেন। পরে ভক্ত-সন্তানেরা জানিতে পারিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে থাকেন। ক্রমে সেই অভাব দূর হইতে লাগিল—এক্ষণে মাসিক পনর-কুড়ি টাকা আয় হইতেছে, সুতরাং সেবা-কার্য্য কোনরূপে চলিয়া যাইতেছে।

প্রত্যুষে ঠাকুরের মুখপ্রক্ষালনাদি ও বাল্য-ভোগ হয়। তাহার পর স্নান, পূজাদি ও মধ্যাহ্ন-ভোগ দেওয়া হয়। বৈকালেও স্নান, বৈকালী-জলপান, পরে সন্ধ্যায় শীতল-আরতি আদি যথাবিধি সম্পন্ন হয়। নিত্য আরতি-কার্য্য বাবার সেই ভক্ত কাশীনাথ বাবাজীই (নাগা সন্ন্যাসীই) সম্পন্ন করিয়া যান্। অনন্তর প্রভুর বিশ্রামের জন্য শয্যাদি রচনাপূর্ব্বক মন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের প্রদত্ত পূজা-অর্চ্চনা ভোগদান সমস্তই ভগবান গ্রহণ করেন। এ স্থলে তিনি ত নিত্য বিরাজমান আছেন। এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ভক্তের তৃপ্তিতেই তাঁহার তৃপ্তি। পক্ষান্তরে ভক্তের ভক্তিমার্গ ইহা দ্বারা ক্রমে সরল ও উন্নতমুখী

হইয়া উঠে, আত্মা পবিত্র ও তন্ময়তা লাভ করে। জীবের আত্ম-নির্ভরতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অভ্যাস এই ভাবেই পরিপুষ্ট হয়। নতুবা একেবারে সেই অশরীরী, অব্যক্ত, নাম-রূপাতীত বস্তুর উপলব্ধি কিছুতেই হইতে পারে না। তাই ঋষি-নির্দ্দিষ্ট সাধন-পন্থায় ভাবময় "নাম-রূপাত্মক" বৈধী-ভক্তিমূলক এই বাহ্য-পূজাদি-সমন্বিত মন্ত্র-যোগই প্রথমে সকলের অবলম্বনীয় ও অনুকরণীয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদের প্রচারক ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন—

"মূর্ত্ত্যামূর্ত্তং উভয়াত্মকং ব্রহ্ম॥"

অর্থাৎ মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তিরূপে ব্রহ্ম উভয়াত্মক, এইরূপ ঐক্যবাদী-কেই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী বলে। অতএব সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপে পঞ্চ-দেবতা তথা মহাপুরুষের-মূর্ত্তিও দ্বেষ-রহিত হইয়াই ব্রহ্মার্চ্চনা কর, যথেচ্ছা-চার বিধির নিষেধ কর। তিনি সেই কারণেই শিষ্যগণকে সাকার-পূজারও উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন যথা—

"নাপ্রামাণ্যং সাকার-প্রতিপাদক শ্রুতিনাং।"

অর্থাৎ সাকার-প্রতিপাদক শ্রুতি-সকল অপ্রামাণ্য নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অধুনা সকলেই প্রায় শুষ্ক বৈদান্তিক; এই পবিত্র কাশীধামে বাস করিয়াও, অনেক হতভাগ্য "বিশ্বনাথ" দর্শন করে না! তাহারা ওটী একটী "পাথরের পিণ্ড" মাত্র বলিয়া উপেক্ষা-পূর্ব্বক কেবল নিজেদের ভ্রান্ত অদ্বৈত-জ্ঞানেরই পরিচয় দেন। যিনি সর্ব্বব্যাপী সকলের মধ্যে বিদ্যমান, তিনি কেবল তাহাদের ঐ ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে ঐ বিশ্বনাথরূপী শিলা-পিণ্ড হইতে পৃথক হইয়াই যেন অদ্বৈত-সত্তায় বিরাজ করিতেছেন। হায়, হায়! যাহার সেই অদ্বৈত জ্ঞান হইবে, সে প্রতি কঙ্করেই যে, শঙ্করের অনন্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবে? সারা সংসারই যে, অসংখ্য মূর্ত্তিরূপে তিনিই বিরাজিত রহিয়াছেন!

তাহার পক্ষে বিশ্বনাথের বা যে কোন শিবাদি মূর্ত্তির মধ্যে প্রস্তরাদি স্থূল-পদার্থ মাত্র দৃষ্টি হইবে কেন? "স্থূল-ব্যাপীয়াই যে সূক্ষ্ম আছে, স্থূল-ধরিয়া যাও তাঁরই কাছে।" বিশ্বাস ও ভক্তিপুষ্ট অন্তরে ইষ্ট-গুরুর এই ভাবের পূজার্চ্চনায় ক্রমেই সাধক সেই অদ্বৈত-সত্তায় উপনীত হইতে পারেন। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রায় সকল দেবতারই সকল নদ-নদী ও তীর্থরাজেরই স্তব-স্তুতি রচনা করিয়া, তাঁহাদের অদ্বৈত-ভাবে অর্চ্চনাপূর্ব্বক জগতের অভ্রান্ত উপাসনা-ক্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন!

যাহা হউক ভক্ত সন্তান সকলেই তাঁহার কৃপার ভিখারী। তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাঁহার এই ভাবে সেবার্চ্চনায় ভক্তের যে তৃপ্তি-লাভ হয়, তাহা অভক্ত-নাস্তিকের সম্পূর্ণ অনধিগম্য!

মন্দিরে যখন যেমন আয় হয়, সেই ভাবেই প্রভুর সেবায় ব্যয় হইয়া থাকে, কিছুই সঞ্চয় করা হয় না। আশ্রমে কোন নিযুক্ত দাস দাসীও নাই। প্রথম অবস্থায় শ্রীমতী মাহেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী ও সুধন্বামাই অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে ঠাকুর, মাতাজী ও মন্দিরের সেবা করেন। উপস্থিত শ্রীমতী রণরঙ্গিণী, কুলদাসুন্দরী ও লক্ষ্মীসুন্দরী মায়েরাই একান্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে আশ্রমের সেবা করিয়া থাকেন।

বাবার স্মৃতিমন্দিররূপ এই আশ্রমটী কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। মূলতঃ ইহা কাশীবাসী ও বঙ্গবাসীর দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে কাশীবাসী সকলেরই কল্যাণপ্রদ সাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং সকলেরই কায়মনবাক্যে ইহা রক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহার কৃপায় সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেবক সন্তান।

হুগলী জেলায় ত্রিবেনী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়ের জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীমান্ * * * রায়ই পূর্ব্বকথিত 'সেবক-সন্তান' বলিয়া পরিচিত। ইনি কাশীর সর্ব্বজন পরিচিত সিদ্ধ মহাত্মা "ঝোলাবাবার" শিষ্য। এই প্রসঙ্গে উক্ত মহাত্মারও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি।

ঝোলাবাবাঃ—কাশীধামের এক জন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ। বহু দিন পূর্ব্বে তিনি পশ্চিমের এক সন্ন্যাসীর আখড়া হইতে কাশীধামে আসিয়া, তাঁহার এক গুরুভাইয়ের সহিত এ খানে নিজ সাধন-ভজন করেন। তাঁহার সেই গুরু-ভাইয়ের আশ্রমটী কাশীর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'শঙ্খধারা' মহল্লায় অবস্থিত ছিল। পরে তিনিই সেই আশ্রমের একমাত্র অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন কাশীতে প্রথমে আসেন, তখনই তিনি সেই আশ্রম মধ্যে স্বহস্তে একটী নিম্ব বৃক্ষ রোপন করেন। উহা কালে বিশালকায় হইলে, উহারই একটী শাখায় দোল্‌না ঝুলাইয়া, তাহাতেই তিনি সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন এবং পরমানন্দে আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া যেন আনন্দ-দোলায় বসিয়া দোল খাইতেন। ভক্ত ও সেবকগণ তাঁহার সেই অবস্থাতেই তাঁহার চরণ-পূজা করিত। সর্ব্বদা এই ভাবে অবস্থান-হেতু তিনি ক্রমে "ঝোলাবাবা" নামেই পরিচিত হইয়া যাইলেন। তিনি যথার্থই এক জন পরম ভক্ত সাধু ও সিদ্ধ

মহাত্মা ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার ন্যায় এরূপ তন্ময় মহাপুরুষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরাও কিছুদিন এই শক্ষ্ধারায় অবস্থান কালে, তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়াছি। কাশীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীমান্ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায় এবং কাশীবাসী বহু নর-নারী তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য-সেবকরূপে সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন, সকলে তাঁহার সদালাপ ও উপদেশসমূহ শুনিয়া মোহিত হইতেন। তাঁহাকে সকলেই সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিতেন। তিনিও অতীব স্নেহ ও বাৎসল্য ভাবে সকলের প্রতিই কৃপা করিতেন। আমাদের বিহারীবাবার ন্যায় তিনিও সতত দিগম্বর হইয়াই অবস্থান করিতেন। তিনি দয়া ও প্রেমের যেন আকরস্বরূপ ছিলেন। যখন তিনি রামায়ণের উপাখ্যান-অংশ লইয়া বা কোন রূপ ধর্ম্ম-কথা কহিতেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন গঙ্গা-যমুনারূপ ধারা বহিতে থাকিত। অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও তখন বিগলিত হইয়া যাইত। তাঁহার সেই পবিত্র স্বর্গীয় ভাব বাস্তবিক বর্ণনাতীত।

ঝোলাবাবা প্রত্যেক সোমবারে সেই আশ্রমের দ্বারে বসিয়া অতি স্নেহ-ভরে সকলকেই ছোলা ও গুড় প্রদান করিতেন। ভক্ত-বৃন্দ তাঁহাকে যে সকল প্রণামী প্রদান করিত, তাহা কিছু একত্র হইলেই, তিনি 'ভাণ্ডারা' (সাধুভোজন) করাইয়া দিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিয়া কখনও রাখিতেন না।

বিগত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন স্নানযাত্রার দিন উক্ত সেবক-সন্তানের গুরু-কৃপা লাভ হয়, দুই বৎসরমাত্র তাঁহার সেবার পর ইং ১৯২০ অব্দে অত্যন্ত বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন বাবাজী মহারাজ পড়িয়া গিয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন। হাতের বেদনায় বিশেষ কষ্ট

বোধ করিলেও, তিনি রাত্রিতে কাহাকেও নিজের কাছে থাকিতে দিতেন না। তিনি স্থানান্তরে কোথাও যাইতেও চাহিতেন না, একান্তে থাকিতেই সর্ব্বদা ভালবাসিতেন।

কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। কয়েক দিনমাত্র সেই জ্বর-ভোগ করিয়া, কথা কহিতে কহিতে গত ১৯শে জুলাই ইং ১৯২০ অব্দে দিবাভাগেই সহসা সকলের সমক্ষে বসিয়া অন্তিম-সমাধি গ্রহণ করিলেন। তখন সকলেই তাঁহার এই রূপ অসাধারণ দেহত্যাগ-জনিত অভাবে হা-হুতাশ করিতে লাগিল।

তাঁহার ভক্ত, শিষ্য ও সেবকমণ্ডলী তখন মহাসমারোহে তাঁহার-অন্তিম ক্রিয়া সমাপনার্থ কেদারঘাটে তাঁহার সেই পরিত্যক্ত দেহমন্দিরটী লইয়া যাইলেন ও শ্রীশ্রীগঙ্গামাতার সুশীতল ক্রোড়ে "শিব শিব মহাদেব" বলিয়া তাঁহাকে সমাহিত করিলেন।

অনন্তর তাঁহার আশ্রমে তাঁহারই রোপিত সেই প্রিয় নিম্ব-বৃক্ষের পার্শ্বে একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্য গুরুদেব মহেশ্বরস্বরূপ একটী মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগ-কালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ১২৫ বৎসর হইয়াছিল। শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলিয়া এখনও তাঁহার স্মৃতি-পূজায় আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

তাঁহারই অন্যতম শিষ্য আমাদের সেই "সেবক-সন্তান" (পূর্ব্বে সাবিত্রীমাতার সহিত কথোপকথন উপলক্ষে সে কথা বলা হই-য়াছে) এক্ষণে তিনি আশ্রমের অবস্থার বিষয় সম্যক্‌রূপে সমস্ত অবগত হইয়া, মিউসিপ্যালিটী হইতে আরও কিছু স্থান সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হইলেন। অতি কষ্টে পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার

চেষ্টার পর কিছু স্থান সংগ্রহ হইলে, নিজ অর্থেই তাহার উপর মন্দিরের সম্মুখ ভাগ কিছু বাড়াইয়া, তাহার উপরে ঘর করাইয়া দিলেন। উহার নাম "**মৌনীবাবা-সিদ্ধাশ্রম**" রাখা হইল এবং "**সাবিত্রীপ্রবাস**" নামে মায় সিঁড়ি, রোয়াক ও পার্শ্বে উপর নীচে দুইটী ছোট ছোট কুটুরী করিয়া দেন। উহার উপরাংশ সমস্ত এক সঙ্গেই খিলানে গাঁথা—উহাতে "**কাল-মাধব**" নামে একটী (শিবলিঙ্গ) মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। এই কার্য্য ইং ২২শে ডিসেম্বর ১৯১৯ অব্দে সম্পন্ন হয়। সাবিত্রীমা ও অন্যান্য মায়েরা বাবার পূজার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিবেরও সেবা-পূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সেবক সতত অতীব বিনীত হইয়া বলেন ও প্রার্থনা করেন—"যিনি দয়া করিয়া এই সমস্ত সম্পন্ন করাইয়াছেন, তিনিই চিরদিন ইহা রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই নূতন কার্য্যের জন্য ভূমি-সংগ্রহ করিতে তাঁহাকেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেই কারণ মিউনিসিপ্যালিটীর এক্‌জিকিউটিভ্-অফিসার্, মেম্বর ও চেয়ার্-ম্যানের কত যে,খোসামুদি, কত দিন অনাহারে যেন ঠাকুরের কাছে 'হত্যাদিবার' ন্যায় পড়িয়া থাকিয়া, সেই সঙ্গে সাবিত্রীমাকেও সময় সময় সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের অবসর সময়ে,কোন রূপে সাক্ষাৎ করিলেন ও কত ভাবে আবেদন ও অনুনয়-বিনয় করিয়া, পরে রাজা মতিচাঁদের সুপারিসে তিনি যেন কিছু কিনারা করিতে পারিলেন। তখন রাজাসাহেব, মুখার্জ্জীসাহেবকে সঙ্গে করিয়া মন্দির-পার্শ্বস্থ স্থান দেখিতে আসেন। তাহার পর তাঁহারা মন্দি-রের সম্মুখে আট ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং গঙ্গার দিকে মন্দি-

রের সংলগ্ন ৫½ ফুট লম্বা ও ৫´ ফুট চওড়া স্থান কৃপা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া যাইলেন। যাঁহার কার্য্য তিনিই করেন, তাঁহার কৃপা ব্যতীত পূর্ব্বে যাহা সকলেই অসম্ভব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আজ তাহা এ ভাবে সম্ভব হইবে কেন? যাহা হউক ভগবদ্ ইচ্ছায় সেবক-সন্তানের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল।

সঞ্চয়—সাবিত্রীমায়ের কোন একটী সেবক তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে,—"মা, কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, কারণ সময় সময় বাবার সেবার অনটন্ পড়িয়া থাকে। তাহাতে মা বলেন—'দেখ বাবা, সঞ্চয় করিবার বাসনা ভীষণ অনর্থের মূল। যাঁহার কার্য্য 'তিনিই' তাহার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন। তিনিই তাঁহার 'উপদেশ-বাক্যে' সে কথা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন।"

বাস্তবিক 'অতীতের স্মৃতি', 'ভবিষ্যতের আশা ও কল্পনা' এবং 'বর্ত্তমানের বিচার-বিবেচনা' দ্বারাই জীব ভব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 'সঞ্চয়-বুদ্ধি তাহারই পোষক ও সহায়ক, তাহার চিন্তা থাকিতে জীব কোন কালেই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অতএব এই অনর্থের মূল সঞ্চয়-বুদ্ধি হইতে দূরে থাকাই মুমুক্ষু জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। "দৈব-ইচ্ছায় সকলই সম্ভব হয়।" "দৈব বল হইতে শ্রেষ্ঠ বল নাই।"

আমাদের সেবক-সন্তানটী বেশ ভক্তিমান ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন, বেশ শান্তি ও আনন্দপ্রিয় এবং সদালাপী। ঈশ্বর-নির্ভরতা যে তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই সে বেচারা প্রায় বলেন—"হরি হে, [illegible] তোমার লীলা; তুমি ধর্ম্ম-পথ এমনই করিয়া কাঁটায় [illegible]জঙ্গে ঘিরিয়া, আগুনে ঢাকিয়া রাখিয়াছ। কাহার সাধ্য উহাতে সহজে পদার্পণ করিয়া

অগ্রসর হয়? আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক উহাতে না পড়িলে, কোন উপায়ই হয় না। দয়াময়, যে কুল-ললনা অসূর্য্যম্পশ্যা, আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিতা, তাঁহাকেও তুমি কত কৌশলে মুমুক্ষুর পথে তাঁহার অভিমানাদি বিনাশের কারণ, লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরাইয়া অদ্বৈত-সিদ্ধির সহায়তা করিলে, তাঁহার চিত্তে সাম্যভাবের নিৰ্ম্মল প্রভাব প্রকাশ করিলে। প্রভু, তুমি অসহায়ের সহায়, নির্ব্বলের বল, অনাশ্রিতের আশ্রয়, এই অভ্রান্ত-সত্যে বিশ্বাসের পথ বিচিত্র-ভাবে খুলিয়া দিলে। তাঁহার অষ্ট-পাশ মুক্ত করিবার জন্য সকল উপায় তুমিই করিয়া দিলে। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে নানা বিঘ্ন বাধা, তুমিই দেখাইলে, আবার তুমিই সে সব কোথায় সরাইয়া দিলে। নতুবা যাহারা প্রভুর মন্দির এক বার ভাঙ্গিবার কারণ হইয়াছিল, আবার তাহারাই উহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে কেন? ঠাকুর, তুমি এক হাতে ভাঙ্গ, আর এক হাতে গড়িয়া দাও। তোমার মায়া-রহস্য কে বুঝিবে ঠাকুর?”

আহা, আর্য্য-কুলমহিলার পবিত্র সতীত্ব-ধর্ম্ম অতুলনীয়! সতীর তেজ বিশ্ব-সংসারে চিরদিনই অদমনীয়। সতীলক্ষ্মীর ইচ্ছা শক্তিতে সকলই সম্ভব হয়। তাই আমাদের ‘সেবক-সন্তান’ সাবিত্রীমায়ের চরণ-প্রান্তে বলিয়া থাকে—“মা, তোমার পদদ্বয়ে বারে বারে করি প্রণিপাত,সুমতি রেখ চরণে তোমার, তোমার অভয়-পদদ্বয় করিয়ে ভর, যেন পারি হতে ভব সিন্ধু পার।’ “মা, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ’ল, দেখা দাও হৃদয়ে আমার।” ‘মার কৃপাই আমার সম্বল।’ ‘নারায়ণে করিয়া নির্ভর, মার চরণে [illegible]ত প্রণত”। ওঁ তৎসৎ মা ওঁ॥

আশীর্ব্বাদ করি ভ[illegible]সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, আশ্রমের সেবকমণ্ডলীর সা[illegible]ন কল্যাণ হউক।

পরিশিষ্ট।

পরমহংসবাবার উপদেশ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—সাবিত্রীমাকে ও সুধামাকে উপদেশছলে 'বাবা' যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবার এই পবিত্র জীবনামৃতের সহিত তাঁহার সুধাময় উপদেশগুলি প্রকাশিত না হইলে, ইহা যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সেই কারণ নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

১। শ্রীভগবান বলিয়াছন—"যে অটল ভাবে প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারে, সেই শীঘ্র ভগবদ্-কৃপা লাভ করিতে পারে বা তাহারই সত্বর সাধনায় সিদ্ধি হইতে পারে।"

২। "জগতের যাবতীয় জীব ও বস্তুর 'রূপ' সবই আমার ইষ্ট, ভগবানই নানা রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছেন, এই জ্ঞান সর্ব্বদা মনে জাগরিত রাখিবে। কাহারও প্রতি অবহেলা বা কাহাকেও হেয় জ্ঞান করিবে না।"

৩। "মঙ্গলময় ভগবান নানা রূপে আসিয়া তোমার নিন্দা ও স্তুতি করিয়া যাইতেছেন, সেই সকল নিন্দা ও স্তুতি প্রেমময় বিধাতার মুখনিঃসৃত বেদ বলিয়া ধারণা করিবে। সাবধান—তাহাদের প্রতি মনুষ্য-বদ্ধি আনিয়া [illegible] তোমাকে রুষ্ট বা সন্তুষ্ট না করে।"

৪। "মনে রাখিও, বাহিরের [illegible] অপেক্ষা অন্তরের শত্রুই

অধিকতর দুঃখদায়ক, কাজেই কাহারও ব্যবহারে রুষ্ট হইলে, মনে করিও যে, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা তোমার অন্তরস্থ ক্রোধই তোমাকে বেশী জ্বালাইয়া পুড়াইয়া কষ্ট দিতেছে। কাজেই সেই ব্যক্তিকে শাসন করিবার পূর্ব্বে তোমার নিকটস্থ শত্রু 'ক্রোধকেই' শাসন করিও। যে দিন প্রাণে বা মনের মধ্যে কোন রূপ ক্রোধই আসিবে না, সেই দিনেই অপরকে শাসন করিবার উপযুক্ত হইয়াছ মনে করিবে।"

৫। "যতদিন পর্য্যন্ত তুমি সাধক, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার এ জগতে কাহাকেও রুষ্ট কিম্বা মর্ম্মাহত করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ সকলই অভেদ-নারায়ণের মূর্ত্তি-বিশেষ। তোমার ইষ্ট-দেবতার বক্ষের উপর যেমন তুমি পদাঘাত করিতে পার না, তেমনই অন্য কাহাকেও তুমি মর্ম্মাহত করিতে পার না, কারণ তাহারাও তোমার ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ।"

৬। "মনের ভিতর কোন রূপ জ্বালা, ক্রোধ কিম্বা অশান্তির কারণ উপস্থিত হইলে, তন্মুহূর্ত্তে অস্থির বা অধীর হইয়া, তাহার কোন রূপ প্রতিকার করিতে যাইও না, বা কোন প্রকার কর্কশ-বাক্য প্রয়োগ ও প্রতিজ্ঞাও করিও না। কারণ মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা কিছু মনে করা যায়, তাহাই প্রমাদ বশতঃ অন্যায় কার্য্য হইয়া পড়িবে। কাজেই চিত্ত কোন রূপে বিক্ষিপ্ত হইলে, অন্ততঃ সে দিনের জন্য কোন রূপ প্রতিকার না করিয়া, স্থির হইয়া মনকে শান্ত করিবার জন্য একান্ত চিত্তে ভগবানের ধ্যান করিবে। মন শান্ত না হইলে, ন্যায্য বিচার আদৌ আসিতে পারে না।

৭। "সাধনাবস্থায় [illegible]চিমত চলিতে কখনও বাসনা করিতে নাই। কারণ কোন বিষয়ে রুচি ও কোন বিষয়ে অরুচি, ইহাই

বদ্ধজীবের স্বভাব এবং সেই ভাবটী যত দিন থাকিবে, তত দিন সাধনার কিছুতেই উন্নতি হইতে পারে না। যখন জগতের অপ্রীতি-কর পদার্থেও সাধকের অরুচি জন্মিবে না,তখনই সে ব্যক্তি 'সাধক' নামের উপযুক্ত হইবে।"

৮। সুখ চাহিলেই,সাধক কখনও সুখী হইতে পারে না, বরং দুঃখের মাত্রা তাহাতে আরও বাড়িয়া যায়। কাজেই প্রকৃত সুখী হইতে হইলে, জগতের দুঃখপ্রদ জিনিসগুলি ও অরুচিকর পদার্থের নিয়ত সঙ্গ, অভ্যাস ও ব্যবহার করিতে হইবে। দুঃখগুলি যদি সুখের বিঘ্ন না দেয়, বা ক্রমে তাহা সুখের ন্যায় হইয়া পড়ে, অথবা অসাড়ে সহিয়া যায়, তাহা হইলেই অনন্ত সুখ পাওয়া গেল। কাজেই কোন দিনও কেবল সুখে ও আপনার পছন্দ মত ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিও না"।

৯। "কাহারও সহিত কথা বলা,কিম্বা উপদেশ করিবার সময় উপমা বা তুলনায় আপনার পূর্ব্ব-সুখের স্মৃতি জাগাইয়া, পূর্ব্বাশ্রমের কোন ঘটনার উল্লেখ করিও না"।

১০। "বিনা জিজ্ঞাসায় কাহারও সহিত কথা বলিবে না। এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, সংক্ষেপে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া 'মৌনী' হইবে।"

১১। "নিজে আয়োজন করিয়া খাইবার সময় জিহ্বাকে প্রশ্রয় দিও না। ভক্তগণের অনুরোধে সকলই খাইতে পার।"

১২। "সাংসারিক বাজে গল্প শুনিও না, কারণ প্রত্যেক গল্পই মনের মধ্যে একটা না একটা ভাব উৎপন্ন করে ও অবশেষে মনো-মধ্যে সেই রূপ বহু ভাবের অবিরত আন্দোলন হইতে থাকে। জানিয়া রাখিও, ভগবৎ-বিষয় ব্যতীত আর কিছুই শ্রোতব্য নয়,

কাহারও নিকট কিছু শুনিতে হইলে, ভগবৎ-বিষয় শুনিবে ও বলিতে হইলেও, ভগবৎ-বিষয়েই বলিবে।”

১৩। “নিজের হীন-অবস্থার জন্য লোকের নিকট কখনও বিলাপ করিও না”।

১৪। “কাহারও সহিত অযথা গল্প করিও না ও মিছা-কাজে বেড়াইয়া বেড়াইও না। কারণ ততটুকু সময়ও ভগবানের সেবায় অতিবাহিত হইলে, তোমার অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে”।

১৫। “লোকের অনুরোধে যেন বাধ্য হইয়াও, কখনও সৎপথ ও গুরুর উপদেশ লঙ্ঘন করিও না। এই রূপ অনুরোধকারী বন্ধু-বান্ধবগণকে মায়ারূপী ঘোর ‘শত্রু’ বলিয়া জানিবে”।

১৬। “যে জিহ্বা দ্বারা ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারিত হয়, সে জিহ্বা দ্বারা পরের কুৎসা, পর-নিন্দা ও কুৎসিৎ গালাগালি উচ্চারণ করিতে নাই। তুমি কখনও সে রূপ করিও না। একই পাত্রে ভগবানের জন্য পবিত্র নৈবেদ্য ও বিষ্ঠা রাখা কখনও উচিৎ কি? তাই জিহ্বাকে সর্ব্বদা সংযত রাখিবে”।

১৭। “লোকসমাজে ‘মৌনী’ সাজিয়া, গোপনে অনুগত শিষ্য ও অসৎদিগের সহিত কিম্বা মনে মনেও পর-চর্চ্চা করিলে, মৌনীব্রতে সুফল না ফলিয়া, নিতান্ত বিপরীত ও বিষময় ফল ফলিতে থাকে ও অন্তর ভণ্ডামিরূপ মহাপাপের আশ্রয় পাইয়া যায়”।

১৮। “সূচি” নিজে চিরকাল ছিদ্র-বিশিষ্ট, কাজেই প্রত্যেক বস্তুকে ছিদ্র করাই তাহার স্বভাব-ধর্ম্ম, তেমনই ‘অসাধুও’ সকলের চির-নিন্দার পাত্র হইয়াও ‘নিন্দুক’রূপে সতত পর-নিন্দা করাই তাহার স্ব-ধর্ম্ম বলিয়া, অলক্ষ্যে প্রচার করে—পরে সূতা সেই সূচের কৃত ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিভিন্ন বস্ত্রকে যেরূপ সংযুক্ত

করে এবং সমস্ত ছিদ্রও সংশোধন করিয়া সে বস্ত্রকে নির্দ্দোষ করে, সাধু-ব্যক্তি সেই রূপ পর-নিন্দা ও পর-চরিত্রের ছিদ্রগুলি আপনার মঙ্গলময় বৃত্তির দ্বারা ও সর্ব্বভূতে সমতারূপ জ্ঞান দ্বারা সংশোধন করিয়া লয়, সমস্ত মঙ্গলময় ও আনন্দময় সত্তা বলিয়া মনে করে। সাধারণে পর-ছিদ্র অনুসন্ধান করে ও সাধু পর-ছিদ্র সংশোধন করে, ইহাই পার্থক্য"।

১৯। "যে অন্যায় কার্য্যগুলি সামাজিক ও ব্যবহারিক-ধর্ম্মের ভিতর নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অজ্ঞানতাবশতঃ সেই কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে সাধারণতঃ পাপ জন্মায়, আর কোন ধর্ম্মকে অন্যায় ও নিষিদ্ধ জানিয়াও, যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে বিশেষ পাতকী হয় ও তাহা হইতে যে অন্যায় করিয়া অন্যায়কারীর অন্যায় কর্ম্মকে অনুমোদন করে, মিথ্যা প্রশ্রয় দেয়, সে ঘোরপাতকী"।

২০। "ত্যাগী ও ত্যাগ কাহাকে বলে? ভগবানের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, যে যে বস্তু 'বিঘ্ন' ও উদ্বেগকর' বলিয়া মনে হয়, তাহাই তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা, ইহাই ত্যাগীর লক্ষণ এবং সেই পথে অগ্রসর হইতে হইলে,যাহা কিছু সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তন্মুহূর্ত্তে গ্রহণ ও কার্য্যের সিদ্ধির পর অনাবশ্যক বোধে তাহাকে পরিত্যাগ করাই—'ত্যাগ'"। যথা ঃ—

শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে বসিলে, মশা-মাছি দ্বারা উদ্বিগ্ন হওয়ায়, ধ্যানের বিঘ্ন জন্মে, তন্মুহূর্ত্তে মশারী গ্রহণ করিয়া সাধনার বিঘ্ন নিবারণ করা উচিত। মশা-মাছির উপদ্রব কমিয়া গেলে, অনাবশ্যক বোধে, সেই মশারিকে আর সঞ্চয় করিতে আসক্ত না হইয়া ত্যাগ করাই—'ত্যাগীর'—'ত্যাগ'। বিশেষ বন্ধু-বান্ধব, এমন

কি—পিতা-মাতাও যদি সাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করা—ত্যাগীর ধর্ম্ম।

২১। "ক্ষণস্থায়ী চিত্তের যে কোন ভাব সবেগে অন্তরে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অত্যন্ত সুখী কিম্বা দুঃখী করিয়া, পর মুহূর্ত্তে বদলাইয়া যায়, তৎসমুদায় প্রমাদ-বশতঃ ঘটে বলিয়াই, তাহা—তামস, এমন কি ক্ষণস্থায়ী সাধুভাবও প্রমাদবশতঃই ঘটিয়া থাকে। যে ভাবটী যাহার ভিতর বেশ স্থির ও দৃঢ়ভাবে এবং বিশ্বাসপুষ্ট ধীর বা শান্ত ভাবে ক্রমশঃ দিন দিন উন্নত হইতে থাকে, সেইটীই তাহার স্বভাব—সেইরূপ সৎ-ভাবটীকে আশ্রয় করিয়াই লোকে ভগবানের চরণ-কৃপা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করে। সহসা আনন্দ, সহসা বিষাদ, সহসা ক্রোধ, সহসা আসক্তি এবং এই রূপ ক্ষণস্থায়ী চিত্তের বহু আন্দোলন দ্বারা তামস-কার্য্যেই অগ্রসর করায়। সাধকমাত্রেরই ঐ রূপ ভাব একেবারে পরিত্যজ্য। কিছুতেই ক্ষণমধ্যে অত্যন্ত আনন্দ ও দুঃখিত হইতে নাই"।

২২। "সাধনার জীবন আনন্দ ও দুঃখের যেন সমভাবে মিলন ক্ষেত্র। কখনও হতাশ হইও না, কখন যে কাহার উপর ভগবৎ-কৃপা বর্ষিত হইবে, তাহা কেহ তৎপূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও জানিতে পারে না। কাজেই প্রতি মুহূর্ত্তেই ভগবানের প্রতিক্ষায় থাকিবে। এ জন্মে হইবার নয়, বলিয়া নিরাশ হইও না"।

২৩। "এক 'ওঁ জগদীশ্বরী'ই এই পৃথিবীস্থ সকলের সুখ-দুঃখ বিধান করিতেছেন। কাজে কাজেই যখন তোমা হইতেও সহস্র-গুণ অধিক কষ্ট-দুঃখও কাহারও উপর বিধান করিতেছেন, তখন তোমার প্রতি করুণা বশতঃ তৎপরিবর্ত্তে সুখবিধানই করিয়াছেন, তখন তোমার নিতান্ত সকৃতজ্ঞের মত—'আমা হইতে সুখী কেহ

নাই, বলিয়া ভগবানের নিকট অকৃতজ্ঞের (নিমক্‌হারামী) ভাব প্রকাশ করিও না; তাহাতে ভগবান নিতান্ত রুষ্ট হন, জানিবে"।

২৪। "জগতের যাবতীয় কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও সকল অবস্থাতেই ভগবানকে স্মরণ রাখিও—এমন কি পায়খানায় যাইলেও, তাঁহাকে ভুলিও না। কারণ তাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই যাবতীয় অপবিত্র পদার্থও পবিত্র হইয়া যায়"।

২৫। "শুচী ও অশুচী কেবল মনের সংস্কারমাত্র"।

২৬। "ঈশ্বর ও সংসার-ভাব মনের মধ্যে এক সঙ্গে থাকিতে পারে না"।

২৭। "সন্ন্যাসী— নারী, মিথ্যাচার ও চুরি ত্যাগ করিবেন"।

২৮। "সংসার" সঙ্গে থাকিলে— সাধন হইবে, কিন্তু মুক্তির কাজ হইবে না"।

২৯। "ধর্ম্ম যারে তোষে—সংসার তারে রোষে"।

৩০। "এক জন ব্যক্তি দুই প্রভুর কাজ এক সময়ে করিতে পারে না"।

৩১। "ভগবানই সমস্ত যোগাযোগ করান"।

৩২। "ভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে তিনি ভিন্ন নাই"।

৩৩। "প্রভুর নিয়ম পালন না করিলে, শান্তি, সৎসঙ্গ সম্ভব হয় না"।

৩৪। "কর্ম্মফল সকলকেই ভুগিতে হয়"।

৩৫। "একে সাধি সব পায়—সবে সাধি সব হারায়"।

৩৬। "লজ্জা, নিদ্রা, ভয় আর রিপু ছয়, এই নয়টীকে ত্যাগ করিবে, তবে ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইবে"। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

সম্পূর্ণ।

(কাজেরলোক)—"*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ)—"*** ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতূহল-প্রদ।" *** (ব্রহ্মবিদ্যা) "যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্য-লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***" (বঙ্গবাসী)—"** এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর "গাইড-বুক"। ***

("THE BENGALI," 33-1-12)—"The book is full of valuable information about the sacred city—information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus." ("INDIAN DAILY NEWS." 10-9-12.)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City." ("AMRITA BAZAR PATRIKA." 7-10-12) —"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various

religious sect with their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given, he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the the general get-up of the book excellent.*** ("THE TELEGRAPH")—"**A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute description and accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tries the patience of readers ; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

বর্ণচিত্রণ 'পেণ্টিং' বা চিত্র-শিল্প বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সৎসাহিত্যের ন্যায়ই সকলের পাঠ্য ও উপভোগ্য।

ইহাও উক্ত আচার্য্য-প্রবর প্রবীন সাহিত্যিক সাহিত্যিকলা-বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত একখানি অসাধারণ পুস্তক। মূল্য—বিলাতি বাঁধাই ১৲ টাকা মাত্র।

'বর্ণ-চিত্রণ'-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(**বঙ্গবাসী**)—"কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, গ্রন্থ রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই শক্তিই দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। চিত্রবিদ্যায় যাঁহাদের ঝোঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইবেই, সাহিত্য-হিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরণীয়। এক কথায় বলি, বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।" (**ব্যবসায়ী**)—"***সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।" (**এডুকেশন গেজেট**)—"এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। *** গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক।**" (**সাহিত্য-সংবাদ**)—"*** গ্রন্থখানিকে 'প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষায় বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন।***" (**"THE TELEGRAPH"**) "***The learned author has very elaborately dwelt

upon the various stages of the art of painting as they are being studied and taught in the Western countries dealing incidentally with the ancient art of painting in India which though now forgotten for want of culture is not exactly dead. Which is sure to be of invaluable help to learners as well as teachers. It is also sure to awaken an interest in the public mind in a subject which has hitherto remained dark for want of culture.***"

চিত্রবিজ্ঞান রেখাঙ্কন বা 'ড্রয়িং' বিদ্যার ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত। ড্রয়িং আদি প্রত্যেক শিল্প শিক্ষার্থীর অতি অবশ্য পাঠ্য। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টী "চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" অংশ প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা (৬ষ্ঠ সংস্করণ) আমুল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইহাও উক্ত আচর্য্যপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে ভারতের অধিকাংশ ফটোশিল্পীই এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক। বিলাতি বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

উপাদেয় উপহার পুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য-বিলাতি বাঁধাই ॥০ আট আনা মাত্র।

'ঠাকুরমা' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বঙ্গবাসী)—"গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙ্গালী পাঠক ইঁহার লিপিপটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের রচনায় ইঁহার শিল্প-নৈপুণ্য উজ্জ্বল। এখানকার অনেক মেয়ে, শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে, পরন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে বিগ্‌ড়াইয়া যায়। ঠাকুরমার শিক্ষাপ্রভাব কমিতেছে, পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ বাড়িতেছে; কাজেই এখনকার মেয়েরা সেই হাওয়ায় উপদেবতাগ্রস্ত হইতেছে। চক্রবর্ত্তীমহাশয়, তাহাদিগকে 'সায়েস্তা' করিবার উদ্দেশ্যে, এই 'ঠাকুরমা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতিনীর কথোপকথন। ঠাকুরমা বেশ সোজা সরল ভাষায় নাতিনীকে গৃহস্থালীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি শিখাইয়া দিতেছেন। *** এই সব বিষয়ের রচনা পড়িতে পড়িতে লিপিমাধুর্য্যে মনে হয়, যেন উপন্যাস। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ। এ গ্রন্থ সাদরে পাঠ্য।" (সময়)—পুস্তকখানি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। শুধু শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই যে, এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তকখানি সুলিখিতও বটে। বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে

চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারে স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিতে পারে, সংসার অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে * ।"

(**কাজের লোক**)—"একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দু-স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রসূতি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটীই বাদ পড়ে নাই। "ঠাকুরমা" আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকাস্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।***"ঠাকুরমা" অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

("THE TELEGRAPH.")—" * * highly recommend this book. *** for a text-book in all Hindu Girls' Schools in the Province." ('THE INDIAN STUDENT.') —" * * * It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended."

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাবলী।

সাধনপ্রদীপ [সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। (তৃতীয় সংস্করণ)—
আমূল সংশোধিত ও নব নব বিষয়সংযোগে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত সুন্দর বিলাতিবৎ বাঁধান ও শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাধনপ্রদীপ-সম্বন্ধে অভিমত—

(**'এডুকেশন গেজেট'**)—"এই পরম উপাদেয় পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহামায়ার কৃপায় বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হইল, ইহা পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল দূর হইবে এবং বাঙ্গলায় পুনরায় 'স্মরহর সমান ক্ষিতিতলে' বীরপুরুষদিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। ***এই পুস্তকের কথাগুলি***সযত্নে পাঠ করা উচিত***।"

(**'হিতবাদী'**)—"গ্রন্থপ্রণেতা দুরবগাহ তন্ত্রসাগরের পরিচয় রাখেন, তন্ত্রের এমন ব্যাখ্যা-পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হওয়া ভাল।"

("THE TELEGRAPH")—' It is a treatise on the fundamental principles of Hindu religion * * * The manner in which the book has been dealt with by the author is highly commendable. He is a profound thinker and an expounder of the difficult and intricate problems of religion, We gladly admit that it is a happy production of its kind and we recommend it to every member of the Hindu household. * * *

('সমন্বয়')—"জটিল ও নীরস বিষয়সকলও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা স্বামীজির যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যুক্তি-তর্কের সমাবেশ ও লিখনপ্রণালীর গুণে সত্য সত্যই পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ('মেদিনীপুর হিতৈষী')—গ্রন্থখানি সাধকের লিখিত—সাধনার সামগ্রী, ভক্তির অভিব্যক্তি। যাঁহারা তন্ত্রকে ঘৃণা করেন, আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা একবার পাঠ করুন একবার তন্ত্র কি? তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন—আত্মহারা হইবেন, দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন।"

('ব্রহ্মবিদ্যা')—"*** এই গ্রন্থে তন্ত্রের সেই মৌলিক মহান্ উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণেরও উপযোগীরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক; নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্ত্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার শক্তি অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।"

পূজ্যপাদ উক্ত স্বামীজী মহারাজের প্রণীত নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

গুরুপ্রদীপ ['সনাতন-সাধানতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' ২য় খণ্ড] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার বিধান ও গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺তারাদেবীর সুরঞ্জিত চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ)—[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য’ ৩য় খণ্ড)] পঞ্চদেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। ‘সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা’, ‘যোগসমাহার’, ‘মন্ত্রযোগ’, ‘হঠযোগ’, ‘লয়যোগ’, ‘রাজযোগ’, ‘পূর্ণদীক্ষাদি’ ও ‘বৈরাগ্য’-সম্বন্ধে এরূপ সরল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। “তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।”

জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগঃ) —[‘সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য,’ (৩য় খণ্ড)] ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রণব-চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। ‘বিরজা-সংস্কার ও অন্তিম-দীক্ষা,’ ‘সন্ন্যাসাশ্রম,’ ‘সন্ন্যাসীর ভেদ,’ ‘মঠাম্নায়-রহস্য,’ ‘দর্শন-সমন্বয়,’ ‘সৃষ্টি-রহস্য,’ ‘আত্মতত্ত্বাদি-রহস্য,’ ‘মহাবাক্য’ ও ‘মুক্তিতত্ত্ব-রহস্যাদি’ সহ জ্ঞান ও মুক্তির উপায় সম্বন্ধে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সন্ধ্যারহস্য বা সন্ধ্যাপ্রদীপ ইহা প্রত্যেক দ্বিজ-সন্তানেরই অবশ্য পাঠ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

গীতাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য ৫ম খণ্ড)] ইহাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার লৌকিক, যৌগিক ও সমাধি-ভাষার অনুকূল কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী প্রত্যেক গীতাধ্যায়ীর ইহা অবশ্যপাঠ্য।

'কৃষ্ণার্জ্জুনের বিচিত্র ত্রিবর্ণচিত্র ও যোগরহস্যের' চিত্রাবলীসহ সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৸৹ বার আনা।

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনাক্রম বা পূজাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)] 'বঙ্গবাসী' আদি সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান! সনাতন-ধর্ম্মের এ হেন দুর্দ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত-জনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়! 'ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের প্রথম-কৃত্য' ইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম্ম' ও নৈমিত্তিকাদি আজীবন-াধনার অতীব গূঢ়যোগরহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ' হজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই পরিত্যজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী, ইহাতে পূজ্যপাদ ছকার স্বামিজীমহারাজের কৃপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত চিত্র ও বিশুদ্ধ 'ষট্‌চক্র চিত্র', 'ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের ত্র', 'কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চিত্র', 'আসন-মণ্ডল', রূপাদুকা', বিবিধপ্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল', নানা বদেবীর 'মন্ত্র' 'হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থণ্ডিল-যন্ত্র', 'ত্রিশূলদণ্ড', দব্রহ্ম', 'গুরুমূর্ত্তি' ও 'আত্মলয়াদির' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত বেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠারও অধিক বিরাট াত-গ্রন্থ। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ২।৹ নয়সিকা মাত্র।

বাবা নামে পরিচিত হইয়া সতত দিগম্বর বিশ্বনাথের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যাঁহার সুন্দর শঙ্খ মর্ম্মর মূর্ত্তি এখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ও অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত, পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত ও আত্মহারা হইতে হয়। প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।